যুক্তি

সংখ্যা ৪ জুলাই ২০১৩

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোটকাগজ

যুক্তি | সংখ্যা ৪ জুলাই ২০১৩

যুক্তি

সংখ্যা ৪ জুলাই ২০১৩

•••

যুক্তি

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোটকাগজ

সংখ্যা ৪

সম্পাদক

অনন্ত বিজয় দাশ

প্রকাশকাল

জুলাই ২০১৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

অনন্ত বিজয় দাশ

প্রচ্ছদ

আফ্রিদা রোশনী

পরিবেশক

বইপত্র, দ্বিতীয় তলা, রাজাম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট

তক্ষশিলা, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা

বাতিঘর, প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম

যোগাযোগ

যুক্তি

৪২, রাজাম্যানশন, দ্বিতীয়তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট|

মুঠোফোন : ০১৭১২ ৯৬৬৮১৩, ০১৭১৩ ৪১১৬৩১

ইমেইল : abd.jukti@gmail.com

facebook.com/jukti.src

মুদ্রক

প্যারাডাইম অফসেট প্রেস

রাজা ম্যানশন, দ্বিতীয় তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট|

সূচি

প্রবন্ধ

বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনে গ্রন্থ ॥ অজয় রায় ৬

বাংলাদেশে মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার ঐতিহ্য ॥ শাহরিয়ার কবির ১৪

ওষুধ নিয়ে নয়ছয়! ॥ মুনীরউদ্দিন আহমদ ২৪

ভুয়াবিজ্ঞান মেলা চাই ॥ মনিরুল ইসলাম ২৯

বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান ॥ তানভীর হানিফ ৩৮

ফ্রয়েড-তত্ত্ব কি বিজ্ঞানসম্মত? ॥ বিরঞ্জন রায় ৫৬

বিজ্ঞানের আলোয় 'হোমিওপ্যাথি' ॥ কাজী মাহবুব হাসান ৮৫

অনুবাদ

জীবনের সূত্রপাত হলো কিভাবে? ॥ ফ্রান্সিসকো আয়ালা ১১৩

প্রবন্ধ

হারুন ইয়াহিয়া : চকচক করলেই সোনা হয় না! ॥ অনন্ত বিজয় দাশ ১২০

অনুবাদ

হারুন ইয়াহিয়ার 'সৃষ্টির মানচিত্র' ॥ ম্যাট কার্টমিল ১৪৭

ফসিলের আলোয় বিবর্তন ॥ ডোনাল্ড আর প্রোথেরো ১৬৬

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোটকাগজ *যুক্তি* দীর্ঘ বিরতির পর আবার প্রকাশিত হলো। ২০১০ সালে তৃতীয় সংখ্যাটি প্রকাশের পর প্রায় প্রতিদিনই অগণিত পাঠক পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের অশেষ তাগাদা দিয়ে গেছেন অবিরাম। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরামর্শ, আলোচনা-সমালোচনা করেছেন আমাদের সাথে। মতামত জানিয়েছেন। দিকনির্দেশনা দিয়েছেন একান্ত আপনজনের মতো। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। আমাদের জন্য তা পরম পাওয়া। কিন্তু স্বীকার করে নিচ্ছি আমাদের অক্ষমতা আর সীমিত সাধ্যের কারণে এর প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে। পাঠকের এ লম্বা আর ক্লান্তিকর অপেক্ষায় বসিয়ে রাখার জন্য নির্দ্বিধায় আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তথাপি একটা কথা না-বললেই নয়, যাত্রা শুরুর কাল থেকে মনোস্থির করে নিয়েছিলাম আমরা *যুক্তি*র প্রকাশিত যে কোনো সংখ্যাই এর শেষ সংখ্যা হতে পারে। হয়তো এরপর আর কোনো সংখ্যা প্রকাশ আমাদের জন্য সম্ভব না হয়ে উঠতে পারে। কতটুকু সফল হয়েছি তা জানি না, তবু এতটুকু জানি, সাধ্যমত আমরা চেষ্টা করেছি নিজেদের মধ্যে কোনো খেদ না রেখে সর্বোচ্চ শ্রম দিয়ে প্রকাশনাগুলি সাজাতে। এখন পাঠকের দরবারে ছেড়ে দিলাম *যুক্তি*র মূল্যায়নের ভার। পাঠকই আমাদের বিচারক।

পূর্বের মতো এবারও যুক্তি'র সংখ্যাটিকে সাজিয়েছি সেক্যুলার ধ্যানধারণাসমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাউদ্রেককারী অনেকগুলো রচনা দিয়ে। দেশে ও বিদেশের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, সমাজ-গবেষক যেমন যুক্তি'র জন্য লেখা দিয়েছেন তেমনি গভীরভাবে বিজ্ঞানমনস্ক তরুণ লেখকদের মধ্য থেকেও আমরা লেখা পেয়েছি। এই সংখ্যার সূচিপত্রের দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন, বিজ্ঞানভিত্তিক ও বিজ্ঞান-সম্পর্কিত লেখা দিয়ে *যুক্তি* সমৃদ্ধ হলেও গুরুত্ব পেয়েছে অপবিজ্ঞান আর বিজ্ঞানবিরোধিতার নানা কিসিমের বিষয়গুলিই। যেমন হোমিওপ্যাথি, জ্যোতিষীশাস্ত্র, সৃষ্টিবাদ ইত্যাদি। বিজ্ঞানবিরোধী কার্যক্রমের মনস্তত্ত্ব এবং কর্মপ্রক্রিয়াও উঠে এসেছে লেখাগুলিতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞানের এ যুগে ধর্মগুলির সনাতনী ধ্যান-ধারণা টিকে থাকতে না পেরে নবরূপে-নবকাঠামোয় বিজ্ঞানবিরোধী শক্তিগুলো একতাবদ্ধ হয়ে উঠছে। আজকের একবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হলেও এটা অবশ্যই শঙ্কার বিষয় যে অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেও এইসব ছদ্মবিজ্ঞানওয়ালাদের প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার দুই হাতে উদরপূর্তির পাশাপাশি অপবিজ্ঞান আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা যাতে সমানতালে বিরাজ করে জনতার মাঝে সে-জন্য কতকগুলি দেশের সরকার-ব্যবসায়ী গোষ্ঠী লুঠেরা আর ধর্মতন্ত্রী গ্রুপ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে একজন বিজ্ঞান-আন্দোলন কর্মীকে

বিজ্ঞানের তত্ত্ব-তথ্য-উপাত্ত জানার পাশাপাশি অবশ্যই ছদ্মবৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত থাকা উচিৎ| পপুলার লেভেলে শুধু ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে চলবে না, জানার পরিমাণ ক্ষেত্রবিশেষে আরো গভীরে নিয়ে যাওটাও দরকার| অবশ্য এর মানে এই নয় যে একজন বিজ্ঞান-আন্দোলন কর্মীকে বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা সমাধান পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ করতে হবে| তা সম্ভবও নয়|

আমরা যুক্তি'র প্রত্যেক লেখকের কাছেই কৃতজ্ঞ| বিদেশি লেখক যারা, *যুক্তি* প্রকাশনার কথা শুনে এক বাক্যেই অনুমতি প্রদান করেছেন অনুবাদের, কোনো ধরনের 'কপিরাইট' কিংবা প্রকাশনাজনিত নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে| এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়| আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সকল লেখককে| সেই সাথে আমাদের সকল পাঠক, অস্থির সময়ের সহযাত্রী বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, সহায়তাকারী, যাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা আর ভালোবাসা আমাদেরকে এতোটা পথ পাড়ি দিতে সাহস যুগিয়েছে, আমাদেরকে আশাবাদী করেছে, স্বপ্নের পরিধি বৃদ্ধি করেছে, নতুন নতুন চিন্তায়-ভাবনায় আলোড়িত করেছে| তাদের সবার প্রতি রইলো বিনম্র কৃতজ্ঞতা|

প্রকাশিত সকল লেখাই লেখকগণের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, অভিমত এবং তথ্যসংকলন| এর সাথে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল ও যুক্তি'র উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিগত মিল পুরোটা না হলেও অনেকাংশেই রয়েছে| আমরা মনে করি প্রকাশিত যে কোনো লেখা বা বিষয়বস্তুর সাথে যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন এবং প্রকাশের জন্য আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন| প্রকাশযোগ্য হলে পাঠকের ভিন্নমত আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে| এবং সবশেষে আবারও বলি অনেক চেষ্টার পরও এ সংখ্যায় কিছু ভুল থেকে যেতে পারে, যার দায় অবশ্যই সম্পাদকের| পাঠকের কাছে অনুরোধ—এ ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার পাশাপাশি ধরিয়ে দিতে, যাতে ভবিষ্যতে আমরা সংশোধন করতে পারি|

ধন্যবাদ সবাইকে|

অনন্ত বিজয় দাশ
সম্পাদক, যুক্তি
ইমেইল : ananta_bijoy@yahoo.com

বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনে গ্রন্থ[১]

অজয় রায়

লেখাটি নিয়ে ভাবতে গিয়ে প্রথমেই বেশ হোঁচট খেলাম| বাংলা একাডেমী অভিধান, সংসদ, চলন্তিকা এমন কি সংসদের বাংলা-ইংরেজি অভিধান ঘেটে 'মনস্ক' শব্দের, বিজ্ঞান-মনস্ক তো দূরের কথা সন্ধান না পেয়ে যৎপরোনাই বিস্মিত হলাম-বলাই বাহুল্য| অথচ কি অক্লেশে প্রতিদিন 'বিজ্ঞান-মনস্ক', সাহিত্য-মনস্ক শব্দগুলি আমরা ব্যবহার করে আসছি| আমার এক সংস্কৃত জানা পণ্ডিত বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম-তিনি পাক্কা ২৪ ঘণ্টা পরে জানালেন বাংলা বা সংস্কৃত কোনো অভিধানেই 'মনস্ক' শব্দটি নেই, তবে এ.টি. দেবের বাংলা-ইংরেজি অভিধানে শব্দটি রয়েছে এবং এর ইংরেজি অর্থ করা হয়েছে 'pertaining to mind'| তিনি আরও জানালেন যে সম্ভবত মনস এর সাথে কন প্রত্যয় যোগে শব্দটি তৈরি করা যেতে পারে|

তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে কোথায়? আমরা বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ বলতে কাদের বোঝাব বা চিহ্নিত করতে চাই| কারণ তাদের নিয়েই তো বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে উঠবে বা ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে| দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে করতে এই শব্দটি সম্পর্কে আমার মনে একটি দ্যোতনার সৃষ্টি হয়েছে| আমার কাছে এর অর্থ হল যে মানুষটি বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান সাধনা না করেও, বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য অর্থাৎ চিন্তাভাবনার সাথে সম্যক পরিচিত হয়ে- নিজে যৌক্তিক পন্থায় চিন্তাভাবনা করেন, যুক্তি ও হেতুর ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হন-তাঁকেই আমরা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ বলতে পারি| বিজ্ঞানমনস্ক হতে হলে বিজ্ঞানী হতে হবে এমন কোনো কথা নয়| তবে তাকে হতে হবে যুক্তিবাদী, মুক্তবুদ্ধির মানুষ এবং অনুসন্ধিৎসুপরায়ণ এবং বুদ্ধির মুক্তির চর্চা করতে হবে| অনেক বিজ্ঞানী আছেন যারা একই সাথে মুক্তমনা এবং বিজ্ঞানমনস্ক, আবার অনেক বিজ্ঞানী রয়েছেন যারা বিজ্ঞানমনস্ক নন, যুক্তিকে পরিহার করে অন্ধ-বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেন, যুক্তির ধার ধারেন না-পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে বিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্ব ও আবিষ্কার খুঁজে পান| এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের

[১] বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ এসেছে যে এই অধমকে কলকাতায় আন্তর্জাতিক বইমেলায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ দিবসে (৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১২) আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ ও প্রবন্ধ পাঠ| নিজের সীমাহীন অজ্ঞানতার কথা ও শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়েও রেহাই পাইনি-ঢেকি গিলতেই হয়েছে| ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১২, তারিখে বিকেল ৩-৩০ মিনিটে আন্তর্জাতিক বই মেলায় সম্মেলন হলে উত্তাপিত হয় প্রবন্ধখানি|

সভাপতি বিশিষ্ট নিউক্লীয় পদার্থবিদ ড. শমসের আলী[২], রয়েছেন ইসলামিক ক্রিয়েশনিজমের প্রবল প্রবক্তা হারুন ইয়াহিয়া প্রমুখ ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক (pseudo scientists), সৌদি রাজপারিবারের চাকুরে জনৈক খ্রিস্টান ডাক্তার মরিস বুকাইলি প্রমুখ[৩]|

অন্যদিকে প্রথম শেণীতে রয়েছেন, যারা শুধু নামকরা বৈজ্ঞানিক নন, সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী, যেমন ড. মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বোস, ড. কুদরাৎ ই খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, পারভেজ হুদভয়, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হারুন-অর-রশীদ প্রমুখ| আবার বৈজ্ঞানিক না হয়েও যে মুক্তবুদ্ধির ধারক ও যুক্তিবাদী হওয়া যায় এর উদাহরণের অভাব নেই : ভাষাবিদ ড. হুমায়ুন আজাদ, প্রবীর ঘোষ-যিনি একক চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতি গড়ে তুলেছেন যারা নিরলসভাবে দেশ থেকে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং অন্ধবিশ্বাস দূর করতে ব্রতী হয়েছেন| আমরা এ প্রসঙ্গে ঢাকার শিখা গোষ্ঠীর নাম করতে পারি| গত শতকের বিশের দশকের শেষের দিকে মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের কতিপয় মুসলিম তরুণ-আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, মোতাহার হেসেন চৌধুরী, আবুল ফজল প্রমুখেরা ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) যার আদর্শ হল 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলা| 'মুক্ত বুদ্ধির চর্চা'-এই সংগঠনটির মুখপত্র ছিল বার্ষিক 'শিখা' যা টিকে ছিল ৫ বছর (১৯২৭-১৯৩১) আর মূল সংগঠনটির আয়ুষ্কাল ছিল এক দশক (১৯২৬-১৯৩৬)| 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর অন্যতম প্রাণপুরুষ কাজী আবদুল ওদুদ এ প্রসঙ্গে আমাদের জানাচ্ছেন :

> "(১৩৩২ সালে) ১৯২৬ খৃস্টাব্দের সূচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, তার মূল মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'| কয়েকজন মুসলমান অধ্যাপকের উপর ন্যস্ত হয়েছিল এর পরিচালনার ভার| 'শ্বাশ্বত বঙ্গের' লেখক তাদের অন্যতম| 'বুদ্ধির মুক্তি' অর্থাৎ বিচার বুদ্ধিকে অন্ধসংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তি দান| বাংলার মুসলমান সমাজে (হয়তো বা ভারতের মুসলমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার| কিন্তু সেদিনে বিস্ময়কর হয়েছিল বাংলার শিক্ষিত মুসলিম তরুণের উপরে এর প্রভাব-একটি জিজ্ঞাসু ও সহৃদয়-গোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল এর দ্বারা|"

---

[২] '*Scientific Indications in the holy Quran*' নামের একটি ছদ্মবিজ্ঞান-গ্রন্থ লিখেছেন-প্রচ্ছদে কোরানের একটি আয়াতসহ জুড়ে দিয়েছেন ডিএনএ-অণুর একটি ছবি| বোঝাতে চাইছেন যে কোরান শরিফে এসব ছবি রয়েছে বা ছবির বর্ণনা রয়েছে|

[৩] '*Bible, Quran and Science*' শিরোনামে একটি পুস্তক লিখে একদিকে নাম করেছেন, অন্যদিকে মুসলিম সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছেন|

কাজী আবদুল ওদুদ 'বুদ্ধির মুক্তি'কে ইংরেজিতে আখ্যায়িত করেছেন, 'Emancipation of the intellect' নামে|

'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' এই সভ্যরা অচিরেই শিখা গোষ্ঠী নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন-যার মূল মন্ত্র ছিল :

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব|'

ঐ যে বলা হল, মনস্ক কথাটির ইংরেজি করেছেন এ.টি দেব pertaining to mind, তাহলে কি বুঝব ইংরেজ-সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান-মনস্কতা বলে কিছু নেই? আমরা বড় জোড় এর ইংরেজি তর্জমা করতে পারি 'consciousness having scientific thought or mind'| কিন্তু তাও বলি কি করে যেখানে আমরা কার্ল সাগান, পল কুর্জ, ভিক্টর জে স্ট্রেঙ্গার, স্যাম হ্যরিস, রিচার্ড ডকিন্স, স্টিভেন ওয়েনবার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎ পাই| আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিং, বার্ট্রান্ড রাসেলের কথা নাই বা উচ্চারণ করলাম| সাহিত্যিকই হন আর বিজ্ঞানীই হন বিজ্ঞানমনস্কতার মূলে থাকতে হবে মুক্ত মন, আর যুক্তিবাদের ভিত্তি| আর এ কথাটিই জোড় দিয়ে বলেছেন পাকিস্তানের কায়দে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের সুখ্যাত অধ্যাপক পারভেজ হুদভয় (Pervez Hoodbhoy: *Islam and science: Religious Orthodoxy and the battle for Rationality*, 1992, Zed Books) :

".. .. ইসলামের স্বর্ণযুগে বিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করেছিল কারণ ইসলামের অভ্যন্তরে তখন সক্রিয় ছিলেন মুতাজিলা নামধারী শক্তিশালী যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের ধারক একদল চিন্তাবিদ| 'সবকিছুই পূর্ব-নির্ধারিত এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন ব্যতীত মানুষের জন্য অন্য কোন উপায় নেই'-নিয়তিবাদীদের এ মতবাদের তীব্র বিরুদ্ধাচারণ করে মুতাজিলারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন| মুতাজিলারা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিলেন, জ্ঞান তখন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল| কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে গোড়া ইসলামি চিন্তাবিদ ইমাম আল-গাজ্জালি যুক্তির স্থলে দৈববাণী এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির স্থলে নিয়তিকে তুলে ধরেন| কার্য ও ক্রিয়ার সম্প র্ককে তিনি অস্বীকার করেন এই বলে যে, মানুষের ভবিষ্যৎ জানার শক্তি নেই, কেবল সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়ে অবগত| যে উদার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়| মুসলিম বিশ্বে সহিষ্ণুতা, মেধা এবং বিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটে|"

এবার বিজ্ঞান নিয়ে দু'একটি কথা বলা যাক| আইনস্টাইন বলেছেন :

> It would not be difficult to come to an agreement as to what we understand by science. Science is the century old endeavour to bring together by means of a systematic thought the perceptible phenomena of this world into as thoroughgoing an association as possible. To put it boldly, it is the attempt at the posterior reconstruction of existence by the process of conceptualization.

আধুনিক বিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা আমরা আইনস্টাইনের উক্তির মধ্য দিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম তারও আগে ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩) বলেছিলেন, 'বিজ্ঞান হল সুসংগঠিত জ্ঞান', আর উইলিয়াম হাজ্জিটির ভাষায় (১৭৭৮-১৮৩০) বিজ্ঞান হচ্ছে 'কারণকে জানার তীব্র এষণা'| সরল কথায় বলা যায় আধুনিক বিজ্ঞান হল একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে সত্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করে থাকেন| আমরা জানি যে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ শুরু হয়েছিল গ্যালিলিও'র হাতে যার পরিপূর্ণতা পায় নিউটনের মেধায়|

তবুও অনস্বীকার্য যে বিজ্ঞান শব্দটির অর্থ বদলেছে কালের পরিক্রমায়| আমাদের প্রাচীনেরা ভাবতেন বিজ্ঞান হল 'বিশেষ বা অনুপুঙ্খ জ্ঞান'| ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকদের, বিশেষ করে শঙ্করাচার্যের হাতে পড়ে বেদান্তবাদীরা বিজ্ঞানকে 'ব্রহ্মজ্ঞানে' দাঁড় করিয়েছিলেন, আর বৌদ্ধাচার্যেরা বিজ্ঞানকে পরিণত করেছেন 'বিজ্ঞানবাদে' এবং 'শূন্যবাদে'|[৪] অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন জীবনের সামগ্রিক সাধনাই হল পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান| আর এ সাধনা কাব্য-সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়েও সম্পাদিত হতে পারে| সাহিত্যের ভূমিকা নিয়ে বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন এখানে :

> মানুষের প্রবাহ হুহু করে চলে যাচ্ছে, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকবে না কেবল সাহিত্যে থাকবে| সংগীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই| এর জন্যই সাহিত্যের এত আদর এই জন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার .. .. আমার বলা উচিৎ ছিল, লেখকের নিজস্ব নয়, মনুষ্যত্ব প্রকাশ সাহিত্যের উদ্দেশ্য.. .. লেখক উপলক্ষ মাত্র| মনুষ্যই উদ্দেশ্য|[৫]

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ বলতে আমার চোখের সামনে শুভ্র দাড়িওয়ালা ছোটখাটো মাপের সৌম্যদর্শন ইহজাগতিক সেক্যুলার-যুক্তিবাদী দার্শনিক ব্যক্তিটির প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে-তিনি হলেন আরজ আলী মাতুব্বর| আমি জানি না পশ্চিম বাংলার কতজন মানুষের বাংলার গ্রামীণ সমাজ থেকে উঠে আসা এই স্বশিক্ষিত ইহলৌকিক দার্শনিকের কাজের সাথে পরিচয় আছে? একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করে মাতুব্বরের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই| বরিশালের এক অজ পাড়াগাঁয়ের পিতৃহীন কিশোর মার মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে স্মৃতি ধরে রাখার

---

[৪] বস্তুজগতের কোন অস্তিত্ব নেই-বস্তু হল মনোজগতের সৃষ্ট প্রতিলিপি মাত্র| আর নাগার্জুন (১ম শতাব্দী) প্রবর্তিত শূন্যবাদের মর্মকথা হল বর্হিজগৎ ও মনোজগৎ কোনটিরই অস্তিত্ব নেই-সবই শূন্য)| নাগার্জুনের চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় হিউম ও বার্গসোর চিন্তাধারায়|

[৫] সাধনা, ১২৯৯

জন্য শহর থেকে ডেকে আলোকচিত্র শিল্পীদের দিয়ে মায়ের মৃতদেহের ছবি তুলিয়েছিলেন| এই হলো ধর্মপ্রাণ কিশোর আরজ আলীর অপরাধ| গ্রামের কাঠমোল্লারা সমবেত হয়েছিলেন মায়ের জানাজায় শরিক হতে-ফতোয়া দিলেন যে (মৃতের ফটো তোলা) কাজটি ইসলাম-গর্হিত, অতএব মৃতের জানাজায় এবং তৎপরবর্তী পারলৌকিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ হবে অনৈসলামিক| আরজ আলী মোল্লাদের কাছে আবেদন জানালেন অপরাধ করেছেন তিনি, ধর্মপরায়ণা মৃত মা'তো কোন অপরাধ করেন নি-পুত্রের অপরাধে মাকে কেন শাস্তি প্রদান করা হবে? কিন্তু আলেমরা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থেকে স্থান ত্যাগ করলেন| দিশেহারা আরজ আলী তার কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় জানাজা ও পারলৌকিক কৃত্যাদি ছাড়াই বাড়ির পাশে মাকে সমাধিস্ত করলেন| সেদিন থেকেই কিশোর আরজ আলীর জীবনদর্শন বদলে গেল-মায়ের নামে শপথ করলেন যে ধর্মে মানবিকতার স্প র্শ নেই তার স্বরূপ তিনি উন্মোচন করে ছাড়বেন| মায়ের নামে শপথ নিলেন : 'তুমি কখনো নামাজের কাজা কর নি, কখনো তছবিহ তেলায়েত ও তাহজ্জুদ নামাজে গাফিলতি কর নি| আর আজ সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে একদল মুসলিম তোমাকে চাইল শিয়াল-কুকুরের ভোগ্য বানাতে, তাদের কাছে হলে তুমি তুচ্ছ, অবহেলিতা ও বিবর্জিতা, হলে নিন্দা ও ঘৃণার পাত্রী| সমাজে আজ সর্বত্র বিরাজ করছে ধর্মের নামে 'কুসংস্কার'| তুমি আমায় আশীর্বাদ কর-আমার জীবনের ব্রত হয় যেন 'কুসংস্কার দূরীকরণ অভিযান|' আর সে অভিযান সার্থক করে আমি যেন তোমার কাছে আসতে পারি :

'তুমি আশীর্বাদ কর, মোরে মা,
আমি যেন বাজাতে পারি
সেই অভিযানের দামামা|'

সেদিন থেকে নিমগ্ন হলেন সাধনায়, নিবিড়ভাবে জ্ঞানচর্চায় ব্রতী হলেন-স্বশিক্ষিত এই মানুষটি পরিণত হলেন ইহজাগতিক সেক্যুলার এক দার্শনিকে| তার দর্শনের মূল কথা হল 'জানতে হলে প্রশ্ন করতে হবে-বিনা প্রশ্নে কোন কিছু গ্রহণ করা চলবে না-এমন কী তিনি আল্লাহতায়ালা, গড বা ঈশ্বর হলেও|' তাঁর এই জ্ঞান সাধনার শ্রেষ্ঠতম ফসল হল '*সত্যের সন্ধান*' গ্রন্থখানি যা তিনি পাকিস্তানি আমলে প্রকাশ করতে পারেন নি, উপরন্তু জেল-জুলুম ও অত্যাচার নিপীড়ণের শিকার হয়েছিলেন| অবশেষে পুস্ত কটি প্রকাশিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে| তাঁর আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো : '*সৃষ্টি রহস্য*' (১৯৭৮) ও '*অনুমান*' (১৯৮৩)|

'*সত্যের সন্ধান*'-এ তিনি অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন আত্মা ও আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বর বা আল্লাহতায়ালাকে নিয়ে, পারলৌকিক বিষয়ে, ধর্মের নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে, প্রকৃতি-মানুষ-জীব-আকাশ-পৃথিবী-সূর্য-প্রাকৃতিক ঘটনা-দিন-রাত্রি-ভূমিকম্প ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, একদম শেষে রয়েছে বিবিধ বিষয় নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা| এসব বিষয় ৬টি প্রস্তাবে বিভক্ত

করে মোট ৬৮ প্রশ্ন উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে| দু'একটি উদাহরণ দিই : প্রথম প্রস্তাবে আত্মা নিয়ে যে ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তা হলো : আমি কে, প্রাণ কি অরূপ না স্বরূপ, মন ও প্রাণ কি এক, প্রাণের সহিত দেহ ও মনের সম্পর্ক কি, প্রাণ চেনা যায় কি, আমি কি স্বাধীন, অশরীরী আত্মার কি জ্ঞান থাকিবে, প্রাণ কিভাবে দেহে আসা-যাওয়া করে ইত্যাদি| ৯ম প্রস্তাবে স্থান-কাল-শক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং তার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে| তিনি জানতে চেয়েছেন বিজ্ঞান যাদেরকে স্থান, কাল এবং শক্তি নামে অভিহিতি করেছে-এ সকল সত্তার অস্তিত্ব কি সবসময় ছিল, নাকি এরা ঈশ্বরের সৃষ্টি? যদি এরা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে এর আগে ঈশ্বরের অবস্থান কোথায়? 'স্থান' সৃষ্টির আগে বা তিনি কোথায় ছিলেন সময়ের সৃষ্টির পূর্বে? আমাদের দার্শনিক তিনটি সরল প্রশ্নের অবতারণা করেছেন : (১) ঈশ্বর কোন স্থানে অবস্থান করে 'স্থান' সৃষ্টি করলেন? (২) তিনি কোন মুহূর্তে 'কাল' সৃষ্টি করলেন, এবং (৩) তিনি কোন শক্তি বলে 'শক্তি' সৃষ্টি করলেন? উল্লিখিত ৬৮টি প্রশ্ন ছাড়াও আরো কিছু সম্পূরক প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছিলেন পরে যা তাঁর মূল পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে|

সন্দেহ নেই আমাদের ধর্মাচারী পণ্ডিতদের কাছে এসব বিষয় উত্থাপন ও প্রশ্ন করা বেমাক্কা ও বিব্রতকর| আরজ আলী তাঁর পুস্তকের গোঁড়ায় বলেছেন: 'অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন| বাক্যস্ফুরণ আরম্ভ হইলেই শিশু প্রশ্ন করিতে থাকে, এটি কি ওটি কি? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজে ও কাজে-কর্মে অনুরূপ প্রশ্ন চলিতে থাকে, এটি কি? ওটি কি? এরূপ কেন হইল, ওরূপ কেন হইল না ইত্যাদি| এই রকম কি ও কেন'র অনুসন্ধান করিতে করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াচে বিজ্ঞানের অটল সৌধ| তিনি আরও বলেছেন :

> জগতে এমন বিষয় আছে, যেসব বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না| আবার ধর্ম জগতেও মতানৈক্যের অন্ত নাই| .. ..অর্থাৎ সত্যকে বিচারের মাপকাঠি (Criterion of truth) কি? সত্যতা প্রমাণের উপায় (Test of truth) কি এবং সত্যের রূপ কি (Nature of truth)?

অন্যত্র তিনি বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করেই মানুষ সত্যে উপনীত হতে পারে, অন্য কোন পথে নয়| বৈজ্ঞানিক পথ নিয়ে তিনি তাঁর অনুমান গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন| তিনি মনে করেন যে, 'প্রত্যক্ষ ও অনুমানের' ওপর ভিত্তি করেই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব| এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য স্পষ্ট :

> 'বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত| তাই কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমাদের সন্দেহ নাই| বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বিশ্বাস করি| কিন্তু অধিকাংশ ধর্ম এবং ধর্মের তথ্য অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত|'

তরুণদের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা| তিনি বলেছেন :

> মানব সমাজে কুসংস্কারের বীজ উপ্ত হইয়াছিল হাজার হাজার বছর পূর্বে| এখন উহা প্রকাণ্ড মহীরূহের আকার ধারণপূর্বক অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হইয়া বিস্তীর্ণ জনপদ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে| .. .. অতীতে বহু মনীষী কুসংস্কাররূপী মহীরূহের মূলে যুক্তিবাদের কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন, যাহার ফলে বহু মানুষ উহার ছায়াতল হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়ছে মুক্তমনের খোলা মাঠে, আর তরুণ-তরুণীরা ভিড় জমাইতেছে দর্শন-বিজ্ঞানের পুস্পো দ্যানে| .. ..

পরিশেষে আরজ আলী সুধী পাঠকের কাছে আবেদন রেখেছেন বিনম্র চিত্তে :

> এই পুস্তকখানি আদ্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে সুধী পাঠকবৃন্দ বিশ্বসৃষ্টি সম্প র্কে মানবমনের ধারাবাহিক চিন্তা গবেষণা ও সর্বশেষ যুক্তিসম্মত মতবাদের বিষয় জানিতে পারিবেন| এই পুস্ত কখানি প্রণয়নে প্রণেতা হিসেবে তত্ত্বমূলক অবদান আমার কিছু নাই| তত্ত্ব যাহা পরিবেশিত হইয়াছে তাহা সমস্তই সংকলন, আমি সংগ্রাহক মাত্র|

আমি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করলাম এবং এই আলোচনা থেকে নিশ্চয় স্প ষ্ট হয়ে উঠেছে যে বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়তে হলে এদের কারিগড়দের বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী এবং বুদ্ধির মুক্তি চর্চায় নিবেদিত প্রাণ হতে হবে| আর এজন্য জ্ঞান লাভ ছাড়া বিকল্প নেই| আমাদের বিজ্ঞান চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে হবে, যুক্তিবাদী দর্শনের চর্চা করতে হবে| আর সাহিত্যের সাথে সম্যক পরিচিতি গড়ে তুলতে হবে| এর ব্যতিরেকে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধিৎসুপরায়ণ সমাজ গড়ে তোলা যাবে না| আমাদের অন্ধবিশ্বাস, অপবিজ্ঞান, কুসংসকার ও ধর্মন্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম| আর এই লড়াইয়ে জ্ঞানই হবে আমাদের বড় অস্ত্র-তা আমরা অর্জন করতে পারি গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে চোখ-কান খোলা রেখে| এর কোন বিকল্প নেই|

পুস্তক পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন বিষয়ে আমি এখানে দু'জন বিদগ্ধ মনীষীর কথা প্রসঙ্গত বলতে চাই| প্রথমজন হলেন বিজ্ঞানাচার্য অধ্যাপক সত্যেন বোস| ১৯২৪ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের পদার্থবিদ্যার তরুণ শিক্ষক 'আলোক কণা ও প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ তত্ত্ব' শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র লিখেন| এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আলোক কণার সংখ্যায়ন সূত্র নিজের অজান্তেই আবিষ্কার করেন এবং এই সূত্রের প্রয়োগে নতুনভাবে প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন| বোস গবেষণা প্রবন্ধটি জার্মানিতে আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে মতামতের জন্য এবং আইনস্টাইন এটি প্রকাশযোগ্য মনে করলে জার্মানির কোন বিখ্যাত পদার্থবিদ্যার জার্নালে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন|

আইনস্টাইন বোসের নিবন্ধে চমৎকৃত হলেন এবং নিজে প্রবন্ধটি অনুবাদ করে পদার্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত জার্নাল '*Zeits. fur. Physik*'-এ প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন এবং নিবন্ধটির শেষে একটি টীকা জুড়ে দিলেন, 'বোস যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন তা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ| এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমি অন্যত্র গ্যাসের কোয়ান্টাম আচরণ নিয়ে আলোচনা করব|' নিবন্ধটির সাথে আইনস্টাইনকে হাতে লেখা যে চিঠি সংযুক্ত করেছিলেন তাতে লিখেছিলেন যে, 'আপনার কাছে আমি অজ্ঞাত ও অজানা, কিন্তু আপনার লেখার মাধ্যমে আমরা সবাই আমরা আপনার ছাত্র-যা পড়ে আমরা উপকৃত হই এবং জ্ঞান অর্জন করি, কাজেই আপনার কাছে লিখতে আমার কোন সঙ্কোচ নেই|' বোস আইনস্টাইনকে 'গুরুদেব' (My dear master) বলে সম্বোধন করেছিলেন| বোস আবিষ্কৃত ফোটনের সংখ্যায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের পথিকৃৎ এবং 'বোস সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত হয়, তবে পরবর্তীকালে আইনস্টাইন জড়-কণিকার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এই সংখ্যায়নের সাধারণীকরণ করেন| এ কারণে এই সংখ্যায়ন এখন 'বোস-আইনস্টাইন' সংখ্যায়ন নামে অভিহিত| যেসব কণিকা এই সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের বলা হয় 'বোস-কণিকা'|

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত রাজনীতিবিদ, লেখক ও সমাজতন্ত্রবাদী জওহরলাল নেহেরু| সম্ভবত ১৯৫৬ সালে পণ্ডিত নেহেরু বিলেত সরকারের আমন্ত্রণে লন্ডনে যান| তা জানতে পেরে জর্জ বার্নার্ড শ' নেহেরুকে তাঁর বাসায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সাক্ষাতের জন্য| কিন্তু নেহেরু অতি ব্যস্ততার কারণে শ'-এর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি| পরে ভারতে ফিরে গিয়ে নেহেরু শ'এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে একটি চমৎকার চিঠি পাঠিয়েছিলেন যাতে মামুলি ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়াও আধুনিক বিশ্ব গড়ার কাজে শ'-এর বিপুল অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে তাঁর সমাজতান্ত্রিক আদর্শে নেহেরু উদ্দীপ্ত এবং ভবিষ্যৎ ভারত নির্মাণে সমাজতন্ত্রের একটি বড় ভূমিকা থাকবে| তিনি উল্লেখ করেছিলেন ব্যক্তিগত সাক্ষাতে তিনি আরও উপকৃত হতেন| কিন্তু আফসোসের কারণ নেই, "কেননা আমরা, অন্তত আমি, শুধু সাহিত্য ও নাটকে নয়, সমাজ দর্শন গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আপনার লেখার মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করেছি এবং এখনও করছি তা অপরিমেয়| লেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনকে আমি সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি| ভবিষ্যতে হয়তো কোন দিন আপনার সাথে দেখা করার সুযোগ আসবে|'

এই দুজন ব্যক্তির কথায় আমরা দেখলাম যে গ্রন্থের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি| আমরা যেন তা ভুলে না যাই|

অপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ আমার এই অগোছালো কথাগুলি ধৈর্য্য ধরে শোনার জন্য|

অজয় রায় : ইউজিসি অধ্যাপক, সেন্টার ফর এডভান্স রিসার্চ ইন সায়েন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ|

বাংলাদেশে মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার ঐতিহ্য

শাহরিয়ার কবির

১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে| ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নতুন প্রজাতন্ত্রের অন্যতম নীতি হিসেবে গ্রহণ করার পাশাপাশি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল| অথচ স্বাধীনতালাভের চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই বাংলাদেশের প্রধান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়| জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে সংবিধান থেকে বাংলাদেশের মূলনীতি হিসেবে গৃহীত ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ মুছে ফেলেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন| ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাজনীতি ও সমাজের যে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে তার চূড়ান্তরূপ ছিল ২০০১ সালে বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে জামাতে ইসলামীর রাষ্ট্রক্ষমতার শরিক হওয়া—যে দলটি '৭১-এ ইসলামের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল এবং পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহত্যা ও নারী নির্যাতনসহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করেছিল|

২০০১ সাল থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে বাংলাদেশে হরকাতুল জেহাদ ও জামাতুল মুজাহিদীনসহ কয়েক ডজন জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের অস্তিত্বের কথা দেশবাসীর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও জেনেছে| বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এসব জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের অধিকাংশই জামাতে ইসলামীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত| জঙ্গি সংগঠনগুলো বাংলাদেশের গ্রামের দরিদ্র যুবকদের ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করেছে| জামাতে ইসলামী ও তাদের সমচরিত্রের মৌলবাদী সংগঠনগুলো কয়েক হাজার বাংলাদেশী যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আফগানিস্তান, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া, প্যালেস্টাইন ও বার্মায় জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য পাঠিয়েছে| এদের অনেকেই সেই সব দেশে জেহাদ করতে গিয়ে নিহত হয়েছে| অনেকে দেশে ফিরে বিভিন্ন জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি করেছে|

গত শতাব্দীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর আমেরিকা একমাত্র

পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়| আফগানিস্তানে সোভিয়েতপন্থী নজিবুল্লাহর সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য পাকিস্তান, সৌদি আরব ও আমেরিকার সম্মিলিত উদ্যোগের ফসল হচ্ছে তালেবান, যারা পরবর্তীকালে আমেরিকার জন্য ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে| সৌদি আরব ও পাকিস্তানের সহযোগিতায় তালেবান ও আলকায়দা বিশ্বব্যাপী যে জেহাদি নেটওয়ার্ক বিস্তার করেছে বাংলাদেশের কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত|

বাংলাদেশে বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে জঙ্গি মৌলবাদের আশঙ্কাজনক উত্থান সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শক্তির জন্য যেমন মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে একইভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্যও যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়েছে| ২০০৫ সালের ১৫ আগস্ট জামাতুল মুজাহিদীনের জঙ্গিরা মাত্র আধ ঘণ্টার ব্যবধানে ৫০০ বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জানিয়ে দিয়েছে তাদের নেটওয়ার্ক কতটা শক্তিশালী| একই সঙ্গে লিফলেটের মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের সংবিধান, সেক্যুলার আইন ও বিচার বিভাগ, মুক্তচিন্তার মানুষ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে| '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় জামাতে ইসলামী যেভাবে তালিকা প্রস্তুত করে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের হত্যা করেছে, একইভাবে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে জঙ্গি মৌলবাদীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক, সাংবাদিক, বিচারক, আইনজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীসহ বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে| সুপরিকল্পিতভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়সহ সমতল ও পাহাড়ের আদিবাসীদের উপর| এইসব হত্যা ও নির্যাতনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে সেক্যুলার মানবিকতার বোধ নিশ্চিহ্ন করে এ দেশটিকে মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা, যেমনটি তালেবানরা করেছিল আফগানিস্তানে|

২০০৫ সালের বোমা হামলা এবং বহুমাত্রিক সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ডের পর প্রধানত পশ্চিমের চাপে খালেদা জিয়ার সরকার জেএমবির কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় জঙ্গি নেতাকে গ্রেফতার করেছিল, যদিও সরকার প্রথমে এদের অস্তিত্ব অস্বীকার করছিল| গ্রেফতারকৃত শীর্ষ জঙ্গিরা গোয়েন্দা বিভাগের জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলেছে, জোট সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, এমপি এবং জামাতে ইসলামীর সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার কথা| তারা বলেছে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বিভিন্ন ইসলামি এনজিও থেকে কীভাবে তারা অর্থসাহায্য পায় এবং প্রতিবেশী দেশসমূহে তাদের নেটওয়ার্ক কতদূর বিস্তৃত| ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে জঙ্গি মৌলবাদীরা আত্মগোপন করেছে| কেউ কেউ তাদের বন্ধু দেশে হিজরত করেছে| জামাতে ইসলামীর সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যসহ অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত| এই

নেটওয়ার্ক সৌদি আরব ও পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে প্যানইসলামিক বিশ্বব্যবস্থা গঠনের পরিকল্পনার অংশ|

২০০৫ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় জঙ্গি মৌলবাদীরা গ্রেনেড-বোমার হামলা চালিয়ে ২২ জন নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিল যাদের ভেতর ছিলেন কেন্দ্রীয় নেত্রী আইভি রহমান| আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাসহ এই হামলায় দলের শতাধিক নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়েছিলেন| ২০০৬ সালে গ্রেফতারকৃত জঙ্গিরা এই হামলা ও হত্যার দায় স্বীকার করেছে| ২০০৬-এর জানুয়ারিতে দিল্লীতে বাংলাদেশের হরকতুল জেহাদের দুই জঙ্গিকে বিস্ফোরকসহ গ্রেফতার করা হয়েছে| তারাও কবুল করেছে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার সঙ্গে তারা জড়িত ছিল| ২০০৭-এর জানুয়ারিতে ভারতের আসামে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি সংগঠন উলফার এক শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যে স্বীকার করেছে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার সঙ্গে তারাও জড়িত ছিল| এর আগে চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র ধরা পড়ার পর আমরা জানতে পেরেছি বাংলাদেশের জঙ্গিরা বিপুল পরিমাণ এই অস্ত্র অবৈধভাবে আমদানি করেছিল পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিদের জন্য| বাংলাদেশের দক্ষিণের জেলা কক্সবাজার ও বান্দরবানে বার্মার রোহিঙ্গা শরণার্থীরা এমন কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের যুক্ত যাদের সঙ্গে বাংলাদেশের জামাতে ইসলামীর সম্পৃক্তি গোপন কোন বিষয় নয়| বাংলাদেশের হরকাতুল জেহাদের জঙ্গিরা আরাকানেও জেহাদ করতে গিয়েছে| বার্মার হরকাতুল জেহাদ ও জঙ্গি রোহিঙ্গাদের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করে জামাতের মালিকানাধীন ইসলামী ব্যাংক| এভাবেই বাংলাদেশের জঙ্গিদের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জঙ্গিদের সৌহার্দ্যের সম্প র্ক ও নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে|

সরকার ও প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া জঙ্গি মৌলবাদীদের নেটওয়ার্ক বিস্তার সম্ভব নয়| বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে জঙ্গিদের বিস্তার ঘটেছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়| বিভিন্ন দেশে সরকারের অপশাসন, দুর্নীতি, দারিদ্র এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও প্রান্তিক জাতিসত্তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্যাতনও জঙ্গিবাদের ক্ষেত্র তৈরি করে| যে সব দেশে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটেছে একসময় তা সরকারের জন্যেও বিড়ম্বনার কারণ হয়েছে| তারপরও জঙ্গি মৌলবাদের বিরুদ্ধে মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না| বাংলাদেশে আমরা বিগত জোট সরকারের সময়ে দেখেছি জঙ্গি মৌলবাদের উত্থান সম্প র্কে সিভিল সমাজের উদ্বেগের প্রতি সরকার বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি যতক্ষণ না চাপ এসেছে পশ্চিমের দাতা দেশসমূহ থেকে| কোথাও সরকার জঙ্গিদমনে আন্তরিক হলেও জঙ্গিদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় নেটওয়ার্কের কারণে তাদের প্রতিহত করা কঠিন হয়ে পড়েছে| দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সরকার চাইলে সার্ক-এর কাঠামোর ভেতরে কিংবা পৃথকভাবে জঙ্গি মোকাবেলার জন্য একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করা যেতে পারে|

সব ধর্মের ভেতরই মৌলবাদের উপাদান রয়েছে| তবে বর্তমানে ইসলামের নামে জঙ্গি মৌলবাদের যে গ্লোবাল উত্থান ঘটেছে তেমনটি অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে ঘটেনি| মুসলিমপ্রধান দেশসমূহে জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনগুলোর ভেতর শক্তিশালী আন্ত ঃরাষ্ট্রীয় নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে গত ২০ বছরে| তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই সব দেশে মৌলবাদের বিরুদ্ধে যারা লড়ছে সেই সব সেক্যুলার গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তির ভেতর কোন কার্যকর যোগসূত্র এখনও গড়ে ওঠেনি| জঙ্গি মৌলবাদের কারণে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, নারীর সমঅধিকার, মুক্ত চিন্তা, বিজ্ঞান ও শিল্পসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে| জঙ্গি মৌলবাদীরা সন্ত্রাস ও হত্যার মাধ্যমে সমাজে আতঙ্কের আবহ সৃষ্টি করছে, মানুষকে নিয়তিবাদী ও সহিংস করে তুলছে| ধর্মান্ধতা ও ধর্মোন্মাদনা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস ও ঘৃণা| ধর্মের নামে হত্যা ও সন্ত্রাসকে বৈধতা প্রদান করা হচ্ছে| এই পরিস্থিতি বিশ্বশান্তি ও বিশ্বসভ্যতার জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে| তাই সময়ের দাবি হচ্ছে— মৌলবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে আন্দোলনরত সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শক্তির কার্যকর নেটওয়ার্ক গঠন, যাতে প্রতিরোধের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়|

দুই

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হচ্ছে প্রথম দেশ যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছিল| ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল তার ভিত্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিত্বের চেতনা| ১৯৭২ সালে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র নতুন প্রজাতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়| বিশ্বের বৃহত্তম সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের সংবিধানে সেক্যুলারিজমের অন্তর্ভুক্তি ঘটে ১৯৭৬ সালে|

বাংলাদেশে সেক্যুলারিজমের ধারণা পশ্চিমের চেয়ে বহুলাংশে স্বতন্ত্র| বাংলাদেশে এবং ভারতেও সেক্যুলারিজম বলতে বোঝায় রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছিন্নতা (Separation of state from religion), ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা নয়| ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : "*ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়| তাতে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে| আমরা আইন করে ধর্মকে নিষিদ্ধ করতে চাই না এবং করব না| মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে| তাদের বাধা দিবার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নেই| হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দিবার মত ক্ষমতা নেই| বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খৃষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে| তাদের কেউ*

বাধা দিতে পারবে না| আমাদের শুধু আপত্তি হলো, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না| ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরী, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে| ধর্ম অতি পবিত্র জিনিষ| পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না| যদি কেউ বলে যে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে— আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি| সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেছি|' (গণপরিষদের ভাষণ, ১২ অক্টোবর ১৯৭২)

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য '৭২-এর সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল যা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে কোন সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দেশে সম্ভব হয়নি| এই সংবিধান কার্যকর থাকলে বাংলাদেশে বর্তমানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার ও জঙ্গি মৌলবাদের জেহাদি উন্মাদনা দেখতে হতো না|

'৭২-এর সংবিধানে সেক্যুলারিজমকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের পর এটি দুই ধরনের সমালোচনা শিকার হয়| এক পক্ষ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, যারা ইসলামকে মনে করে পরিপূর্ণ জীবনবিধান যা রাষ্ট্র-রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে| অপরপক্ষ হচ্ছে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা যারা পশ্চিমের প্রভাবে ধর্মকে ব্যক্তি ও সমাজজীবন থেকে নির্বাসনের পক্ষে|

মৌলবাদীরা মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে আক্রমণ করেছে এই বলে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ হচ্ছে নাস্তিকতা, রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলে মানুষের ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা থাকবে না| মৌলবাদী নয়, এমন দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা ছিল : '৭২-এর সংবিধানপ্রণেতারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানে ঢুকিয়ে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মের প্রতি অনুরাগের বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন| শতকরা ৮৫% মুসলমানের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না|

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগী যারা '৭২-এর সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তারা ধর্মকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে পৃথক করার কথা বললেও ব্যক্তিজীবনে ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন| ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বার বার তাদের বলতে হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়|

অপরদিকে বামপন্থীরা মুজিবের সেক্যুলারজিম সম্পর্কিত ধারণাকে গোঁজামিল আখ্যা দিয়ে বলেছেন সেক্যুলারিজমের অর্থ হচ্ছে ইহজাগতিকতা, রাষ্ট্র ও সমাজের কোথাও ধর্মের স্থান থাকবে না, কারণ ইহজগতের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই| এদের সমালোচনার বিষয় ছিল, সরকারি বেতার ও টেলিভিশনে সব ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও আলোচনা, এমনকি রাজনৈতিক দলের মহাসমাবেশের আরম্ভে সব ধর্মগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি সেক্যুলারিজমের পরিপন্থী| সেক্যুলার ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (NAM) সদস্য হয়েও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের OIC শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান

এবং এর সদস্যপদগ্রহণও তখন সমালোচিত হয়েছিল| মুজিব সরকার কর্তৃক ইসলামিক একাডেমিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে রূপান্তর, মদ্যপান ও ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয় খরচে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ এ-সবই তখন সেক্যুলারিজমের বিচ্যুতি হিসেবে সমালোচিত হয়েছিল| বঙ্গবন্ধুর সেক্যুলাজিরমকে বামপন্থীরা pseudo-secularism বলেছেন যেমনটি তারা বলেন ভারতের সেক্যুলারিজম সম্পর্কে| অথচ ৪০ বছর পর পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা উপলব্ধি করছি '৭২-এর সংবিধানপ্রণেতারা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ধর্মের অবস্থানকে মেনে নিয়ে রাজনীতি ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে দূরে রাখার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার যে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন সেটা আমাদের মতো দেশের জন্য সর্বোত্তম|

তিন

বাংলাদেশের চার হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব সেক্যুলারিজমের চেতনা এদেশে পশ্চিম থেকে আমদানি করা হয় নি| ভারতবর্ষে যখন প্রথম বৈদিক ধর্মের প্রবর্তন হয় তখন থেকেই উদ্ভব ঘটেছে ধর্মের বিরোধী চিন্তা| খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগে চার্বাক দর্শন ঈশ্বর, পরলোক, স্বর্গ, নরক, জন্মান্তর প্রভৃতি বৈদিক ধর্মের মূল বিষয়সমূহ অস্বীকার করে ভারতীয় উপমহাদেশে বস্তুবাদী দর্শনের জন্ম দিয়েছে| ঋকবেদে এই দর্শনের আদি গুরু বৃহস্পতি বলেছেন, 'বস্তুই হচ্ছে চরম সত্তা'| চার্বাক দর্শনের অনুসারীরা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগের কথা বলেছেন| এই ভোগবাদ ধর্মবিশ্বাসীদেরও প্রভাবিত করেছিল| হিন্দুর বৈদিক ধর্মকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে এসেছিল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম যা বৈদিক ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে নাস্তিকতা হিসেবে|

নাস্তিকতার প্রভাবে বাঙালি হয়েছে সেক্যুলার| তবে বাঙালির চেতনায় সেক্যুলারিজম ধর্মের বহু আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সহঅবস্থান করেছে বিশেষভাবে যে সব আচার-অনুষ্ঠান পার্থিব প্রাপ্তির সন্ধান দেয়|

অধ্যাপক আহমদ শরিফ বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলেছেন : 'আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ, তাই ভাষার নাম বাঙলা এবং তাই আমরা বাঙালী| আমরা এদেশেরই জলবায়ু ও মাটির সন্তান| প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এদেশের মাটির পোষণে, প্রকৃতির লালনে এবং মানুষের ঐতিহ্য-ধারায় আমাদের দেহ-মন গঠিত ও পুষ্ট| আমরা আর্য নই, আরবি, ইরানি কিংবা তুর্কিস্তানিও আমরা নই| আমরা এদেশেরই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বংশধর| আমাদের জাত আলাদা, আমাদের মনন স্বতন্ত্র, আমাদের ঐতিহ্য ভিন্ন, আমাদের সংস্কৃতি অনন্য|

'আমরা আগে ছিলাম animist, পরে হলাম pagan, তারও পরে ছিলাম হিন্দু-বৌদ্ধ, এখন আমরা হিন্দু কিংবা মুসলমান| আমরা বিদেশের ধর্ম নিয়েছি, ভাষা নিয়েছি, কিন্তু তা কেবল নিজের মতো করে রচনা করবার জন্যেই| তার প্রমাণ নির্বাণকামী ও নৈরাত্ম-নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ এখানে কেবল যে জীবনবাদী হয়ে উঠেছিল, তা নয়, অমরত্বের সাধনাই ছিল তাদের জীবনের ব্রত| বৌদ্ধচৈত্য ভরে উঠেছিল অসংখ্য দেবতা ও উপদেবতার প্রতিমায়| হীনযান-মহাযান ত্যাগ করে এরা তৈরি করেছিল বজ্রযান-সহজযান, হয়েছিল থেরবাদী| এতে নিহিত তত্ত্বের নাম গুরুবাদ|

'সে জীবনবাদী, তাই বস্তুকে সে তুচ্ছ করে না, ভোগে নেই তার অবহেলা, তাই জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যা কর্তব্য, তাতেই সে উদ্যোগী| সেজন্যেই সে তার গরজমতো জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার দেবতা সৃষ্টি করেছে| পারলৌকিক সুখী জীবনের কামনা তার আন্তরিক নয়— পোশাকই| তাই সে মুখে

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করেছিল, অন্তরে কোনো দিন বরণ করেনি| তার পোশাকি কিংবা পার্বণিক জীবনে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং আচার আবরণ ও আভরণের মতো কাজ দিয়েছে, কিন্তু তার আটপৌরে জীবনে ঠাঁই পায়নি|' (বাংলা, বাঙালী ও বাঙালিত্ব, অনন্যা ঢাকা, ২০০১)

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মকে বাঙালি যেভাবে নিজের বস্তুবাদী চেতনার উপযোগী করে গ্রহণ করেছে পরবর্তীকালে একইভাবে গ্রহণ করেছে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মকে| ইসলাম এ দেশে এসেছে এক হাজার বছর আগে এবং তা প্রচারিত হয়েছে সুফিদের দ্বারা| দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সুফিরা তলোয়ারের জোরে নয়, মানবপ্রেম অবলম্বন করে ইসলাম প্রচার করেছেন| হিন্দু ধর্মের বর্ণবৈষম্যের শিকার নিম্নবর্ণের মানুষ ব্রাহ্মণের সমান হওয়ার জন্য কিংবা পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকদের অনুগ্রহভাজন হওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে| তবে এই ইসলাম আরবের বিশুদ্ধ মুতাকাল্লিমিন ইসলাম ছিল না| ইরানে উদ্ভূত সুফিবাদের উপর মুতাজিলাদের প্রভাবের ফলে কিতাবসর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে উদারনৈতিক মানবিকতার যে পরিচয় ইসলামে পাওয়া যায় তা এতদঞ্চলের মানুষদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল|

ইসলামে নৃত্যকলা, সঙ্গীত ও চিত্রকলা নিষিদ্ধ| সুফিরা মুতাজিলাদের মতো এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে এর চর্চা করেছেন| বিশেষভাবে চিশতিয়া ও সোহরাওয়ার্দী তরিকার সুফিদের প্রভাবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চায় মুসলিম শিল্পীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন| উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যশিল্পের বিকাশেও মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন| বাংলার হিন্দু জমিদাররা লক্ষ্ণৌ, জয়পুর, আগ্রা ও এলাহাবাদ থেকে মুসলিম ওস্তাদ ও বাঈজীদের আনতেন দুর্গোৎসবে কিংবা কোন পারিবারিক উৎসবে|

সুফিবাদের সাম্য ও মানবিকতা বাংলার সনাতন হিন্দু ধর্মকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ হচ্ছে মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম| বৈষ্ণব কবিদের রচনায় মানবপ্রেম নানাভাবে মূর্ত হয়েছে| এ সময়ের কবি চন্ডিদাসই মানবতার শাশ্বত বাণী উচ্চারণ করেছিলেন : 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই|'

এর আগে চর্যাপদের যুগে বৌদ্ধ কবিরাও মানবিকতার জয়গান গেয়েছেন এবং জীবনবিমুখ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সমালোচনা করেছেন| এগারশ বছর আগে চর্যাপদকর্তা সরহপার একটি দোহা গানের কথা হচ্ছে—

'কী হবে তোর দীপে, কী হবে তোর নৈবদ্যে?/ কী হবে তোর মন্ত্র ও সেবায়?/ তীর্থে তপোবনে গিয়েই বা তোর কী হবে?/ মোক্ষ কি লাভ হয় জলে স্নান করে?'

(চর্যাগীতি পদাবলী, সম্পাদনা সুকুমার সেন, কলকাতা ১৯৬৬)

এরই চূড়ান্ত রূপ আমরা পাই ফকির লালন শাহ ও তার সগোত্রীয় বাউলদের গানে| দেড়শ বছর আগে লালন লিখেছেন, 'এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে / যবে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান জাতিভেদ নাহি রবে|'

লালন আরও বলেছেন, 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে/ লালন কয় জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে .../ জগৎ জুড়ে জাতের কথা/ লোকে গল্প করে যথাতথা/ লালন বলে জাতের ফাতা/ ডুবাইছি সাত বাজারে|'

লালনের বহু গানে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে| লালনের মানবিক সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও প্রভাবিত করেছিল| তবে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ দেশ ও কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়| তাঁর *Religion of Man*-এ তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন : 'My religion is the reconciliation of the super-personal man, the universal human spirit in my own individual being.'

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম তার কবিতায় ভগবানের বুকে লাথি মেরে মানবতার জয়গান গেয়েছেন এই বলে— 'গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে নহে কিছু বড়, নাহি কিছু মহিয়ান|' নজরুলের সমসাময়িককালে ১৯২৫ সালে কলকাতায় সূচিত হয়েছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'র আন্দোলন যা শহরের শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে| আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেন এই আন্দোলনের সূচনা করেছেন, যার শে-াগান ছিল— 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব|' এদের সমসাময়িক বাঙালি এমএন রায় 'রেডিক্যাল হিউম্যানিজম' আন্দোলনের জন্ম দিয়েছেন, যার ভিত্তি হচ্ছে যুক্তি-নীতি-স্বাধীনতা| তিনি মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন| তাঁর লক্ষ্য ছিল সকল প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তি| উনিশ শতকে বাংলার বিদ্বৎ সমাজে ইউরোপের রেনেসাঁর প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার চর্চা যেমন নতুন মাত্রা লাভ করে, ইংরেজ শাসকদের উপনিবেশ-নীতি— ধর্মে ধর্মে বিভাজন ও বিরোধকে সমানভাবে উৎসাহিত করেছে|

চার

গ্রাম-বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিতে সেক্যুলার মানবিকতার বোধ যতটা প্রবল নগরকেন্দ্রিক বিত্তবান এলিটদের চেতনায় ততটা কখনও ছিল না| বাঙালির লোক-ঐতিহ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান ধর্মের এক ধরনের সমন্বয় ঘটেছে যা গ্রাম বাংলার বাউল, জারি, সারি গানে, কবি গানে, বাংলা নববর্ষ, চৈত্র সংক্রান্তি ও নবান্নর উৎসবে আমরা দেখতে পাই| এসব সাংস্কৃতিক আয়োজন একান্ত ভাবেই সেক্যুলার, যা শত শত বছর ধরে গ্রাম বাংলার মানুষ চর্চা করেছে|

রাজা ও ভূস্বামীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে বিভিন্ন সময়ে ধর্মে ধর্মে বিরোধ ও হানাহানির ঘটনা ঘটলেও গ্রাম বাংলার মানুষ তাতে খুব একটা সাড়া দেয়নি| এমনকি ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে এখনও হিন্দুরা যেমন মুসলিম পীরের মাজারে গিয়ে মানত করেছে, মুসলমানরাও বিপদের সময় হিন্দুদের অনেক কাল্পনিক দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়েছে, যাদের ভেতর সত্যনারায়ণ, ওলাইচণ্ডী, শীতলা দেবী, বনদেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে|

হিন্দুদের সত্যনারায়ণ ছিলেন মুসলমানদের সত্যপীর| মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে 'সত্য'র সাধনা করেছেন|

সেই সময়ে সত্য পীর বা সত্যনারায়ণকে বন্দনা করে বহু পুঁথি লেখা হয়েছিল| একটি পুঁথিতে বলা হয়েছে—'হিন্দুর দেবতা হইল মুসলমানের পীর/ দুই কুলে সেবা লয় হইয়া জাহির|/ ...মক্কার রহিম আমি অযোধ্যার রাম/ কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ|'

এইসব দেবদেবী কিংবা পীর মুর্শিদের কাছে হিন্দু মুসলমান গিয়েছে পার্থিব প্রয়োজনে, পরকালে কিছু প্রাপ্তির আশায় নয়| বাঙালির চেতনায় পরকালের চেয়ে ইহকাল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ| মধ্যযুগে বহু বাঙালি মুসলমান কবি হিন্দুর দেবদেবীর বন্দনা করে কবিতা লিখেছেন, হিন্দু কবি ও শিল্পীরা মুসলিম পীর-মুরশীদ ও শাসকদের বন্দনা করেছেন, তাদের রাজসভা অলংকৃত করেছেন|

তবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এটাও আমরা দেখেছি এক শ্রেণীর গোঁড়া ধর্মপ্রচারক বাংলায় সাধারণ মানুষের জীবনে সেক্যুলার জীবনযাপন বা ধর্মসমন্বয়ের আচরণকে সহজভাবে গ্রহণ করেননি| মধ্যযুগে দিল্লীতে সম্রাট আকবরের 'দীন ই এলাহী'র মাধ্যমে সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদ্যোগ এবং বাংলায় সুফি-বৈষ্ণবদের সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবধর্মের আবাহনকালে আবির্ভাব ঘটেছিল শেখ আহমদ সিরহিনদ-এর নেতৃত্বে একদল কট্টর ওলামার, যাদের লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের প্রভাব থেকে মুসলমানদের বের করে আনা এবং শরিয়তের বিধানসমূহ কঠোরভাবে পালন করা| এরই ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় ওহাবি আন্দোলনের সূচনা হয়েছে| শুরুতে ওহাবিরা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও পরে তাদের বিরোধিতার লক্ষ্য ছিল ভারতের অমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং আখেরে ইসলামি হুকুমত কায়েমের উদ্যোগ|

বাংলার নগরকেন্দ্রিক এলিট মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশ সবসময় ধর্মকে পরিচয়ের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে গিয়ে আর্যদের মতো বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছে| বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু-ফারসি এ বিতর্ক বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গড়িয়েছে| এ বিষয়ে সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবি আবদুল হাকিমের কঠোর মন্তব্য ছিল—

'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি|'

এর একশ বছর পর অষ্টাদশ শতকে রামনিধি গুপ্তের গানেও বলা হয়েছে—

'নানান দেশে নানান ভাষা/বিনে স্বদেশীয় ভাষে পুরে কি আশা|'

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় বহু গান ও কবিতা লেখা হয়েছে যেখানে সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল| বাঙালি এলিট মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট মোচনের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বিজয় পর্যন্ত| অথচ গ্রামবাংলায় সাধারণ

বাঙালি জীবনে এ ধরনের পরিচয়ের সংকট ছিল না, তার সর্বধর্ম সমন্বয়ের মানবতাবাদী ঐতিহ্যের কারণে|

পাঁচ

বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বহুমত ও পথের স্বীকৃতি মূর্ত হয়েছে বাংলার সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, যাত্রা ও মেলার উৎসবে| গ্রাম বাংলার এই সংস্কৃতির প্রধান উপাদান ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং সেক্যুলার| ধর্মের মানবিক উপাদানকে নাকচ না করেও যে সেক্যুলারিজমের চর্চা করা যায় বাংলাদেশ তার একটি উদাহরণ হতে পারে|

মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার মানুষকে সেক্যুলার হতে সাহায্য করে এবং বিজ্ঞানে ও ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই, এ-সবই সত্য| কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষ ধর্মের ভেতর বাস করছে ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করে তাকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ রাখাই সেক্যুলার মানবতাবাদীদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ| ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট শাসকরা সফল হতে পারেনি| জাতি-ধর্ম-বর্ণের অহংকার ও ঔদ্ধত্য সম্পর্কে মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজন সেক্যুলার মানবিকতার ধারাবাহিক ও বহুমাত্রিক চর্চা|

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় মৌলবাদের সাম্প্রতিক উত্থানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ অবশ্যই আছে| সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে| সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশে জঙ্গি মৌলবাদীরা প্রধানত সৌদি আরব, মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তানের বিপুল আর্থিক সমর্থনে পুষ্ট হয়েছে| বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কখনও মৌলবাদী নয়| মৌলবাদী হওয়ার উপাদান তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নেই| সরকার এবং বাইরের সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে বাংলাদেশের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি যে টিকে থাকতে পারবে না আমাদের হাজার বছরের সেক্যুলার মানবিকতার ইতিহাস তার প্রমাণ|

শাহরিয়ার কবির : বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক| মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্যচিত্র নির্মাতা| শহীদ জননী জাহানারা ইমামের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির বর্তমান সভাপতি|

ওষুধ নিয়ে নয়ছয়!

মুনীরউদ্দিন আহমদ

আমরা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হই| অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হওয়া মানেই শরীরের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন ঘটা| শরীরের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন ঘটলে আমরা নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ গ্রহণ করি| আমাদের একটা সহজ সরল ধারণা রয়েছে| ধারণাটি এরকম-রোগ-শোকের উপর মানুষের কোনো হাত নেই| ইহজগতে জীবন যেমন সত্য, রোগ-বিমারিও তেমনি একটি বাস্তব সত্য এবং জীবনের অবিচ্ছেদ্দ অংশ| এটা প্রাকৃতিক নিয়ম| সব রোগের ওপর হয়তো আমাদের হাত নেই| কিন্তু একটু সচেতন হলে বা স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করলে দৈনন্দিন জীবনে বহু রোগ থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি| যেমন ধরুন, সমাজের অনেকেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করেন এবং প্রতিনিয়তই বাইরে হোটেল-রেস্তোরাঁয় দূষিত পানি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাওয়া দাওয়া করেন| এভাবে দূষিত পানি ও পচা-বাসি খাবার খেলে যে কেউই কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েড বা হেপাটাইটিসের মত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন| এ ধরনের ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হলে আমরা ছুটে যাই চিকিৎসকের কাছে| চিকিৎসক রোগ প্রতিকারে প্রেসক্রিপশনে একগাদা ওষুধ লিখে দেন| আবার অসতর্কতা ও অসচেতনতার কারণে যে রোগগুলোর উৎপত্তি হয়, সেগুলো জ্বর, সর্দি কাশির মত কোন সাধারণ রোগ নয়| এসব মরণঘাতী রোগের কারণে মৃত্যু ছাড়াও স্বাস্থ্যহানি বা অঙ্গহানি অবশ্যম্ভাবী| আমরা অনেকেই এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি| আমরা ভাবি রোগ হলে প্রতিকারের জন্য ওষুধ রয়েছে, তাই প্রতিরোধের এত গুরুত্ব কী| ফলে বুঝে না-বুঝে আমরা মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে থাকি|

কিন্তু রোগব্যাধি যেমন আমাদের জন্য সুখকর কোন ব্যাপার নয়, ওষুধও তেমনি সম্পূর্ণ নিরাপদ কোন বস্তু নয়| অথচ ওষুধকে আমরা খুব হালকাভাবে গ্রহণ করি| প্রতিটি ওষুধেরই কমবেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা বিষক্রিয়া রয়েছে-এ কথাটি আমাদের সবার খুব গুরুত্বসহকারে মনে রাখা উচিত| কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে ওষুধের যুক্তিহীন ব্যবহার ও প্রয়োগ এক অন্যতম সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে| ওষুধ ব্যবহারের সমস্যা জানতে হলে, ওষুধের নিরাপদ, যুক্তিসঙ্গত এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে, সমস্যার উৎস, সমস্যা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা এবং তাদের মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য| সমস্যা চিহ্নিত না হলে ওষুধের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োগ এবং এর প্রকৃত উন্নয়ন কোন মতেই সম্ভব নয়| উদাহরণস্বরূপ দেশের হাজারো ক্লিনিক, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো ওষুধের অপব্যবহার আর অপপ্রয়োগের মূল উৎসগুলোর অন্যতম| অনিয়ন্ত্রিত ওষুধের ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে

ওষুধের অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগের দিক থেকে ড্রাগ স্টোরগুলোর অবস্থান বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে| ডিগ্রিধারী ফার্মাসিস্টের অভাবে এবং ওষুধ ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে, অজ্ঞ-অশিক্ষিত লোকজন দ্বারা ড্রাগ স্টোর পরিচালিত হয় সাধারণত অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের দোকানের মত| কিন্তু ওষুধের দোকান আর মুদি দোকান বা কাপড়ের দোকান এক হতে পারে না|

ওষুধের অযৌক্তিক প্রয়োগের বড়ো উৎস হলো চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় ও প্রেসক্রিপশন| চিকিৎসক ঠিকমতো রোগ নির্ণয় করে যুক্তিসঙ্গতভাবে ওষুধ প্রদান না করলে রোগী ওষুধের অপব্যবহারজনিত সমস্যার শিকার হবে| চিকিৎসক তার দায়িত্ব সঠিক ও নির্ভুলভাবে পালন করলেও ওষুধের ডিসপেন্সিং যুক্তিসঙ্গত বা সঠিক না হলে রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হবে| অন্যদিকে, প্রেসক্রিপশনে প্রদত্ত ওষুধ সম্পর্কে রোগীকে পর্যাপ্ত ও প্রকৃত তথ্য, পরামর্শ বা উপদেশ প্রদান করা না হলে, যুক্তিহীন ব্যবহারের কারণে রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে| রোগীর জন্য প্রেসক্রিপশনে ওষুধ প্রদানে চিকিৎসক যত সর্তকতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করবেন, রোগী তত বেশি উপকৃত হবে| রোগপ্রতিকার ও প্রতিরোধে চিকিৎসকদের ভূমিকাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই|

আমাদের দেশে একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে| চিকিৎসক আসলে ওষুধ ছাড়াই রোগীর অর্ধেক রোগ ভালো হয়ে যায়| এর পেছনে 'বৈজ্ঞানিক সত্য' রয়েছে| কারণ রোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় শরীর ও মনের যোগসূত্র অভিন্ন| উন্নত বিশ্বে প্রকৃত চিকিৎসা শুরুর আগেই চিকিৎসকগণ প্রায়শই রোগীকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে চাঙ্গা করার উদ্যোগ নেন| রোগীকে তার রোগ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রদান এবং চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিত করতে চিকিৎসকগণ সদা সচেষ্ট থাকেন| এতে রোগীর আস্থা ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়| রোগীও সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তথ্য জানার জন্য চিকিৎসককে প্রশ্ন করার অধিকার রাখেন| ফলে রোগ নির্ণয় ও ওষুধ প্রয়োগে ভুল কম হয় বলে ওষুধের অপব্যবহারও কমে আসে|

তারপরও দেখা গেছে, বিশ্বজুড়ে চিকিৎসকগণ তাদের প্রেসক্রিপশনে যেসব ওষুধ লিখে থাকেন তার সবগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে লিখেন না| ওষুধের এই অযৌক্তিক প্রয়োগের পেছনে বহুবিধ কারণ কাজ করে| বহু চিকিৎসক পেশাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে রোগীকে সঠিক ওষুধ প্রদানে সক্ষম হন না| জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব চিকিৎসক নিজেদের যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন না| এসব চিকিৎসক সাধারণত সনাতনী পদ্ধতিতে যুগ যুগ ধরে সেকেলে মানসিকতা নিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যান বলে রোগ নির্ণয় বা ওষুধ প্রদানে প্রায়শই ভুল হয়| আমাদের মত দেশে অতিমাত্রায় ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারণে রোগীর প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে চিকিৎসকগণ অসর্তকতা ও অবহেলার কারণে রোগীকে

সঠিক চিকিৎসা প্রদানে ব্যর্থ হন| অন্যদিকে পৃথিবী জুড়েই বহু চিকিৎসক ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক প্রভাবান্বিত ও প্রলুব্ধ হয়ে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর এবং সস্তা ওষুধের পরিবর্তে দামি ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখে থাকেন| ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধ বাজারজাত করার পর ওষুধ প্রমোশনে 'সর্বশক্তি' নিয়োগ করে থাকে তাদের ওষুধের কাটতি বাড়ানোর জন্য| উন্নত ও অনুন্নত দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদিত ওষুধের প্রমোশনে রাজনৈতিক 'লবিং'-এ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে থাকে| প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ব্যয়ভার বহন করতে হয় নিরীহ ক্রেতা বা রোগীকেই| ওষুধের কাটতি বাড়ানোর জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলোর মূল লক্ষ্য চিকিৎসক| কারণ চিকিৎসকগণ প্রেসক্রিপশনে যে ওষুধ লিখেন, রোগী মূলত সেই ওষুধই কিনে থাকে|

অধিক হারে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ওষুধ কোম্পানিগুলো সাধারণত টনিক, ভিটামিন, হজমীকারক, বলবৃদ্ধিকারক, এনজাইম, কফমিকচার, এলকালাইজার জাতীয় অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধ উৎপাদনে বেশি তৎপর থাকে| কারণ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের চেয়ে এসব তথাকথিত ওষুধের ওপর মুনাফার হার বহুগুণ বেশি| এ মুনাফার হার আরো অধিক গুণে বেড়ে যায় যখন চিকিৎসকগণ তাদের প্রেসক্রিপশনে এসব ওষুধনামধারী পণ্য নির্বিচারে গ্রহণের নির্দেশনা (প্রেসক্রাইব) দিয়ে থাকেন| ওষুধ কোম্পানির সাথে এসব ওষুধ প্রেসক্রাইবারদের সম্পর্ক যতটা না পেশাগত তার চেয়ে বেশি ব্যবসায়িক| এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অগ্রগামী হলেও ছোট-বড়, প্রতিষ্ঠিত-অপ্রতিষ্ঠিত প্রতিটি ওষুধ কোম্পানি চিকিৎসকদের পেছনে কমবেশি অর্থ ব্যয় করে থাকে| ব্রিটেনে চিকিৎসক পিছু ওষুধ কোম্পানিগুলো প্রতি বছর দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করে| বাংলাদেশে এই ব্যয়ের পরিমাণ কত তা কে জানে? তবে আন্দাজ করা যায় আমাদের বাজারদরের তুলনায় মোটেই তা কম নয়!

এ গেলো অর্থের কথা| অর্থ ছাড়াও ওষুধ-কোম্পানিগুলো চিকিৎসকদের প্রচুর পরিমাণ ওষুধ বিনামূল্যে স্যাম্পল হিসাবে উপহার দিয়ে থাকে| অভিজ্ঞমহল মনে করেন এ ধরনের বিনামূল্যের স্যাম্পল আর ঘুষের মধ্যে পার্থক্য অতি নগণ্য| স্বভাবতই প্রশ্ন আসে-চিকিৎসকগণ এই বিনামূল্যের স্যাম্পল কেন গ্রহণ করেন বা এই ওষুধ নিয়েই বা তারা কি করেন? এভাবে বিনামূল্যের স্যাম্পল নেয়া বা দেয়া নীতিগতভাবে বৈধ হতে পারে না| এভাবে বিনামূল্যের স্যাম্পল দেয়া বা নেয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার সময় এসেছে|

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও প্রেসক্রিপশনে প্রদত্ত ওষুধের পরিমাণ নেহায়েত কম নয়| এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চিকিৎসকগণ ব্যবস্থাপত্রে যেসব ওষুধ লিখে থাকেন তার মধ্যে অকেজো বা অপ্রয়োজনীয় ওষুধের পরিমাণ প্রায় তেত্রিশ শতাংশ| ফ্রান্সে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ডেন্টাল সার্জন কর্তৃক

প্রদত্ত অ্যান্টিবায়োটিকের শতকরা ৪৫ ভাগই অপ্রয়োজনীয় বলে অভিজ্ঞমহল মত পোষণ করেন| বয়স্ক লোকদের বেলায় ওষুধ প্রয়োগের ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসার নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না বলে অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে| এসব অপ্রয়োজনীয় ওষুধ সেবনের নির্দেশ দেয়ার জন্য চিকিৎসকদের অমনোযোগ এবং অজ্ঞতাকে দায়ী করা হয়| ব্রিটেনে এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে-সব মহিলা সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয় তাদের অনেককে প্রসবের আগের রাত্রিতে ঘুমের ওষুধ প্রদান করা হয়| গর্ভবতী মায়েদের এভাবে ঘুমের ওষুধ প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেও এর সত্যিকার জবাব পাওয়া যায় নি| প্রশ্ন উঠেছে সত্যিকার অর্থে এ ওষুধ কার জন্য? মা নাকি বাচ্চার জন্য? নাকি চিকিৎসক ও মেডিক্যাল স্টাফদের জন্য, যারা রাত্রিতে শান্তিতে ঘুমাতে চান?

তৃতীয় বিশ্বের মত আমাদের দেশেও সবচেয়ে বেশি অপব্যবহৃত ওষুধগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক, সিডেটিভ, অ্যান্টিডায়ারিয়াল, ভিটামিন, টনিক, কফমিকচার, স্টেরয়েড, অ্যান্টিহিস্টামিন, অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ| টনিক ভিটামিনের প্রতি মানুষের অকৃত্রিম দুর্বলতা রয়েছে| এ দুর্বলতার কারণ ওষুধ কোম্পানিগুলোর অনৈতিক ড্রাগ প্রমোশন এবং চিকিৎসক কর্তৃক এসব ওষুধের ঢালাও প্রয়োগ| টনিক ও ভিটামিন সম্পর্কে অনেক চিকিৎসকসহ ওষুধ কোম্পানিগুলো যেসব ভ্রান্ত ধারণা জনসমক্ষে তুলে ধরে তার মধ্যে রয়েছে টনিক ও ভিটামিন সেবনে নাকি ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার হয়, বয়স্কদের যৌবন প্রাপ্তি, শিশুদের মেধা ও বয়োঃবৃদ্ধি, ত্বকের শ্রীবৃদ্ধি, চুল পড়া বন্ধ হয় ইত্যাদি| এসব বক্তব্যের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও বহু চিকিৎসক প্রায়শই এসব বস্তু প্রেসক্রিপশনে লিখে থাকেন| রোগী প্রয়োজনীয় মনে করে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে এসব ওষুধ কিনে থাকে| এ অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার স্পষ্টতই প্রবঞ্চনার শামিল|

ওষুধের অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহারের ফলে রোগী বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়| প্রেসক্রিপশনে প্রদত্ত ওষুধের কোনটি প্রয়োজনীয় আর কোনটি অপ্রয়োজনীয় বা প্রদত্ত ওষুধের সাথে সৃষ্ট রোগের আদৌ সম্পর্ক রয়েছে কি না এসব প্রশ্ন উপস্থাপন করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা রোগীরা সচরাচর রাখে না| ফলে রোগী প্রেসক্রিপশন মোতাবেক ওষুধ কিনতে ও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়| প্রেসক্রিপশন মোতাবেক অপ্রয়োজনীয় ওষুধ কিনলে রোগী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়| অপ্রাসঙ্গিক বা ক্ষতিকর ওষুধ কিনতে গেলে রোগী মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়, বিষক্রিয়া বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়| এ ক্ষতির দায়-দায়িত্ব থেকে চিকিৎসকগণ অব্যহতি পেতে পারে না| উন্নত বিশ্বে রোগী চিকিৎসকের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আইনের আশ্রয় নিতে পারে| অনুন্নত দেশগুলিতে রোগী এই সুবিধা বা অধিকার ভোগ করে না| কারণ আমাদের মত দেশে মনে করা হয় রোগী কমনম্যান আর

চিকিৎসকরা সুপারম্যান! তাই সুপারম্যানদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না|

বাংলাদেশে ড্রাগ প্রবর্ধনে কোম্পানিগুলো মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা ড্রাগ প্রমোশন অফিসার নিয়োগ করে থাকে| বাংলাদেশে প্রতি তিনজন চিকিৎসকের পেছনে একজন রিপ্রেজেনন্টেটিভ রয়েছে এবং এ খাতে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ হয়| এই রিপ্রেজেনন্টেটিভগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওষুধ বিশেষজ্ঞ নয় এবং কোন কোন সময় ওষুধের ওপর এদের পর্যাপ্ত জ্ঞানও থাকে না| যদিও তাদের কোন কোন সময় ড্রাগ প্রবর্ধনের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে| কিন্তু ড্রাগ প্রবর্ধনের জন্য ওষুধ-কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কতটুকু নিরপেক্ষ এবং প্রকৃত তথ্য সাপেক্ষ তা মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে| এরা সাধারণত কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থটাকে বড় করে দেখে এবং সে মোতাবেক চিকিৎসককে ওষুধ প্রয়োগ ও ড্রাগ স্টোরগুলোকে ওষুধ কিনতে প্রলুব্ধ করে| প্রকৃত প্রস্তাবে কোন রোগের ক্ষেত্রে ওষুধ নির্বাচনে প্রকৃত তথ্য না পেলে চিকিৎসক বিভ্রান্ত হয় এবং ফলে ভুল বা ক্ষতিকর ওষুধ প্রয়োগের ফলে রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হয়| তাই ওষুধ কোম্পানিগুলো যেন চিকিৎসক ও রোগীর জন্য প্রকৃত ও পর্যাপ্ত তথ্য প্রবাহের নিশ্চয়তা বিধান করে সে ব্যাপারে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া উচিত|

বর্তমানে ওষুধের জোয়ারে আমাদের চিকিৎসকগণ ভাসছেন আর এতোসব ওষুধের ওপর প্রকৃত তথ্য অন্বেষণে হিমশিম খাচ্ছেন| কোন দেশে ওষুধের সংখ্যায় সীমাবদ্ধতা না থাকলে এবং বাজার প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় ওষুধে প-াবিত হয়ে গেলে সব ওষুধের ওপর সম্যক ধারণা অর্জন কোন চিকিৎসকের একার পক্ষে সম্ভব নয়| সুচিকিৎসার জন্য সীমাবদ্ধ ওষুধের ওপর পর্যাপ্ত জ্ঞান, অসংখ্য ওষুধের ওপর অপূর্ণ ও ভাসাভাসা জ্ঞানের চেয়ে অনেক উপকারী| ওষুধের ফলপ্রসূ ও যুক্তিসঙ্গত প্রয়োগের জন্য কোম্পানি প্রদত্ত নামের পরিবর্তে ওষুধের জেনেরিক নাম ব্যবহার আবশ্যক| প্রত্যেক দেশে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিকল্পে একটি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা থাকা প্রয়োজন| সুচিকিৎসার স্বার্থে চিকিৎসকদের জন্য থাকা প্রয়োজন একটি আদর্শ চিকিৎসা গাইডলাইন| বাংলাদেশের মত একটি অনুন্নত দেশের নিরীহ জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে এসব পদ্ধতি গ্রহণের কোন বিকল্প নাই|

অধ্যাপক ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ : ফার্মেসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রো-ভিসি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা|

ভুয়াবিজ্ঞান মেলা চাই

মনিরুল ইসলাম

ইংরেজিতে বলে সুডো-সায়েন্স (pseudoscience), বাংলায় কেউ বলে *অপবিজ্ঞান*, কেউ *ছদ্ম-বিজ্ঞান*, কেউবা বলে *ভুয়া-বিজ্ঞান*। অর্থাৎ বাইরের হাঁকডাক আর আড়ম্বর দেখে আপাতদৃষ্টিতে 'বিজ্ঞান' বলে মনে হলেও আসলে এটা ভাওতাবাজি। আমাদের এক 'দীক্ষাগুরু' কৌতুক করে বলেছিলেন, 'বিজ্ঞান-আন্দোলন কর্মীদের বেশিরভাগ সময় কাটাতে হবে *ভুয়া-বিজ্ঞান* নিয়ে।' আজ অনেক বছর পর তাঁর কথার গুরুত্ব নতুন করে অনুভব করছি। কারণ আমাদের আশেপাশেই দেখতে পাচ্ছি নানা অপকৌশলে কোটি কোটি মানুষের চিন্তা-চেতনাকে বিভ্রান্ত করছে নানা কিসিমের ভুয়া-বিজ্ঞান। মুনাফা, কায়েমী স্বার্থ এবং অপরাজনীতির পক্ষে ব্যবহৃত হবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এর গতি হয়েছে অপ্রতিরোধ্য এবং দাপট হয়েছে অসামান্য। ফুটপাথের 'ক্যানভাসার'থেকে শুরু করে ধর্মতন্ত্র, বহুজাতিক কোম্পানি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সকলেই *ভুয়া-বিজ্ঞানের* উপর ভর করছে নানা রকম স্বার্থ-সিদ্ধির ফন্দি থেকে। তাদের এই অপতৎপরতা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদেরকে ওই ফন্দির ফাঁদে ফেলছে। বিজ্ঞানের অভূতপর্ব উন্নতির যুগে ভুয়া-বিজ্ঞানের এই সাফল্য অমাদের ভাবায়। এর পরিণতি নিয়ে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি। মানুষের বিজ্ঞান-চেতনা এবং যৌক্তিকতাবোধ কি তাহলে এগিয়ে যাচ্ছে নাকি পিছিয়ে যাচ্ছে? এ যুগেও *ভুয়া-বিজ্ঞান*-এর দাপট ও দৌরাত্মের কারণ তবে কি?

একথা ঠিক একুশ শতকের এই ক্ষণে আধুনিক বিজ্ঞান মানব জাতির একাংশের জাগতিক-বোধকে পরিণতির এক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং বিজ্ঞান-নির্ভর প্রযুক্তি আমাদের অনেককে দিয়েছে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের এক অভূতপূর্ব ক্ষমতা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিজ্ঞানচেতনা-সম্প ন্ন হয়ে গেছে। বরং আমাদের কাণ্ডজ্ঞান থেকে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বেশিরভাগ মানুষই বিজ্ঞানচেতনা থেকে অনেক দূরে রয়ে গেছে। শুধু তাই নয় আমরা যদি বেশির ভাগ মানুষের কথাই ধরি তাহলে বিখ্যাত লেখক ও ইতিহাসবিদ এইচ জি ওয়েলসের সঙ্গে আমরাও একমত হব। ওয়েলস একদা বলেছিলেন-'এ শতকের বেশির ভাগ মানুষের চিন্তাভাবনা তিন হাজার বছর আগের আমাদের প্রাক-সভ্য বা আদিম পূর্বপুরুষদের মতই।'

এজন্য অন্যতম প্রধান একটি কারণ হল পৃথিবীর ব্যাপক অধিকাংশ মানুষ অক্ষরজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। যারা অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা পাচ্ছে তারাও পড়ছে নানা ধরনের অপশিক্ষা ও কুশিক্ষার কবলে। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার পথ ধরে

টিকে আছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকাচার, মৌলবাদী ধর্মীয় বিধান এবং চিন্তার দৈন্য| প্রযুক্তির চোখধাঁধানো ঝলমলে নানা আবিষ্কারের বিপরীতে চেতনার এক অন্ধকার দিককে দেখতে পাই ভুয়া-বিজ্ঞানের দাপটের মাঝে| প্রচলিত লোকাচার ও সামাজিক বিধানের মধ্যকার অযৌক্তিক ও পশ্চাদপদ উপাদানকে চেনা যত সহজ বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে থাকা ভুয়া-বিজ্ঞানকে চেনা তত সহজ নয়| বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে থাকে বলেই ভুয়া-বিজ্ঞান সাধারণ মানুষকে খুব সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে| সাধারণ মানুষ এগুলোকে 'বিজ্ঞান' বলেই মনে করে এবং নানাভাবে প্রতারিত হয়| অনেক ভুয়া-বিজ্ঞানী বসে আছে আমাদের আশেপাশেই মহাবিজ্ঞানী সেজে, আমরা চিনতে পারছি না|

যে সব বিষয়ের উপর মানুষের ভক্তি, ভয়, আস্থা বা পছন্দ থাকে সেগুলোর নকল জিনিস বের হতে বেশি সময় লাগে না| নানা রকম স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রতারক ও ধান্ধাবাজ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এর মেকি প্রতিরূপ তৈরি করে| ভুয়া ডাক্তার, ভুয়া পুলিশ, ভুয়া কর্মকর্তা, ভুয়া ব্যাংক, ভণ্ড পীর, ভণ্ড দরবেশ, নকল সোনা, নকল হীরা ইত্যাদি আমাদের সমাজে মোটেও বিরল নয়| এরকম অনেক ভুয়া ও ভণ্ডের পাশাপাশি আজকাল *ভুয়াবিজ্ঞান*ও মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপকভাবে| শুধু আমাদের মত পিছিয়ে পড়া সমাজে নয়, 'উন্নত বিশ্ব' বলে পরিচিত দেশ ও সমাজেও এর প্রকোপ কম নয়, বরং দিনে দিনে বাড়ছে| বিজ্ঞানের প্রতি প্রতারক ও ধান্ধাবাজদের এই আগ্রহের কারণ বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর আস্থা ও বিশ্বাস| মানুষের গভীর আস্থা ও বিশ্বাসকে পুঁজি করে মুনাফা বা অন্য কোন স্বার্থ অর্জনের জন্য তৈরি হয় নকল বা ভুয়া-বিজ্ঞান|

Science	Pseudoscience
Willingness to change with new evidence	Fixed ideas
Ruthless peer review	No peer review
Takes account of all new discoveries	Selects only favourable discoveries
Invites criticism	Sees criticism as conspiracy
Verifiable results	Non-repeatable results
Limits claims of usefulness	Claims of widespread usefulness
Accurate measurement	"Ball-park" measurement

চেনা জরুরি কিন্তু সহজ নয়

আগেই বলেছি *ভুয়া-বিজ্ঞান* বেশির ভাগ সময়েই কোন না কোন বিজ্ঞানের ছদ্মাবরণে থাকে| যেমন 'ভাগ্য গণনার' তথাকথিত 'জ্যোতিষ শাস্ত্র' থাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবরণে| এতে অনেকে একে জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'শাখা' বা এর সঙ্গে সম্প র্কিত বিজ্ঞান বলে মনে করেন| জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করলেও এই 'শাস্ত্রের' কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই| এটি একটি নির্ভেজাল ভুয়াবিজ্ঞান| এরকম ভাবে বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখা যেমন ভূতত্ত্ব, ভূগোল, চিকিৎসাবিজ্ঞান,মনবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদির ছদ্মাবরণে উদ্ভব ঘটেছে বহু ধরনের ভুয়া-বিজ্ঞানের|

বেশির ভাগ মানুষের পক্ষেই ভুয়াবিজ্ঞানের ওই সব কর্মকাণ্ড থেকে প্রকৃত বিজ্ঞানকে আলাদা করে চিনতে পারা কঠিন হয়ে যায়| তারা মনে করে এগুলো বিজ্ঞানেরই শাখা বা বর্ধিত কোন অংশ| অনেক সময় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের কোন অংশ বিশেষ নিয়ে এমন কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির করা হয় যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই| বিজ্ঞানের অনেক শাখারই এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক অংশ রয়েছে যেগুলো প্রায়ই আমাদের বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করে| যেমন উপগ্রহের মাধ্যমে তোলা মঙ্গল গ্রহের কিছু ছবির মনগড়া ব্যাখ্যা দেন রিচার্ড সি হগল্যান্ড নামের এক কল্পকাহিনি লেখক| মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে তার কাল্পনিক ধারণাগুলো প্রকাশের সময় তিনি ব্যবহার করেন গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন পরিভাষা| যার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তার ব্যাখ্যার ভুয়া-বৈজ্ঞানিক রূপটি অনেকটা আড়াল হয়ে যায়| এরকম পরিস্থিতিতে কোনটি বিজ্ঞান এবং কোনটি ভুয়া-বিজ্ঞান তা বোঝা কঠিন হয়ে পরে|

বিজ্ঞানের সঙ্গে পৃথক করে চেনা বেশ কঠিন বলেই ভুয়াবিজ্ঞানকে সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না| ভুয়াবিজ্ঞানকে পৃথকভাবে চিনতে পারা বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ| আধুনিক যুগে যেসব মনীষী বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিজ্ঞানের দর্শনের সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন তাদের অনেকেই ভেবেছেন কি করে সহজে এই পৃথকীকরণ করা যায়| বিংশ শতকে বিজ্ঞানের দার্শনিক কার্ল পপার এই সমস্যা নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া করেছিলেন| তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'the Demarcation Problem' বা 'পৃথকীকরণের সমস্যা'| পপার মনে করতেন বিজ্ঞান ও ভুয়াবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা কেবল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে থাকলেই চলবে না সাধারণ মানুষের মধ্যেও থাকতে হবে : 'কারণ বিজ্ঞান এত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ এবং ভুয়াবিজ্ঞান এতটাই বহুল প্রচলিত ও ক্ষতিকর যে একে চিনতে না-পারা যে কোন মুক্ত সমাজের পক্ষে বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে|'-পপারের এই ধারণা ছিল অত্যন্ত সঠিক|

বিজ্ঞানের দার্শনিকদের মধ্যে পপারই প্রথম খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানের সঙ্গে অবিজ্ঞান-ভুয়াবিজ্ঞান ইত্যাদির পার্থক্য করার একটি কার্যকর পদ্ধতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন| পপারের পদ্ধতি অনুযায়ী কোন প্রস্তাবনা (হাইপোথিসিস) বা প্রকল্পের যথার্থতা নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তাবনাটির ভুল প্রমাণিত করার (Falsify) সম্ভাবনার উপর| তার এই পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক যে বিষয়টি গ্রহণ করা যায় সেটি হচ্ছে অনেকগুলো ভুল প্রস্তাবনাকে ভুল প্রমাণের মাধ্যমে সঠিক-প্রস্তাবনা বা প্রকৃত সত্যকে পাওয়া যায়| কিন্তু পপারের এই পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে| তাই পপারের পদ্ধতি পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের দার্শনিকদের সমালোচনার শিকার হয়েছে এবং পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হয় নি|

বিজ্ঞানকে ভুয়া-বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে চেনার জন্য বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত একটি কষ্টিপাথর অবশ্যই থাকতে হবে| কিন্তু ভুয়াবিজ্ঞানের নানা ধরনের বিচিত্র রকম সামাজিক অনুষঙ্গ ও স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বলে শুধু পদ্ধতিগত অসঙ্গতি নয় আর্থ- সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনুষঙ্গে ভুয়া-বিজ্ঞানকে বোঝার প্রয়োজন রয়েছে| আগেও উল্লেখ করেছি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিভাষা, যুক্তি ও উপকরণের সঙ্গে মিশে থাকে বলে ভুয়াবিজ্ঞানকে চেনা কঠিন হয়| তাই ভুয়াবিজ্ঞানকে চেনার ক্ষেত্রে আমাদের ভুয়াবিজ্ঞানকে আড়াল করে রাখা বিজ্ঞানের শাখাটির প্রকৃতি এবং এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি| শুধু তাই নয় আমরা যদি কোন এক প্রকার ভুয়াবিজ্ঞানের গড়ে ওঠা এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে এর সাফল্যের কারণ বুঝতে চাই তাহলে আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে| এই বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যুক্তি কাঠামোর মধ্যে 'বিভ্রান্তিকর উপাদান' (Fallacy) এবং মানুষ কিভাবে কোন বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার মনস্তত্ত্ব|

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কোন ঘটনা বা প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বর্ণনা ও যুক্তি উপস্থাপনের ধরন এমন থাকে যে তা থেকে মনে হতে পারে যে এর মধ্যে '*অতিপ্রাকৃত*' কিছু আছে| যেমন যদি বলা হয়-এই ওষুধটির কাজ হল রক্তচাপ এবং বুক ধরফর করা কমানো| 'কাজ' শব্দটি আমাদের অনুভবে সচেতন একটি ক্রিয়ার কথা জানান দেয় যা জড় বস্তুর পক্ষে করা সম্ভব নয়| তাই উপরের বর্ণনা পড়ে মনে হতে পারে ওষুধটির কোনো অলৌকিক গুণাগুণ রয়েছে| এ রকম 'মনে হওয়া'র উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে বিভিন্নরকম ভুয়া-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা| অন্যদিকে বেশির ভাগ ভুয়া-বিজ্ঞানের সম্পর্ক থাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির নানা রকম ফন্দি-ফিকিরের সঙ্গে| তাই সমাজ ও রাজনীতির পরিণত বোধ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে ভুয়া-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায় না|

১৯৭০-এর দশক থেকে ভুয়াবিজ্ঞানের স্বরূপ উন্মোচনের লক্ষ্যে কাজ করছেন পল থ্যাগার্ড| ১৯৭৮ সনে প্রকাশিত '*Why Astrology is a Pseudoscience*' (বাংলায়-'*কেন জ্যোতিষশাস্ত্র একটি ভুয়া বিজ্ঞান'?*) নিবন্ধে ভুয়া-বিজ্ঞানকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি ভুয়াবিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা দেন যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে ছাপা হয়| এই সংজ্ঞা অনুযায়ী-'*একটি তত্ত্ব তখনই ভুয়া-বৈজ্ঞানিক বলে চিহ্নিত হবে যদি এটি দীর্ঘসময় ধরে ওই প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিকল্প তত্ত্বগুলোর তুলনায় কম প্রগতিশীল বা নিষ্ক্রিয় থাকে| অর্থাৎ বহুরকম অমীমাংসিত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও এর চর্চাকারী জনগোষ্ঠী এই সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে তেমন কোন উদ্যোগ নেয় না, তাদের তত্ত্বকে এ বিষয়ের অন্যান্য তত্ত্বের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের কোন উদ্যোগ নেয় না এবং (সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে) নিশ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে|*

পরবর্তী সময়ে থ্যাগার্ড উপলব্ধি করেন এভাবে সংজ্ঞা দিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে ভুয়াবিজ্ঞানকে পৃথক করার চেয়ে ভুয়াবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলো সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দিলে সাধারণ মানুষের পক্ষে ভুয়াবিজ্ঞানকে চিহ্নিত করা সহজ হবে| ১৯৮৮ সালে লেখা '*Computational Philosophy of Science*' শীর্ষক বইয়ে তিনি বিজ্ঞান ও ভুয়াবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেন| যার ফলে বিজ্ঞান ও ভুয়াবিজ্ঞানের পৃথকীকরণ অনেক সহজ হয়| অতিসম্প্রতি অন্য একটি নিবন্ধে বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনি আরও সময়োপযোগী করে তোলেন| থ্যাগার্ডের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

১. বিজ্ঞান কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে, ভুয়াবিজ্ঞানে কোন পদ্ধতিনির্ভর ব্যাখ্যা থাকে না|

২. বিজ্ঞান (বিষয় ও বস্তুর) সম্প র্ক নির্ধারণকারী চিন্তাকে ব্যবহার করে, যে চিন্তা প্রকৃতির বিভিন্ন দিককে আবিষ্কারের জন্যে পরিসংখ্যানের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে| অন্যদিকে ভুয়াবিজ্ঞান আপ্তবাক্য বা স্থির বিশ্বাস বা গোঁজামিলপূর্ণ চিন্তার উপর নির্ভর করে| এ ধরনের চিন্তা থেকে তারা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে-'জগতে বস্তুসমূহের মধ্যে অল্পসল্প সম্প র্ক আছে কারণ তারা একই ধরনের|'

৩. বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যবহারকারীগণ সর্বদাই বিভিন্ন বিকল্প তত্ত্বসমূহের নিরিখে তার তত্ত্বের যথার্থতা যাচাই করতে আগ্রহী থাকেন| অন্যদিকে ভুয়াবিজ্ঞানের চর্চাকারীগণ বিকল্প তত্ত্বগুলোকে অগ্রাহ্য করে|

৪. বিজ্ঞান এমন তত্ত্বের অবতারণা করে যা জটিল নয় কিন্তু এর থাকে ব্যাখ্যা করার বিশদ ক্ষমতা| আর ভুয়াবিজ্ঞান এমন তত্ত্বের অবতারণা করে যার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আরও অনেক কিছু ধরে নিতে হয় বা নতুন নতুন (মনগড়া) প্রকল্প গ্রহণ করতে থাকে|

৫. সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান এগিয়ে যায় নতুন তথ্যকে ব্যাখ্যার জন্য নতুন তত্ত্ব নিয়ে আসে| ভুয়াবিজ্ঞান তার নীতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনড় অবস্থানে থাকে|

উপরে উল্লেখিত বিজ্ঞান ও ভুয়াবিজ্ঞানের পার্থক্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল বিজ্ঞান একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী চলে, ভুয়াবিজ্ঞানের এ ধরনের কোন প্রক্রিয়া থাকে না| প্রক্রিয়ার বিষয়টি ভুয়াবিজ্ঞান অগ্রাহ্য করে| প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় এমন এক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি যেখানে কয়েকটি উপাদানের মিথষ্ক্রিয়ায় নিয়মিত এক ধরনের ফল পাওয়া যায়| যেমন রসায়ন বা জৈবপ্রপঞ্চসমূহের ক্ষেত্রেও আমরা ব্যাপন (diffusion) নামক একটি প্রক্রিয়া আমরা দেখি, যেখানে অর্ধপরিবাহী পর্দা (Semipermeable mebrane) যেমন কোষঝিল্লির এক পাশ থেকে অন্যপাশে বস্তুকণা কী হারে অতিক্রম করবে তা নির্ভর করে পর্দার

দুই পাশে বস্তুকণার ঘনত্বের পার্থক্যের উপর| এই প্রক্রিয়া সকল অজৈব ও জৈব প্রপঞ্চে একইভাবে ক্রিয়া করে| বস্তুজগতের কোনো নিয়ম অনুযায়ী বা পদার্থের কোন ধর্ম অনুযায়ী এ ঘটনা ঘটে বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে দিয়ে থাকে|

ভুয়াজ্ঞান এমন কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে যায় না বা যেতে পারে না কারণ তাদের প্রস্তাবনাগুলো বস্তুজগতের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না| যেমন 'জ্যোতিষ শাস্ত্র' যেসব ঘটনা ঘটবে বা ঘটেছে বলে দাবি করে তার ভাসাভাসা যোগসূত্রের কথা বললেও কোন সুনির্দিষ্ট কোন প্রক্রিয়া আছে এমন কিছু প্রমাণ করতে পারে না| জন্মের সময় আকাশের তারাগুলির একটি বিশেষ অবস্থান কী করে একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করে সে রকম কোন প্রক্রিয়া দেখাতে পারে না জ্যোতিষশাস্ত্র| যেসব ঘটনা ঘটেছে বা ঘটবে বলে তারা দাবি করে তার কোন বাস্তব পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা বিজ্ঞানসম্মত পরিসংখ্যান রয়েছে এমনও দেখাতে পারে না তারা|

তাহলে আমরা দেখছি উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আমরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারব কোনটি বিজ্ঞান এবং কোনটি ভুয়াবিজ্ঞান| কিন্তু বাস্তব-জীবনে আমাদের আশেপাশে ভুয়াবিজ্ঞান এমনভাবে ছড়িয়ে থাকে যে আমরা অনেক সময় তা লক্ষ্য করি না| প্রায়ই দেখা যায় এগুলো থাকে বিজ্ঞানের অন্যান্য অনুষঙ্গের সঙ্গে মিশে| বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন এ ধরনের প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হন তখন এর দ্বারা সাধারণ মানুষ তো বটেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিরাও প্রায়ই বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন| এ কারণেই আমাদের আশেপাশে থাকা নানা প্রকারের ভুয়াবিজ্ঞানের স্বরূপ সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং এর গতিপ্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি|

আশেপাশে নানান বেশে

বিজ্ঞান মোটামুটি বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হবার পর থেকেই নানা প্রকারের ভুয়াবিজ্ঞানেরও উৎপত্তি হতে থাকে| ঊনবিংশ শতক থেকে আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভুয়াবিজ্ঞানের উৎপত্তি হতে দেখি, হোমিওপ্যাথি এবং ফ্রেনোলজি তার মধ্যে অন্যতম| যেসব ভুয়াবিজ্ঞান যথেষ্ট জনপ্রিয় ও প্রচলিত হয়েছে সেগুলো লক্ষ্য করলে আমরা দেখি বেশিরভাগ ভুয়াবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য ও চর্চার সঙ্গে প্রচলিত বিশ্বাসের 'অতিপ্রাকৃত' উপাদান মিশিয়ে| অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত কোন বৃত্তির অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে একই ঘটনার 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু হয় বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কারের সঙ্গে মিলিয়ে| যেমন মানুষের ভাগ্যের উপর গ্রহের প্রভাবের ব্যাপারটি এসেছিল কারণ প্রাচীনকালের মানুষের বিশ্বাস ছিল গ্রহগুলি এক একটি দেবতা, এরা এদের স্বভাব অনুযায়ী মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে| নিউটন মহাকর্ষতত্ত্ব আবিষ্কারের পর দেবতাদের প্রভাবের বদলে এসে গেছে গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ|

এভাবেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর ভিত্তি করে নানা উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ভুয়াবিজ্ঞানের চর্চা| আমরা যদি সারা পৃথিবীতে প্রচলিত সব ধরনের ভুয়াবিজ্ঞান সম্পর্কে অলোচনা করতে চাই তাহলে বেশ কয়েকটি ঢাউস আকারের বই লিখেও কুলানো যাবে না| এই আলোচনার স্বল্প পরিসরে এগুলোর প্রতিটির স্বরূপ তুলে ধরা সম্ভব নয়| আমাদের আশেপাশে যেসব ভুয়া-বিজ্ঞানের চর্চা খুব দাপটের সঙ্গে আমাদের বিভ্রান্ত করছে তার মধ্যে কয়েকটির কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করছি| একটু লক্ষ্য করলে দেখবো মানুষকে বিভ্রান্ত করে স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে সে-সব বিষয়কেই বেছে নেয়া হয় যে সব বিষয়ে সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বা দুর্বলতা রয়েছে|

আমাদের আশেপাশে যেসব ভুয়াবিজ্ঞান দাপটের সঙ্গে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে তার বেশিরভাগের উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক| কোনো কোনোটির উদ্দেশ্য রাজনৈতিক অর্থাৎ রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্যে মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য বা ব্যাখ্যার উপর বিজ্ঞানের প্রলেপ দিয়ে এর যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করা| ধর্মতন্ত্রীরাও কম যান না| আজকাল বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস এবং এর অনেক উপাদান সম্পর্কে আধুনিক মানুষের মনে তৈরি হচ্ছে নানা প্রশ্ন| এগুলো অনেক ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের ভিতকেই নাড়িয়ে দিচ্ছে| এরকম অবস্থায় ধর্মবিশ্বাসের নানা উপাদানকে '*বিজ্ঞানসম্মত*' বলে প্রমাণ করা বিশ্বাস রক্ষার খুব কার্যকর কৌশল| এ-রকম সব ধরনের প্রচেষ্টার নিদর্শন খোঁজার জন্যে আমাদের দূরে কোথাও যেতে হবে না| টেলিভিশনের পর্দা বা পত্রপত্রিকার পাতায় বিশেষত বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে তাকালেই আমরা এসবের ভুরিভুরি নিদর্শন দেখতে পাবো|

বহুজাতিক কোম্পানির এক বিখ্যাত 'হেলথ্ ড্রিংক'| উপাদান যা আছে তা আমাদের অন্যান্য দৈনন্দিন খাবারের উপাদানের থেকে ভিন্ন কিছু নয়| কিন্তু তারা দাবি করছেন এটা খেলে নাকি বাচ্চারা '*সাধারণ খাবার*'-খাওয়া বাচ্চাদের চেয়ে বেশি লম্বা, বেশি শক্তিশালী এবং বেশি বুদ্ধিমান হবে| একই উপাদানে ভিন্নফল কেন হবে তার কোন জবাব এদের কাছে নেই| একে '*মহাবৈজ্ঞানিক*' প্রমাণ করার জন্য আশ্রয় নেয়া হয় প্রতারণা ও মিথ্যাচারের| বলা হয়ে এগুলো নাকি '*স্বতন্ত্র গবেষণায় প্রমাণিত*'| মানুষের শরীরের উপর কোনো ওষুধ বা পুষ্টি উপাদানের প্রভাব দেখার জন্যে যে-সব গবেষণা (ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল) চালানো হয় সে-সব গবেষণা প্রকল্প সে দেশের সংশি-ষ্ট বৈজ্ঞানিক কমিটি কর্তৃক পাশ করাতে হয়| খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এদের এসব কথিত 'গবেষণা'-প্রস্তাব বৈজ্ঞানিক কমিটির দ্বারা অনুমোদিত নয় এবং এই বিষয়ের কোনো স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক জার্নালে তা প্রকাশিত হয় নি| এরকম আরও অনেক দেশি ও বহুজাতিক কোম্পানি প্রচলিত খাবারের চেয়ে তাদের খাবারের 'শ্রেষ্ঠত্ব' 'গবেষণায় প্রমাণিত' বলে দাবি করে আসছে| যেহেতু তাদের কথিত 'গবেষণা' ভুয়া অতএব এদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ভুয়াবৈজ্ঞানিক এবং প্রতারণামূলক|

এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে-সব কোম্পানি তৎপর এদের বেশিরভাগই ভারতসহ উপমহাদেশের সবকটি দেশেই ব্যবসা করছে| ২৯ নভেম্বর ২০১২, কর্নাটক থেকে প্রকাশিত ভারতের ইংরেজি জাতীয় দৈনিক *দি হিন্দু*-তে একটি খবর ছাপা হয় যার শিরোনাম ছিল '*ভুয়া দাবির জন্যে ১৯টি কোম্পানি বিচারের মুখোমুখি*| ১৯টি কোম্পানির প্রতিটিই বিভিন্ন ধরনের খাবারের আইটেম তৈরি করে| এদের বেশিরভাগ আমাদের দেশেও বাজারজাত করছে তাদের পণ্য| সাবানের বিজ্ঞাপনে ডাক্তারকে দিয়ে বলানো হচ্ছে 'সাবান দিয়ে ধুয়ে সব ধরনের জীবাণু-সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব|' এমন কী সর্দি-কাশির মত বায়ু-বাহিত রোগও নাকি প্রতিরোধ করতে হবে সাবান দিয়ে ধুয়ে!

চিকিৎসার নামে চলছে নানা রকম ভুয়াবৈজ্ঞানিক তৎপরতা| এসব তৎপরতার বেশিরভাগ চলছে প্রচার মাধ্যমে| দাবি করা হচ্ছে চামড়ায় লাগানো হয় এমন একটি মালিশ জাতীয় ওষুধ নাকি জয়েন্টের ভেতরে গিয়ে নানা রকম ক্রিয়া করে, রোগ সারায়| ফার্মাকোলজির অ আ ক খ যার পড়া আছে তিনি জানেন মানুষের চামড়া ভেদ করে এভাবে কোন ওষুধ শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকতে পারে না| ন্যূনতম কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই এরা বলে দিচ্ছে জয়েন্টের ভিতরে গিয়ে এই ওষুধ কী কী (পাঁচ রকম) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে| এর মধ্যে যে-সব উপাদান আছে বলে তারা দাবি করে তারও কোন প্রমাণ নেই| এই কথিত উপাদানগুলো কী উপায়ে শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার কিছু প্রক্রিয়া তারা কম্পিউটারে তৈরি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনে দেখিয়ে থাকে| কিন্তু এ প্রক্রিয়াগুলো যে সত্যিই ঘটে তার পক্ষেও তারা কোনো গবেষণা বা পর্যবেক্ষণগত ভিত্তি দেখাতে পারে না| এর ফলে স্পষ্ট বোঝা যায় তাদের এই কথিত প্রক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ মনগড়া ও বানোয়াট| তারা রোগীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখায় রোগীরা বলছে রোগ সেরেছে| এগুলো যদি সত্যও হয় তাহলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী এটা কোন প্রমাণ নয়| এসব কথিত ওষুধের কোন বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার নিদর্শন থাকে না| অতএব এগুলো খাঁটি ভুয়াবিজ্ঞান|

অন্যান্য অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও দুয়েকটা ধর্মঘেঁষা টিভি চ্যানেলে জীববিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে মৌলবাদীরা '*বুদ্ধিমান পরিকল্পক তত্ত্ব*কে (intelligent design theory) উপস্থাপন করে থাকে| সৃষ্টিবাদকে বিজ্ঞান হিসেবে দাবি করার এই কৌশল মৌলবাদীরা প্রথম শুরু করেছিল ১৯৬০ এর দশকে| মার্কিন মুলুকের হেনরি মরিস নামের এক প্রকৌশলী তৈরি করেন 'সৃষ্টিতত্ত্ব গবেষণা সংঘ' (*ইনস্টিটিউট অব ক্রিয়েশন রিসার্চ*)| তারা দাবি করতে থাকলেন এ তত্ত্ব 'গবেষণালব্ধ'| শুধু তাই নয়- তারা আরও দাবি করলেন-এ বিষয়ে (এ তত্ত্বের চর্চাকারীদের) নানা বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বিভিন্ন স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে| সৃষ্টিবাদীদের এই দাবি নিয়ে বিতর্ক যখন তুঙ্গে তখন ১৯৮৪ সালে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন জীববিজ্ঞানের শিক্ষক ইউজিন স্কট ও হেনরি কোল উদ্যোগ

নিলেন বিষয়টিকে ভালভাবে তলিয়ে দেখতে| তারা তিন বছর ধরে এক হাজারটি বৈজ্ঞানিক জার্নাল ঘেটে সৃষ্টিবাদী গবেষণার এমন নমুনা খুঁজতে থাকেন যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়| হাজারটি জার্নালে ছাপা হওয়া নিবন্ধ ও অভিসন্দর্ভসমূহের একটিতেও তারা সৃষ্টিবাদের পক্ষে কোন প্রায়োগিক বা গবেষণামূলক রচনা খুঁজে পান নি| এই হল মার্কিন মুলুকে সৃষ্টিবাদীদের গবেষণার নমুনা! আমাদের দেশে তো বলাই বাহুল্য|

এ-রকম আরো অনেক ধরনের ভুয়াবিজ্ঞান আমাদের আশেপাশে রয়েছে| আমাদের অজ্ঞতা আর নিজেদের প্রতারণামূলক প্রচারণার উপর ভর করে এরা দাপটের সঙ্গে মানুষকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে| এদের দ্বারা আর্থিক, মানবিক এবং নৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ| এসব চর্চা আমাদের দেশের আইন, মেডিকেল ও পেশাগত নৈতিকতা ইত্যাদির বরখেলাফ হলেও আইন প্রয়োগের দুর্বলতার কারণে চর্চাকারীরা রয়ে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে| তবে এদের পার পেয়ে যাবার আসল কারণ হচ্ছে মানুষের অজ্ঞতা| তাই এখন সময় এসেছে সংগঠিতভাবে সবিস্তারে এদের স্বরূপ উন্মোচন করার|

ওদের প্রচার প্রচারণার জাঁকজমক ও ডামাডোলের বিপরীতে আমাদেরও প্রচারণা চালাতে হবে এমনভাবে যাতে বেশিরভাগ মানুষ এদের ফাঁকিবাজি বুঝতে পারে| আমরা বিজ্ঞানমেলা করি, বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার আর সম্ভবনার সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্যে| এখন বিজ্ঞানমেলার চেয়েও আমাদের বেশি প্রয়োজন *ভুয়াবিজ্ঞান-মেলা* আয়োজন করার| যাতে আমাদের তরুণেরা ভুয়াবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ভুয়াবিজ্ঞানসমূহের নানা কায়দার ফাঁকিবাজি ও কারসাজিগুলো সবিস্তারে দেখিয়ে দিতে পারে| কোনো কিছুর বিপরীতকে জানলে ওই বিষয়টিকে আরো ভালেভাবে বোঝা যায়| যেমন অন্ধকারের মাঝে আলোকে সবচেয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়| তাই এ-ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতারণা ও চিন্তার বিভ্রান্তি কাটিয়ে আমাদের সমাজকে মুক্তচেতনার আলোকিত চত্বরে নিয়ে যাওয়া আরো সহজ ও সাবলীল হবে |

সহায়ক রচনাবলী

1. Massimo Pigliucci, *Nonsense on Stilts: How to Tell Science from Bunk*, The University of Chicago Press, 2010.
2. Stanley A Rice, *Encyclopedia of Evolution*, Infobase Publishing, New York, 2007.
3. Paul R Thagard, *Computational Philosophy of Science*, MIT Press, USA, 1988.
4. Paul R Thagard, *Why Astrology Is A Pseudoscience*, University of Michigan-Dearborn, 1978, Volume 1, edited by P.D. Asquith and I. Hacking (East Lansing: Philosophy of Science Association, 1978)
5. মনিরুল ইসলাম, *জৈববিবর্তনবাদ : দেড়শ বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ,* সংহতি প্রকাশন, ২য় মুদ্রণ, ২০১০|
6. মনিরুল ইসলাম, *বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার,* (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত) ২য় সংস্করণ, সংহতি প্রকাশন, ২০১১|

মনিরুল ইসলাম : পেশায় চিকিৎসক| বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পি য়াডের একজন সম্মানিত উদ্যোক্তা| বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ'র সাথে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত| প্রকাশিত গ্রন্থ : *জৈববিবর্তনবাদ : দেড়শ' বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ* (২০০৭, সংহতি প্রকাশন), *বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার* (২০১১, সংহতি প্রকাশন) এবং *নারী পুরুষ বৈষম্য : জীবতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট* (২০১০, সংহতি প্রকাশন), ঢাকা

বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান

তানভীর হানিফ

জ্যোতিষশাস্ত্র বা অ্যাসট্রোলজি কোনো বিজ্ঞান নয়, এটাকে অপবিজ্ঞান বলা যায়| যদিও হাজার হাজার বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে মানবসভ্যতা যখন বিজ্ঞান ও এর দৃশ্যমান ফসল, যাকে আমরা প্রযুক্তি বলি, এর উচ্চশিখরে পৌঁছে গেছে এবং এই প্রগতি অব্যহত আছে তখনও এই অপবিজ্ঞান তথা অন্ধ-কুসংস্কার কর্তৃক লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতারিত হয়ে চলছে| এই অপবিজ্ঞানের প্রভাব এতটাই মারাত্মক যে দেশের বেশিরভাগ পত্র-পত্রিকাতে বিশাল অংশ জুড়ে রাশিফলের খবর প্রকাশ করা হয়| কিংবা ঢাউস সাইজের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করা হয়-'আপনি কি হতাশ? তাহলে নির্ভুল ভাগ্য গণনার মাধ্যমে হতাশা মুক্তির জন্য অমুকের ভাগ্য-গণনা চেম্বারে আসুন|' এই ধরনের বিজ্ঞাপন প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়| ধরুন কারো হতাশা এতটাই মারাত্মক পর্যায়ে যে তিনি আত্মহত্যাও করতে পারেন যে কোনো সময়| এ অবস্থায় তার প্রয়োজন একজন চিকিৎসা-মনোবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হওয়া| তিনি যদি সেটি না করে কোন জ্যোতিষীর কাছে যান এবং কিছুদিন পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সত্যিই আত্মহত্যা করে বসেন-তাহলে এর দায়ভার কার নেয়া উচিৎ? এর জন্য দায়ী কে হবে? আর্থিক ক্ষতির কথা বাদই দিলাম|

আমরা অনেক সময় জ্যোতিষশাস্ত্র (অ্যাসট্রোলজি) এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান (অ্যাসট্রোনমি) এই দুইটি বিষয়কে একত্রে গুলিয়ে ফেলি| নামের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মিল থাকলেও এদের ভেতর একটি বিশাল পার্থক্য আছে| জ্যোতিষশাস্ত্রের ভিত্তি হল কতগুলো সরল কিন্তু ভিত্তিহীন আর অপ্রমাণিত বিশ্বাস| যেমন কোনো মানুষের ব্যক্তিত্ব, তার ভাগ্য, তার 'জন্মমুহূর্তে' চাঁদ, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল| এই অবস্থানগুলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে গণকেরা এক ধরনের ছক তৈরি করেন, একে তারা বলেন কুষ্ঠি বা হরস্কোপ| জ্যোতিষীদের দাবি অনুসারে এই কুষ্ঠি ব্যবহার করে তারা নাকি মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন| ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এমন কি জাতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে 'সাহায্য' করে থাকেন! জ্যোতির্বিজ্ঞান হল গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন-পর্যালোচনা| জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের সমতুল্য বা এর অংশ| অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান হল গ্রহ-নক্ষত্রের উদ্ভব, বিবর্তন, গতি-প্রকৃতির বিদ্যা আর জ্যোতিষশাস্ত্র হল মানুষের ওপর এদের প্রভাব|

যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা অনুকল্পের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে-এমনকি যদি সেটি ভুলও প্রমাণিত হয়| কিন্তু যা ভুল প্রমাণ করার সুযোগ নেই তা বিজ্ঞানের পর্যায়ে পরে না| আলোকতরঙ্গ

চলাচলের মাধ্যম হিসেবে 'ইথার' নামক সর্বব্যাপী এক ধরনের পদার্থের অনুমান করেছিলেন বিজ্ঞানীরা| পরবর্তীকালে পরীক্ষণে এর অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় এবং বিজ্ঞানীরা তা মেনেও নিয়েছেন| কারণ বিজ্ঞানের চালিকাশক্তি হল সংশয় এবং সংশয়কে যাচাই করার জন্য রয়েছে পরীক্ষণের ব্যবস্থা| ইথারের অনুমানটি কিন্তু অযৌক্তিক ছিল না| উনিশ শতকের বিজ্ঞানীরা জানতেন যে কোন ধরনের তরঙ্গের যেমন জলতরঙ্গ, শব্দ ইত্যাদির সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন-কাজেই আলো যদি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ হয় তাহলে এর সঞ্চালনের জন্যও মাধ্যম থাকাটাই সঙ্গত| কিন্তু বিজ্ঞান শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত টানে না| একে যাচাই করা বা ভুল প্রমাণের চেষ্টা হল একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প বা হাইপোথেসিসের পরবর্তী ধাপ| এই বিষয়টিকে বলা হয় 'ফলসিফিকেশন টেস্ট'| অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র এই ধরনের পরীক্ষায় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ| এখানে একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে| দুই ধরনের বক্তব্যের কথা চিন্তা করুন : একক অস্তিত্বজ্ঞাপক এবং বিশ্বজনীন| 'একটি সাদা রাজহাঁসের অস্তিত্ব আছে'-এটি একটি একক অস্তিত্বজ্ঞাপক বক্তব্য এবং 'সকল রাজহাঁসই সাদা'-এটি হল একটি বিশ্বজনীন বক্তব্য| বিজ্ঞানীদের কাছে এই দুই ধরনের বক্তব্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে| একজন এ ধরনের বহু একক অস্তিত্বজ্ঞাপক বক্তব্য থেকে একটি বিশ্বজনীন বক্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম| যেমন 'ক' একটি সাদা রাজহাঁস, 'খ' একটি সাদা রাজহাঁস| এভাবে অনেকগুলো রাজহাঁসের গায়ের রঙ থেকে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে 'সকল রাজহাঁসই সাদা'| এটি যৌক্তিক বিচারে একটি আরোহী পদ্ধতি ('বিশেষ হতে সাধারণে আরোহণ') হলেও পদ্ধতিটি অবরোহীগতভাবে ('সাধারণ হতে বিশেষে অবরোহণ') প্রযোজ্য নয়| এর কারণ হল, আমাদের দেখা সমস্ত রাজহাঁসের বাইরেও আরও ভিন্ন রঙের রাজহাঁস থাকতে পারে এবং তা কালোও হতে পারে| প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় কালো রাজহাঁস আছে|

বিজ্ঞানের ভিত্তি এ-ধরনের অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত হতে পারে না| আরোহমূলক এই পদ্ধতির সমাধান হল ফলসিফিকেশন| 'একটি সাদা রাজহাঁসের অস্তিত্ব আছে'-এরকম একটি একক অস্তিত্বজ্ঞাপক বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে 'সকল রাজহাঁসই সাদা'-এরকম একটি বিশ্বজনীন বক্তব্যকে 'নিশ্চিতভাবে' প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হলেও 'একটি কালো রাজহাঁসের অস্তিত্ব আছে'-এরকম একটি একক অস্তিত্বজ্ঞাপক বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে সেটিকে 'নিশ্চিতভাবে' ভুল প্রমাণ করা সম্ভব| পৃথিবীর সমস্ত রাজহাঁসকে দেখে একটা সাধারণীকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো অসম্ভব কিন্তু একটিমাত্র ব্যতিক্রম একটি সার্বজনীন বক্তব্যকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে সক্ষম| বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যই হল সেরকম অন্তত একটি ব্যতিক্রমের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেয়া| একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সফলতার বহু কারণের ভেতর একটি হল, বহু পরীক্ষণের পরও সেটির টিকে থাকা| একে ভুল প্রমাণ করবার উপায় জানা থাকতে হবে এবং সেই উপায় অনুসরণের পরও তা

টিকে থাকতে পারে| আইনস্টাইনের বক্তব্যটি আমরা লক্ষ্য করতে পারি: 'No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong.'

আনফলসিফিয়েবল তত্ত্বে এ-ধরনের কোনো কালো রাজহাঁস পাওয়া যায় না| বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বগুলোকে এ-ধরনের কালো রাজহাঁস খোঁজার জন্য বিশেষভাবে নক্সা করা হয়| যদি এ-ধরনের রাজহাঁস পাওয়া যায় তাহলে তত্ত্বটি ভুল-যদি না পাওয়া যায় তাহলে তত্ত্বটির সঠিক হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়| অধিকতর 'শক্তিশালী তত্ত্ব' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়| প্রকৃত বিজ্ঞানের চিহ্ন হল এর চর্চাকারীরা এ ধরনের কালো রাজহাঁসের সন্ধানে থাকে আর অপবিজ্ঞানের চর্চাকারীগণ এ-বিষয়টি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে|

প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রে এ ধরনের কালো রাজহাঁসের কোনো অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র ফলসিফিয়েবল না| জ্যোতিষীরা তাদের দাবিগুলোকে প্রমাণ করবার জন্য সবচাইতে দুর্বল সাক্ষ্য-প্রমাণকে আগলে ধরতে চান কিন্তু এই সাক্ষ্য-প্রমাণ খুঁজে পেতে তাদের একের পর এক ব্যর্থতাকে কখনো তাদের দাবির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে দিতে তারা বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন|

এমনটি হতে পারে (অবশ্যই ব্যতিক্রম হিসেবে) দুই-একজন বিজ্ঞানী 'বিরুদ্ধ' তথ্য-উপাত্তকে সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন| এর কারণ আর কিছুই নয়-মানুষের স্বভাবই এরকম যে সে চায় তার তত্ত্বটি সঠিক হোক এবং সেজন্য সাংঘর্ষিক তথ্য-উপাত্তকে এড়িয়ে চলে| তবে এই বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে বিজ্ঞানের পূর্ণ ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে মোটেও প্রযোজ্য নয়| এমনকি তর্কের খাতিরে যদি ধরাও হয় যে কোনো একজন বিজ্ঞানী নিজের পছন্দের তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায় এ-ধরনের সাংঘর্ষিক তথ্য-উপাত্তকে এড়িয়ে গেছেন-তাহলেও কিন্তু আরেকজন সেটি খুঁজে পেয়ে বিশ্ববিখ্যাত হবার সুযোগ নিতে পারেন| এ-জন্য বলা হয় বিজ্ঞানের নিজেকে নিজের সংশোধনের ক্ষমতা আছে| কিন্তু এ-ধরনের কিছুই আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রে দেখতে পাই না| কারণ বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এমনটি জ্যোতিষীরা কখনই দাবি করতে সক্ষম নন|

বিজ্ঞানের দাবিগুলোকে অবশ্যই প্রমাণযোগ্য হতে হবে এবং পরীক্ষণ দ্বারা যাচাই করবার পর এদেরকে বাস্তবতা হিসেবেই মেনে নেয়া হয়| অপবিজ্ঞানের দাবিগুলো প্রথমত : অনন্যসাধারণ (extraordinary) হয় এবং দ্বিতীয়ত এই দাবিগুলোর পক্ষে অনন্যসাধারণভাবে অপর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়| সঙ্গত কারণে এটির গুরুত্ব মোটেও কম নয়-কারণ কোন তত্ত্ব যদি পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং এর যদি কোন পরীক্ষণলব্ধ প্রমাণ না থেকে থাকে তাহলে বাস্তবতার সাথে এটির কোনোরকম সংযোগ দাবি করা একেবারে ভিত্তিহীন|

মার্কিন জ্যোতির্পদার্থবিদ কার্ল সাগান (১৯৩৪-১৯৯৬) একবার বলেছিলেন-'*অনন্যসাধারণ দাবির জন্য অনন্যসাধারণ সাক্ষ্য-প্রমাণ আবশ্যক*' (extraordinary claims require extraordinary

evidence)| অর্থ হল কোন দাবি যদি আমাদের বিশ্বজগত সম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা যা জানি তার সাথে তুলনামূলক বিচারে খুব বেশিমাত্রায় বিস্ময়কর বা অসাধারণ না হয় তাহলে সেই দাবির পক্ষে খুব বেশি সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন পরে না| উল্টোটাও কিন্তু সমানভাবে প্রযোজ্য| যদি কোনো দাবি আমাদের বিশ্বজগত সম্পর্কে জানা তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে এর স্বপক্ষে অনেক বেশিমাত্রায় সাক্ষ্য-প্রমাণ আবশ্যক| এর কারণ কি? কারণ এই অনন্যসাধারণ দাবিটি সত্য হলে আমাদের বিশ্বজগত সম্পর্কে জানা এবং সত্য বলে গৃহীত অনেক অনেক তথ্যকে 'মিথ্যা' বলে মেনে নিতে হবে| এখন এই গৃহীত তথ্যগুলো যদি আবার পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের সাথে খুব ভালোভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে দাবিটি 'অনন্যসাধারণ'-এর মাত্রায় উন্নীত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর পক্ষে ইম্পিরিক্যাল প্রমাণ সেটির বিপক্ষে বর্তমান ইম্পিরিক্যাল-প্রমাণকে অতিক্রম না করে ততক্ষণ এ বিষয়টি গ্রহণ করবার কোনো কারণ নেই|

অনন্যসাধারণ দাবির একটি উদাহরণ হিসেবে আমরা হোমিওপ্যাথির কথা বলতে পারি| এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা উৎস নেই| ইতোমধ্যে আমরা জানি হ্যানিম্যান তাঁর হোমিওপ্যাথির সূত্রগুলো কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পান নি-তিনি শুধুমাত্র 'এডহক' ভিত্তিতে সেগুলো ধারণা করে নিয়েছিলেন| তিনি তাঁর 'সমতুল্যতার সূত্র'টি ধারণা করেছিলেন একটি পর্যবেক্ষণ থেকে : সিনকোনা গাছের ছাল শুঁকলে সুস্থ মানুষের মধ্যে ম্যালেরিয়ার লক্ষণ দেখা যায় তাই এই গাছ থেকে সংগৃহীত কুইনাইন ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক| এবং এই সূত্রটি (অর্থাৎ যে পর্যবেক্ষণ থেকে প্রণয়ন করা হয়েছে এই ধারণা) পুনরুৎপাদন বা রেপি-কেট করা বা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করাও সম্ভব হয় নি| এই দাবি অনুসারে অনিদ্রা বা ইনসোমনিয়ার ওষুধ হল ক্যাফেইনের (যা ঘুম নষ্ট করে) অতিমাত্রায় ডাইলুটেড সলুশ্যন| তরলীকৃত বিষ আইভি চামড়ার ফুসকুড়ির ওষুধ হিসেবে কাজ করবে কারণ ঘনীভূত অবস্থায় এটি ফুসকুড়ির জন্য দায়ী, তরলীকৃত ঝাঝালো লাল পেয়াজের রস চোখের পানি পড়া বন্ধ করে এবং তরলীকৃত সাপের বিষ শারীরিক অনড়তা নিরাময় করে| হোমিওপ্যাথিক বইপুস্তকে প্রায়ই ঘুড়েফিরে একটি কথা আসে : 'নিউটনের জন্য গাছ থেকে পড়া আপেল বা গ্যালিলিওর জন্য ক্যাথেড্রালে দোলায়মান বাতির ভূমিকা যতটুকু হ্যানিম্যানের জন্য সিনকোনা গাছের ছালের অবদান ততখানি|' অথচ আজ আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে জানতে পেরেছি হ্যানিম্যানের 'সমতুল্যতার সূত্র'টি আসলে ডাহা মিথ্যা| পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে সিনকোনা গাছের ছালের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক বিশেষ গুণাগুণ আছে এবং এই প্রতিরোধটি কি ধরনের প্রক্রিয়াতে বা মেকানিজমের মাধ্যমে ঘটে তাও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে| কিন্তু এর সাথে হ্যানিম্যানের 'বিষে বিষক্ষয়' বা 'ভাইটালিজম' বা 'ডাইনামিজম' ইত্যাদির কোনো যোগসূত্র বের করা যায় নি| টিকার ক্ষেত্রে মানবদেহে নির্দিষ্ট মাত্রাতে জীবাণু

ইনজেক্টের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতন কিছুও এটি নয়| হোমিওপ্যাথির ভিত্তিটিকে নিশ্চিতভাবে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে| অতি সম্প্রতি হ্যানিম্যানের 'ব্যক্তিগত' অভিজ্ঞতাকে কুইনাইনের প্রতি তার অতিসংবেদনশীলতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে|

হ্যানিম্যানের সিদ্ধান্তগুলোকে তার সময়ের (অষ্টাদশ শতক) জন্য খুব একটা দোষ দেয়া হয়ত যাবে না যে-সময় ওষুধ-পথ্য সম্পর্কে বেশিরভাগ ধারণাই ছিল প্রথা ও লোককাহিনিভিত্তিক| হ্যানিম্যানের '*সিমিলিয়া সিমিলিয়াবাস কিউরেন্তার*' বা বিষে বিষক্ষয়ের সাথে কিন্তু ভুডু ম্যাজিকের বেশ মিল পাওয়া যায়| ভুডু বা লোকজ বুজরুকি চিকিৎসা বা যাদুবিদ্যার পেছনে কাজ করে 'লাইক এফেক্টস্ লাইক' বা সমতুল্য সমতুল্যকে প্রভাবিত করে এই বিশ্বাস| এজন্য ভুডু ম্যাজিশিয়ানরা ভিক্টিমের মতো দেখতে পুতুল তৈরি করে তাতে সূঁচ ফোটায়| সিনকোনার ছালের কার্যকারিতাকে সে-সময় এর তীব্র কষীয় স্বাদ ও হজম শক্তি বৃদ্ধিতে এর প্রভাব দিয়েও ব্যাখ্যা করা হয়| হ্যানিম্যানের বা এই দাবিগুলোর কোনোটাই সত্যের কাছাকাছিও ছিল না-যদিও আমাদের মনে রাখতে হবে সেটি ছিল এমন একটা যুগ যখন মেডিকেল সায়েন্সে আণবিক তত্ত্ব, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি বা মাইক্রোবায়োলজি এসবের কোনোটিরই প্রয়োগ শুরু হয় নি| আর সেজন্য এসব অজ্ঞানতাপ্রসূত ধারণাসমূহকে ক্ষমা করা যায়|

কাল্পনিক অন্তর্দৃষ্টির অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে হ্যানিম্যান তার সময়ের বিভিন্ন রাসায়নিক, জৈব-রাসায়নিক আর জৈব-পদার্থের (যা বিভিন্ন মাত্রায় ওষুধ বা এর উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হত) সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করলেন| হ্যানিম্যান প্রক্রিয়াটির নাম দিলেন 'প্রুভিংস্'| এটিকে ঐতিহাসিক বিচারে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের একেবারে প্রথমদিককার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বলা যেতে পারে| যদিও তা ভুলপথে পরিচালিত ছিল| তিনি এই উপকরণগুলো নিজে গ্রহণ করেন| মজার বিষয় হল এই প্রুভিংস্গুলো নাকি ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল| হ্যানিম্যান নিজের পরিবারের সদস্যদেরকেও এই পথ্য গ্রহণ করান| উপকরণগুলোর কোনো কোনোটি (যেমন: সীসা ও পারদ) ছিল মারাত্মক বিষাক্ত| আর সে-জন্য হ্যানিম্যান শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে আসেন এগুলোকে সাধারণভাবে যত কম পরিমাণে ব্যবহার করা হবে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তত বেশি শক্তিশালী ও কার্যকরী হবে| এই সিদ্ধান্তটি তার পরিবারের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনলেও হোমিওপ্যাথির দ্বিতীয় সূত্র বা 'ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র'র উদ্ভট সূত্রের সূচনা করল| সোজা ভাষায় : একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যত বেশি ডাইলুট বা তরলীকৃত বা পাতলা করা হবে সেটি তত বেশি শক্তিশালী হবে| এজন্য হোমিওপ্যাথি ওষুধ বানানো হয় পানি বা অ্যালকোহলে একটি উপকরণ মিশিয়ে যা বারবার তরলীকৃত করার মাধ্যমে কিংবা ঝাঁকিয়ে (সাকসাশন)| এই উদ্ভট প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'পোটেনশাইজিং'| ধরুন আপনি অনিদ্রার হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বানাবেন| আপনি সুঁইয়ের ডগা ক্যাফেইনে ছুঁয়ে কোনো ছোট টিউব বা বোতলের

পানিতে মিশিয়ে ঝাঁকাতে থাকবেন, এরপর এর কিছু অংশকে (অর্ধেক অংশকে) আবার আরেকটি ছোট টিউব বা বোতলের পানিতে মিশিয়ে ঝাঁকাতে থাকবেন এবং এই প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করতেই থাকবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার চাহিদা অনুযায়ী ডাইলুশন না হয়|

হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলো সাধারণত $১০^{১২}$ থেকে $১০^{৬০}$ মাত্রায় ডাইলুট করা হয় এবং বোতলে ১২C, ৩০C ইত্যাদি লেখা থাকে| এর অর্থ কি? ৩০C মানে $১০^{৬০}$ (১-এর পর ৬০টি শূন্য বসবে) ভাগ পানিতে ১ ভাগ উপকরণ মিশানো হয়েছে! এটা মাছের অ্যাকুরিয়ামের পানিতে এক ফোঁটা উপকরণ মেশানোর সমান নয়| বরং সুইমিং পুলের পানিতে এক ফোঁটা উপকরণ মেশানোর সমানও নয়| কোনো লেকের পানিতে এক ফোঁটা উপকরণ মেশানোর সমানও নয়| তাও খুব ছোট হয়ে যায়| আটলান্টিক মহাসাগরে এক ফোঁটা পানি ফেললে কি ৩০C ডাইলুশন তৈরি করবে? তাও খুব ছোট হয়ে যায়! এক অণু কার্যকরী হোমিওপ্যাথিক উপকরণ পেতে হলে সমস্ত সৌরজগতের অণুর প্রয়োজন পড়বে| গাঁজাখুরির সীমানাও অতিক্রম করে যায়| বিজ্ঞানী অ্যাভোগাড্রোর গণনা অনুসারে কোন দ্রবণকে যদি $১/১০^{২৩}$ ভাগ মাত্রার বেশি তরলীকৃত করা হয় তাহলে মূল উপকরণের এক অণুও এতে থাকবে না| মূল উপকরণের কোনো অণুর সংস্পর্শে আসা পানির কোনো অণুও এতে থাকবে না| এমনকি পরস্পরের সংস্পর্শে থাকা পানির নিজস্ব অণুগুলো পর্যন্ত বিযুক্ত হয়ে পড়বে!

প্রকৃতপক্ষে হোমিওপ্যাথরা স্বীকারও করেন তারা আপনার কাছে যে ওষুধের বোতলটি বিক্রি করেন তাতে এক অণু কার্যকরী উপকরণও নেই| তাহলে এটি কিভাবে কাজ করে? তাদের দাবি এরপর আরও অবাস্তব রূপ ধারণ করে| তাদের মতে 'পানির স্মৃতিশক্তি আছে এবং মূল উপকরণের সংস্পর্শে আসবার পর পানি এই উপকরণের বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখে|' কিন্তু এই যুক্তিতে পানিতো আরও কোটি কোটি বিভিন্ন দ্রব্যের সংস্পর্শে ছিল| মানুষের মল-মূত্রসহ নানা অজৈব উপাদান| সেগুলির হোমিওপ্যাথিক প্রভাব কি ভুডু ম্যাজিকের জোড়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছে? এর কোনো উত্তর তাদের কাছে নেই|

হ্যানিম্যানের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে মূল উপকরণকে তরলীকৃত করার মাধ্যমে এর মধ্যে সঞ্চিত তথ্যকে আরও বাড়ানো হয় বা শক্তিশালী করা হয়| এই তরলীকরণের মাত্রা এতই তীব্র যে মূল উপকরণ এবং এর দ্রাবক উভয়ই অস্তিত্বহীনতার সীমানাতে পৌঁছে| এ যে সম্ভাবনার আইনের স্পষ্ট পরিপন্থী| যার সুস্পষ্ট প্রকাশ হল ইনফরমেশন থিওরি এবং থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র| হ্যানিম্যানের দ্বিতীয় সূত্র মেনে নিলে ইনফরমেশন ডিকের পারিসংখ্যানিক চরিত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও ইলেক্ট্রনিক্সের এই যুগে অসংখ্যবার প্রতি মিলি সেকেন্ডে পরীক্ষিত সমস্ত দালিলিক-প্রমাণকে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হয়|

এর জন্য প্রয়োজন পড়বে একটি বিশ্বজনীন আইনকে পুরোপুরি অস্বীকার করবার| যা সম্পর্কে স্বয়ং আইনস্টাইন বলেছিলেন : '*পদার্থবিদ্যার একমাত্র সূত্র-আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একে কখনই ছুড়ে ফেলবার প্রয়োজন হবে না|*

এই দুইটি মৌলিক দুর্বলতার (হ্যানিম্যানের তথাকথিত দুইটি নিয়ম) কারণে হোমিওপ্যাথির কাছ থেকে এর স্বপক্ষে আমরা অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতির সাথে তুলনামূলক বিচারে অনেক বেশি শক্তিশালী পরীক্ষিত-প্রমাণ দাবি করতে পারি| কিন্তু আমাদের দেয়া হয় বিভিন্ন রোগীর ব্যক্তিগত আরোগ্যের অপ্রমাণিত গল্প-ইতিহাস এবং পক্ষপাতমূলক 'নান-ব-াইন্ডেড' পরীক্ষণের বিবরণীর মতন দুর্বল প্রমাণ| এগুলোর বেশিরভাগ আবার হোমিওপ্যাথিস্টদের লেখা| সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত সমস্ত 'ডাবল-ব-াইন্ড এক্সপেরিমেন্টে' (যাতে পরীক্ষক এবং পরীক্ষণের মানবীয় উপকরণ উভয়েরই ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব থেকে দূর হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিৎ করা হয়) নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে হোমিওপ্যাথি 'প্ল্যাসিবো' ছাড়া আর কিছুই না|

একইভাবে জ্যোতিষশাস্ত্র 'অনন্যসাধারণ' দাবির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ| যদি মহাশূন্যের দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রগুলো এরকম দাবিকৃত মাত্রায় মানুষের জীবন ও চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাহলে পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও রসায়নের ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিগুলোকে ভুল হতে হবে| এর অর্থ দাবিটি 'অনন্যসাধারণ'| কাজেই দাবিটি প্রমাণের জন্য একে 'সত্য' বলে গ্রহণের পূর্বে এর স্বপক্ষে খুবই উচ্চমানের বহুসংখ্যক ইম্পিরিক্যাল প্রমাণের প্রয়োজন হবে| বছরের পর বছরের গবেষণাতেও এমন একটিও প্রমাণ পাওয়া যায় নি| তাই জ্যোতিষশাস্ত্র পুরোটাই অপবিজ্ঞান হবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী|

ওকামস্ রেজর বা ওকামের ক্ষুর বা মিতব্যয়িতার নীতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গঠনে বহুল ব্যবহৃত কার্যকরী একটি পথপ্রদর্শনকারী নীতি| এই নীতির বক্তব্য মোটামুটি এরকম : 'কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করবার জন্য যতটুকু বিষয়বস্তু কারণ হিসেবে যথেষ্ট এবং দ্বিধাহীনভাবে সত্য বা বাস্তবতার সাথে সাজুয্যপূর্ণ তার বেশি কোনো কিছুর অনুমান করা যাবে না|' একটা উদাহরণ দেই| আপনার একটি বিড়াল আছে| আপনি রাতের বেলায় এক বাটি দুধ টেবিলে রেখে ঘুমাতে গেলেন| পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলেন বাটি খালি পড়ে আছে| কেউ দেখে নি বাটির দুধ কে খেয়েছে বা সেটি কিভাবে উধাও হয়ে গেল| এক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা আছে : (ক) বিড়ালটি দুধ খেয়েছে অথবা (খ) দুধ-পরী এসে দুধ খেয়ে গেছে| ওকামের ক্ষুর আমাদেরকে বলে, দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে বাদ দেবার জন্য| কিভাবে? দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে বিবেচনা করবার জন্য আমাদেরকে অমিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হয়| একটি সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয় স্বত্ত্বা বা দুধ-পরীর অস্তিত্ব কল্পনা করতে হয়| কল্পনা বলা হলো এ কারণে যে আমাদের বাস্তব জগতে দুধ-পরীর অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই| অপ্রয়োজনীয়

বলা হলো এ কারণে যে এর যুক্তিসঙ্গত বিকল্প ব্যাখ্যাও আছে যার জন্য দুধ-পরীর কোনো প্রয়োজন পরে না| এই বিকল্প ব্যাখ্যাটি কি? উত্তর হল আমাদের প্রিয় বিড়াল| যার অস্তিত্ব আমাদের নতুন করে অনুমান করতে হয় নি| খেয়াল করে দেখুন খুব সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে অনুমান দুটির উভয়ই কিন্তু সরল| তবে বিড়ালের ব্যাখ্যাটি সরলতর এই হিসেবে যে সে ক্ষেত্রে আমাদের কোনো নতুন অপ্রয়োজনীয় স্বত্ত্বাকে অনুমান করবার প্রয়োজন পড়ে না| এরপরও যদি আপনি 'দুধ-পরী'র ব্যাখ্যাটি নিয়ে গো ধরেন তাহলে এর অস্তিত্বের স্বপক্ষে আপনাকেই খুবই খুবই শক্তিশালী প্রমাণ নিয়ে আসতে হবে| বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ঠিক এভাবেই কিন্তু ওকামের ক্ষুরের নীতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে|

বৈজ্ঞানিক দর্শনের কাঠামোতে এই নীতিকে আরেকভাবে বলা যায় : একটি প্রাকৃতিক ঘটনার দুই বা ততোধিক ব্যাখ্যা থাকলে এবং তারা যদি একই বিষয়ে একই ভবিষ্যদ্বাণী করে তখন সবচাইতে সরল ব্যাখ্যাটিই হবে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য| উদাহরণ হিসেবে আমরা আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের কথা বলতে পারি| ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে আমরা আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে খুব কম জানতাম| তবে আমরা জানতাম আলো এক ধরনের তরঙ্গ| তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ| সে-সময় আমরা আরও অন্যান্য তরঙ্গ সম্পর্কে অবগত ছিলাম এবং তাদের প্রত্যেকের চলাচলের জন্য কোনো ধরনের মাধ্যম প্রয়োজন সেটিও জানতাম| পানির ঢেউ বা তরঙ্গ পানির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, ভূ-কম্পন প্রবাহিত হয় কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে, শব্দের তরঙ্গ বাতাসের মধ্য দিয়ে| স্বাভাবিকভাবে তখনকার দিনের বিজ্ঞানীরা ভাবলেন আলোও যেহেতু এক ধরনের তরঙ্গ যা একেবারে বায়ুশূন্য স্থানের মধ্য দিয়েও স্বচ্ছন্দ্যে প্রবাহিত হতে পারে-তাহলে এর চলাচলের জন্যও তো কোনো স্থির মাধ্যম (যা সর্বব্যাপী এবং বায়শূন্যস্থানেও ব্যপ্ত) প্রয়োজন| এই কল্পিত মাধ্যমটির নাম দেয়া হল 'ইথার'| আমরা জানি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল কোন রুলারের দৈর্ঘ্য এর গতির দিক বরাবর সংকুচিত হয় বা গতিশীল কোনো ঘড়ির সময় ধীর হয়ে যায়| বিজ্ঞানী লরেঞ্জের তত্ত্বানুসারে এমনটি ঘটে থাকে 'ইথারের' মধ্য দিয়ে এদের গতির কারণে| আইনস্টাইনের স্থান-কালের পারস্পরিক রূপান্তরের সমীকরণসমূহ এবং রুলার ও ঘড়ির রূপান্তরের জন্য লরেঞ্জের সমীকরণগুলো একই| আর সে কারণে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের স্থান-কালের পারস্পরিক রূপান্তরের সমীকরণগুলোকে 'লরেঞ্জ ট্রান্সফরমেশন' (Lorentz Transformation) বলা হয়| কিন্তু আইনস্টাইন ও হেনরি পয়কাঁরে (ফরাসি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী) উপলব্ধি করেন 'লরেঞ্জের সমীকরণ' এবং ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকত্বের সমীকরণগুলোকে বিবেচনা করলে ইথারের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়|

দুইজন পর্যবেক্ষকের কথা চিন্তা করা যাক তারা একে অপরের সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল| এই দুই পর্যবেক্ষক একটি গতিশীল টেনিস বলকে পর্যবেক্ষণ করছেন| দুই ব্যক্তিই যদি কোনো নির্দিষ্ট

সময়ে বলটির স্থানাংক মাপেন তাহলে উভয়ের জন্য সংখ্যাত্রয় ভিন্ন-ভিন্ন হবে| এবং সংখ্যা তিনটির মধ্যে সম্পর্কও দেখানো যাবে| নিউটনীয় বলবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্থানাংকের এই রূপান্তর 'গ্যালিলীয় রূপান্তর' নামে বিখ্যাত| এই রূপান্তরের অধীনে 'সময়' হল পরম| উভয় পর্যবেক্ষকের জন্য সর্বদা একই| বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের আগে বস্তুসমূহের আপেক্ষিক গতির জন্য 'গ্যালিলীয় রূপান্তর' ব্যবহার করা হত| সমস্যা হল নিউটনের বলবিদ্যার সমীকরণগুলো 'গ্যালিলীয় রূপান্তরের' অধীনে অপরিবর্তিত থাকলেও ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকত্বের সমীকরণগুলো থাকে না| কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের আইনগুলো পর্যবেক্ষকের উপর বা পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণকৃত স্থানাংকের উপর (যা এক্ষেত্রে নির্ধারণ করে গ্যালিলীয় রূপান্তর) নির্ভরশীল হতে পারে না- তা হলে দুইজন পর্যবেক্ষক তড়িৎ-চুম্বকত্বের জন্য দুই ধরনের ভিন্ন আইন বা সমীকরণ পাবেন| এ জন্যই আইনস্টাইন এমন এক ধরনের রূপান্তর খুঁজছিলেন যার অধীনে নিউটন ও ম্যাক্সওয়েল উভয়ের সূত্রাবলি (বা তখনকার জানা পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত আইন) অপরিবর্তিত থাকবে| সেটা তিনি পেলেনও| যার নাম লরেঞ্জ রূপান্তর| এটা আবার লরেঞ্জ একটি ভুল ব্যাখ্যার জন্য উদ্ভাবন করেছিলেন| মজার ব্যাপার হল 'লরেঞ্জ রূপান্তর' নিয়ে আসলে সময় আর 'পরম' থাকে না| স্থানের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়| আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার মূলনীতি দুটি হল :

1. পদার্থবিজ্ঞানের আইনগুলো পরস্পরের সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল সকল পর্যবেক্ষকের জন্য একই হবে (এটি আমাদেরকে বলে সময়সহ স্থানাংকসমূহের রূপান্তরের জন্য 'লরেঞ্জ ট্রান্সফরমেশন ব্যবহার করতে হবে)|
2. শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ পরস্পরের সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল সকল পর্যবেক্ষকের জন্য একই হবে|

'লরেঞ্জ রূপান্তরের' অধীনে ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের অপরিবর্তনশীলতা থেকে আমরা আপেক্ষিকতার দুটি নীতি পাই এবং এ নীতি দুটির সাহায্যে 'ইথার' ছাড়াই রুলারের সংকোচন ও সময়ের ধীর হয়ে যাওয়াকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব| কাজেই মাইকেলসন ও মর্লির সুবিখ্যাত পরীক্ষণে যে 'ইথারের' মধ্য দিয়ে পৃথিবীর আপেক্ষিক গতি শূন্য সেটি এর অনস্তিত্বকে দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত করে|

এখন আরেকটি উদাহরণ দিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের কথায় আসা যাক| বৈদ্যুতিক বাতির সুইচ টিপলে ছোট ছোট পরী সুইচ থেকে ইলেকট্রিসিটি বহন করে বাল্ব অবধি নিয়ে যায় আর তখনই বাল্বটি জ্বলে ওঠে| এই বক্তব্যটি 'অমিতব্যয়ী' কারণ এ-জন্য আমাদের কিছু পরীর কথা অনুমান করতে হচ্ছে যা বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করবার জন্য একেবারেই অপ্রয়োজনীয়|

জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুমানগুলো একইভাবে 'অমিতব্যয়ী' কারণ এ-গুলো আসলে কতক একেবারে অপ্রয়োজনীয় কল্পনা| জ্যোতিষশাস্ত্রকে সঠিক হতে হলে এমন কিছু শক্তির বা স্বত্ত্বার অস্তিত্ব থাকতে হবে যারা পৃথিবীর মানুষ ও বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে এক ধরনের সংযোগ স্থাপন করে| কোনো সন্দেহ নাই এ ধরনের শক্তি আর যাই হোক ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মহাকর্ষ বা আলোককণিকা নয়-কারণ তাহলে এদের সরাসরি পরিমাপযোগ্য প্রভাব (জ্যোতিষীদের দাবির সাথে সাজুয্য রেখে) ইতোমধ্যে ধরা পড়ে যেত| তাহলে এ ধরনের শক্তি আসলে আমাদের অজানা অন্য কিছু| সমস্যা হল জ্যোতিষীরা শুধুমাত্র এই তথাকথিত শক্তিসমূহ কি তা বলতে অক্ষম তাই নয়-এরা কিভাবে কাজ করে তাও তারা বলতে পারে না| এরপরও জ্যোতিষীরা যা কিছু বলে থাকেন বা যা ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন, তাদের সমস্ত কিছুকে 'অলীক কল্পনা' বলে অনুমান করা ছাড়া সরলতরভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব-খুব ভালোভাবে সম্ভব-যেমন বারনাম এফেক্ট (barnum effect বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত একটা প্রবণতা, যা তার পক্ষে যায় বা ভালো শোনায়, এমন রকম কিছু সাধারণ কিংবা অস্পষ্ট-ভাসাভাসা বক্তব্যও সে খুব সহজেই বিশ্বাস করে ফেলে ও সঠিক মনে করে), কোল্ড রিডিং (যে সব ধারাবাহিক কৌশল অবলম্বন বা চালাকি করে মনোচিকিৎসক, ম্যাজিশিয়ান, মনোবিদরা একজন ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ, বয়স, ধর্ম, ব্যক্তিত্বের গঠন ইত্যাদি জেনে নিতে চান), ইত্যাদি|

জ্যোতিষশাস্ত্রকে যদি ওকামস্ রেজর বা মিতব্যয়িতার নীতির সাথে যদি সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয় তাহলে তাদেরকে এমন ধরনের তথ্য ও ফলাফল উৎপন্ন করতে হবে যেগুলো সম্পূর্ণ নতুন এবং অনাবিষ্কৃত কোনো শক্তির সাহায্য ছাড়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়| যা নাকি একজন একক ব্যক্তির সাথে দূরদূরান্তের গ্রহ-নক্ষত্রের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তার জীবন ও চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে| এটি আবার সেই ব্যক্তির জন্মের একেবারে সঠিক মুহূর্তের ওপর নির্ভরশীল| পৃথিবীর তাবৎ জ্যোতিষীর এই সমস্যার ওপর হাজার বছর ব্যয় করবার ফলাফল-একটি বৃহদাকৃতি অশ্বডিম্ব!

যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষণের ওপর নির্ভরশীল| কি ধরনের জ্ঞান, পদ্ধতি এবং চর্চাকে আমরা বৈজ্ঞানিক বলব এবং সেগুলো কি কি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পর্কে বিশ্বের তাবৎ বিজ্ঞানী বহুলাংশে একমত| একটি হল পুনরুৎপাদনশীলতা| যে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ফলাফলগুলো অবশ্যই পুনরুৎপাদনশীল হতে হবে এবং সম্পর্কহীন ব্যক্তিরা সকল ফলাফলকে নিরপেক্ষভাবে আলাদা আলাদাভাবে যাচাই করতে সক্ষম হবেন| কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের মাধ্যমে 'ক' নামক দেশের 'খ' নামক বিজ্ঞানী মহাকর্ষ ধ্রুবকের মান নির্ণয় করতে সক্ষম হলেন| তাহলে

‘ঙ’ দেশের ‘ঘ’ নামক বিজ্ঞানী বা ‘চ’ দেশের ‘ছ’ নামক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ ভিন্ন সরঞ্জাম ও পদ্ধতির সাহায্যে মহাকর্ষ ধ্রুবকের একই মান বের করতে সক্ষম হবেন| বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো যেখানে পুনরুৎপাদনশীল এবং নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে জ্যোতিষশাস্ত্রের মতন ‘অপবিজ্ঞান’ এমন সব পরীক্ষণের ওপর নির্ভরশীল বা এমন সব পরীক্ষণের মাধ্যমে এর সত্যতা প্রমাণের অপপ্রয়াস করে থাকে যেগুলো না নিয়ন্ত্রিত না পুনরুৎপাদনশীল| প্রকৃত বিজ্ঞানের মূল চরিত্র এই দু'টি বিষয় : নিয়ন্ত্রণ ও পুনরুৎপাদনশীলতা|

পুনরুৎপাদনশীলতার উদাহরণ দিতে গেলে আমাদের অপেরার সেই বিখ্যাত নিউট্রিনো এক্সপেরিমেন্টের কথা বলতে হয়| কিছুদিন আগে যে পরীক্ষাটি বিশ্বব্যাপী তোলপাড় তুলেছিল| সেই পরীক্ষণের ফলাফলে নিউট্রিনো নামক স্বল্পভর কণিকার গতিবেগ শূন্যস্থানে আলোর গতিকে অতিক্রম করেছিল| কিছুদিন আগে অবশ্য পরীক্ষণটির সরঞ্জামগত ত্রুটি ধরা পড়েছে এবং আলোর চেয়ে ৬০ ন্যানো-সেকেন্ড পূর্বে নিউট্রিনোর অপেরার ডিটেক্টরে পৌঁছানোকে এই ত্রুটির সংশোধন নির্ভুল ও সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করে| যাই হোক এই ভুলটি বের হবার অনেক আগে অপেরা কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য বিজ্ঞানী বলেছিলেন নিউট্রিনোর এই পরীক্ষণটি পুনরুৎপাদনশীল হতে হবে| একমাত্র তাহলেই এর ফলাফলকে ‘সত্য’ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে| এখানে ঠিক এই প্রেক্ষাপটে পুনরুৎপাদনশীলতা বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি| পুনরুৎপাদনশীলতা মানে এই নয় একই স্থানে এবং একই বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও পদ্ধতির ব্যবহারে এবং একই ধরনের নিয়ন্ত্রণের অধীনে একই বৈজ্ঞানিকদল কর্তৃক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বারবার একই ফলাফল দেবে| পুনরুৎপাদনশীলতার অর্থ হল আমরা শুধু ‘একাই’ কোনো পরীক্ষণের ফলাফল পেতে পারি না| অন্যান্য পরীক্ষণবিদেরাও স্বতন্ত্রভাবে একই পরীক্ষণ সম্পন্ন করে একই ফলাফল পেতে পারেন| এটি যখন বাস্তবে ঘটে তখন আমাদের তত্ত্ব আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পায়|

মূল অপেরা এক্সপেরিমেন্টের প্রায় দুমাস পর সার্নে এই পরীক্ষণের ফলাফল আপাতভাবে পুনরুৎপাদন করা হয় বা আরেকটি নতুন পরীক্ষণ চালিয়ে একই ফলাফল পাওয়া যায়| এখন সেই একই ফলাফল প্রাপ্তির কারণ হল একই স্থানে একই সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে একই পরীক্ষণ দ্বিতীয়বার করা| কাজেই মূল পরীক্ষণের সরঞ্জামজনিত ত্রুটি নতুন পরীক্ষণটিকেও প্রভাবিত করেছিল| আর সে-জন্য সেই সময়ও বিজ্ঞানীরা বলছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের MINOS এবং জাপানের T2K এক্সপেরিমেন্ট স্বতন্ত্রভাবে একই ফলাফল দেয় কিনা তার জন্য অপেক্ষা করতে|

বিজ্ঞান পরীক্ষায় ‘নিয়ন্ত্রণ’ বলতে ঠিক কি বুঝায় তা এখন বলা যেতে পারে| তত্ত্বীয়ভাবে এবং এর বাস্তব প্রয়োগ উভয়ক্ষেত্রেই সেই সকল উপাদানসমূহকে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা সম্ভবপর যেগুলো কিনা কোনো পরীক্ষণকে প্রভাবিত করে

থাকে| একের পর এক এই প্রভাবকগুলো দূরীভূত হতে থাকলে একসময় আমরা কোনো নির্দিষ্ট কারণকে মূল কারণ বা প্রভাবক হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হই| ধরা যাক, ডাক্তারগণ একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করলেন বা অনুমান করলেন মদ্যপান স্বাস্থ্যকর| বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হল যে কোনো অনুমান করবার পর সেটির সত্যতা পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা| ডাক্তারেরা প্রকল্পটি পরীক্ষা করবার জন্য রোগীদের শুধু মদ দিবেন না| সাথে সাথে অন্য কিছু পানীয় দিবেন যাতে মদের কিছু কিছু উপাদান উপস্থিত| কোনো রোগী এই পথ্যগুলো গ্রহণ করবার পর সবচাইতে সুস্থ হিসেবে প্রতিপন্ন হন তবে সুরার কোনো উপাদান আদৌ সে জন্য দায়ী কিনা সেটির সুস্প ষ্ট ইঙ্গিতবাহী|

কোন পরীক্ষণের ফলাফলের বিকল্প (এবং ভুল) ব্যাখ্যাসমূহকে দূরীভূত করবার জন্য নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক| আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি কোনো কিছুর ওপর একটি নির্দিষ্ট চলকের প্রভাবকে বাকি চলকগুলোকে অপরিবর্তিত রাখবার মাধ্যমে আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য কৃত পরীক্ষণকে 'নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণ' বলা যায়| বিভিন্নভাবে এ কাজটি করা সম্ভব| ধরা যাক একজন গবেষক তাঁর গবেষণাগারে একই বয়স, লিঙ্গ, আকৃতি ও প্রকৃতির ৬০টি সুস্থ ইঁদুরকে একটি রাসায়নিক মিষ্টিকারক খাওয়ালেন| ঘণ্টা বিশেক পর ১০টি ইঁদুর মরে গেল| এখন এই মৃত্যুর কারণ ঐ রাসায়নিক পদার্থটি হতে পারে অথবা অন্য কিছুও| সাথে সাথে দৃষ্টিগোচর নয় এমন অন্যান্য চলকও হয়ত পরীক্ষণটি এবং এর ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে| এমনটা হতে পারে মৃত ইঁদুরগুলো হয়ত যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য বা পানীয় পায় নি অথবা এদেরকে সরবরাহ করা খাদ্য-পানীয় কোনোভাবে দূষিত ছিল| এমনটিও হতে পারে এরা কোনো ধরনের মনোদৈহিক চাপের ভিতর ছিল| এখন সম্ভাব্য সমস্ত কারণগুলো থেকে প্রকৃত কারণটি ঠিক কিভাবে আলাদা করা সম্ভব? আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি কারণকে দূর করা সময়সাপেক্ষ এবং দূরূহ বিষয়| এজন্য পরীক্ষক বা গবেষক যা করতে পারেন তা হল সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে বিশেষ নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসা| সেটি তিনি করতে পারেন ইঁদুরগুলোকে দুইটি দলে ভাগ করবার মাধ্যমে : যাদের একটিকে রাসায়নিকটি দেয়া হবে, আরেকটিকে হবে না| দল দুইটিকে একই ধরনের অবস্থার ভেতর রাখতে হবে এবং একইভাবে এদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে| একমাত্র এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের পর দল দুইটির মধ্যকার মৃত্যুহার অনেক বেশি নির্ভরযোগ্যতার সাথে এর কারণ হিসেবে রাসায়নিকটি বা অন্য কিছুকে নির্দেশ করবে|

জ্যোতিষশাস্ত্রে পুনরুৎপাদনশীলতা বা নিয়ন্ত্রণ কোনোটিই তেমনভাবে উপস্থিত নয়| ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত| আমাদের জীবনে বা ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবকে এখনো কোনো নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি এবং এ ধরনের কোনো পরীক্ষণ স্বতন্ত্রভাবে পুনরুৎপাদন করাও যায় নি| নিয়ন্ত্রণ যদিও কখনওবা

আসে-সেটি সর্বদাই অত্যন্ত শিথিল হয়ে থাকে| তন্নতন্ন করে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতাকে অতিক্রম করে কৃতকার্য হবার নিমিত্তে যদি কখনও এই নিয়ন্ত্রণকে যতটা শক্ত করা হয় ঝড়ে বক মারবার বাইরে জ্যোতিষীদের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ততটাই নরম হয়ে পড়ে|

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসীদের তথাকথিত কোনো আবিষ্কার বা ফলাফলকে স্বতন্ত্রভাবে কোনো গবেষক বা পর্যবেক্ষক নকল করতে পারেন নি বা এদের প্রতিলিপি তৈরি করতে সক্ষম হন নি| অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের প্রতিটি ফলাফল দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে স্বতন্ত্রভাবে লাভ করা সম্ভব| এমনকি স্বয়ং জ্যোতিষীরা তাদের সহকর্মীদের প্রাপ্ত ফলাফলসমূহকে পুনরুৎপাদনে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম হয়েছেন| বিশেষত যখন শক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে|

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের কোনো ফলাফল বা বিজ্ঞানের কোনো সত্যকে ঠিক কিভাবে উদ্ঘাটন করা হয়েছে সেটি আমরা যদি জানতে চাই বা সে সম্পর্কে নিশ্চিৎ হতে চাই তাহলে সে সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত দুষ্প্রাপ্য কিছু নয়-অনেকসময় আমরা নিজেরাই পরীক্ষণগুলো পুনরায় করবার মাধ্যমে সেগুলোকে যাচাই করে দেখতে পারি| উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি জানতে চাই গ্যালিলিও কিভাবে জানতে পারলেন গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে-পৃথিবীকে নয় তাহলে তিনি টেলিস্কোপের মাধ্যমে ভেনাসের দশাগুলোকে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সে সম্পর্কে আমরা পড়তে যে পারি| ভেনাস যদি সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে তাহলে তিনি টেলিস্কোপের মাধ্যমে যা দেখেছিলেন আমরা ঠিক তাই দেখতে পাব| মোটামুটি ধরনের কোনো টেলিস্কোপের মাধ্যমে আপনি নিজেই গ্যালিলিওর পর্যবেক্ষণকে পুনরায় যাচাই করে দেখতে পারেন|

একইভাবে আপনি যদি জানতে চান কিভাবে সর্বপ্রথম আলোর গতিবেগ নির্ণয় করা হয়েছিল তাহলে তাহলে বিখ্যাত ড্যানিশ বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ ওলে রোমারের বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে পড়ে দেখতে পারেন| রোমার পর্যবেক্ষণ করেন বৃহস্পতি গ্রহটি যখন পৃথিবী থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বে থাকে তখন সর্বনিম্ন দূরত্বে অবস্থানের সাথে তুলনীয়ভাবে এর সবচাইতে কাছের উপগ্রহটিও বৃহস্পতির পেছন থেকে ১১ মিনিট দেরিতে পুনরায় দেখা যায়| তিনি বুঝতে পারেন আলোর অতিরিক্ত দূরত্ব ভ্রমণের জন্য এই অতিরিক্ত সময়টি লেগেছে| এ থেকে তিনি আলোর গতিবেগ গণনা করতে সক্ষম হন| আবারও আপনি নিজেই এই ফলাফলটিকে পুনরুৎপাদন ও যাচাই করে দেখতে পারেন| যদিও অসংখ্য বিভিন্ন স্বতন্ত্র পরীক্ষণের মাধ্যমে আলোর গতিবেগের ফলাফলটি নিশ্চিৎ করা হয়েছে এবং এদের প্রতিটি নথিভুক্ত| বিভিন্ন অক্ষাংশে ছায়ার পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য মেপে সেই ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বিজ্ঞানী ইরাটোস্থেনিস পৃথিবীর পরিধি গণনা করে বের করেছিলেন কিভাবে তার বৃত্তান্তও সহজলভ্য|

প্রতিটি বৈজ্ঞানিক সত্য-ম্যাক্সওয়েল তাঁর তড়িৎচুম্বকত্বের বিখ্যাত সমীকরণগুলো কিভাবে প্রতিপাদন করেছিলেন থেকে কোয়ান্টাম জগতের অদ্ভূত ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত| সর্বত্র এগুলো নথিভুক্ত হয়েছে এবং এদেরকে যে কোন সময় যাচাই করে দেখা সম্ভব| যাদুটোনার মাধ্যমে এগুলোকে কেউ উদ্ঘাটন করেন নি| এখন পর্যন্ত গৃহীত কোনো ফলাফলকেই কেবলমাত্র সত্য বলে 'মনে' হয়েছে বলেও গ্রহণ করা হয় নি| এদেরকে বারেবারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে প্রতিপাদন করা হয়েছে| জ্যোতিষশাস্ত্রে এরকম সমতুল্য জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত|

একটি কথা প্রায় শুনে থাকি আমরা : 'বিজ্ঞান তো পরিবর্তনশীল| আজকে যা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, আগামীকালই হয়ত 'পাগল-ছাগল' বিজ্ঞানীরা সেটিকে নর্দমাতে ছুড়ে ফেলে দেবেন| কাজেই যে ধরনের জ্ঞান এর উৎসের অপরিবর্তনশীলতা এবং এর সত্যতার নিশ্চয়তা দাবি করে তাকে ছেড়ে এহেন বিজ্ঞানের প্রতি অতিমাত্রায় আস্থা রাখা হল নির্বুদ্ধিতা|' একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলে এ ধরনের খোড়া যুক্তির দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া যায়| যারা এ ধরনের যুক্তি দিয়ে থাকে তাদেরকে প্রশ্ন করা যায়, বিজ্ঞানের কার্যকারিতার তথা প্রযুক্তির ব্যাখ্যা কি? আরেকটু সহজ করে বলি আপনি যে মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করে হাজার হাজার মাইল দূরে আপনার বন্ধুর সাথে আলাপ করছেন সেটি তো আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক একটি ঘটনা| কিন্তু এই ঘটনাটি যে বস্তুটির সাহায্যে ঘটছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলোকে ব্যবহার করেই তৈরি করা হয়েছে| তার মানে কি এই যে আগামীকাল বিজ্ঞানের পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীর সমস্ত মোবাইল ফোন অচল হয়ে পড়বে? এ-রকম যদি না হয় তাহলে বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল এই কথাটির অর্থ আসলে কি? দ্বিতীয়ত শুধুমাত্র দাবির জোরে কোনো কিছু সত্য বলে প্রতিপন্ন হয় না| সত্যতা যাচাই করে নিতে হয় এবং এক্ষেত্রে সবসময়ই সংশোধনের সুযোগ থেকে যায়| সে-ক্ষেত্রে বিজ্ঞান একে যাচাইয়ের সুযোগ রেখে দেয় আর সে-জন্য পরীক্ষণ বিজ্ঞানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ| বিজ্ঞান যদি শুধু দাবিই করত অথবা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ যদি শুধুমাত্র ফাঁকা দাবি হত তাহলে পৃথিবীতে কোনো পরীক্ষাগারই গড়ে উঠত না| অপবিজ্ঞানের বক্তব্যগুলি পরীক্ষাগারে নিয়ন্ত্রিত প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনোটাই সম্ভব নয়|

যা সংশোধনের সুযোগ নেই তা যাচাই করাও অর্থহীন| কিন্তু তারচেয়েও অর্থহীন হল বিজ্ঞানের ওপর এর শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্য এক শ্রেণীর মানুষের মরিয়া প্রচেষ্টা| বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই অনেকের মধ্যে একটিকে যাচাই করে থাকে অথবা দুইটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে| উদাহরণস্বরূপ মহাকর্ষ বল এবং এর জাত ঘটনাসমূহের একাধিক সাংঘর্ষিক তত্ত্ব তথা ব্যাখ্যা ছিল| বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটিকে আমরা

সঠিক হিসেবে পেয়েছি| সংশোধনের অযোগ্য এবং পারস্প রিক সাংঘর্ষিক একের অধিক অপবৈজ্ঞানিক বক্তব্যগুলির ক্ষেত্রে তাহলে একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটিকে গ্রহণ করবার কোনো যৌক্তিক কারণই নেই| অযৌক্তিক মূর্খকারণ অবশ্য থাকতে পারে|

এখন বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনশীলতার একটু ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি| মোবাইল ফোনে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রেরণ এবং গ্রহণ করা হয়| মূল যন্ত্রটি তৈরি করা হয় বিভিন্ন সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী পদার্থজাত ডিভাইস সংযোজনের মাধ্যমে| এই সেমিকন্ডাক্টরের ভৌত ধর্মাবলীকে কাজে লাগিয়ে এই ডিভাইসগুলো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে| আর সেই কাজে লাগানোর জন্য যে বিদ্যার প্রয়োজন হয়েছে সেটি হল নান-রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিক্স| তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে লেগেছে চিরায়ত বিদ্যুৎ-চুম্বক তত্ত্ব| আমরা জানি এরা আরো সাধারণীকৃত তত্ত্বের আসন্নমান মাত্র| এক্ষেত্রে পরিবর্তন হল সাধারণীকৃত তত্ত্বটি খুঁজে পাওয়া| এর অর্থ হল বিশেষ ক্ষেত্রে এই আসন্নমান সঠিক ফলাফল দিচ্ছে বা এদের সফলভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে সেই বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণীকৃত তত্ত্বটি প্রয়োগ করলে যে বিচ্যুতি ধরা পরতো তা ভয়াবহভাবে নগণ্য এবং সে-জন্য ব্যবহারিকভাবে অপ্রয়োজনীয়| একইভাবে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতি বিশ্লেষণের জন্য নিউটনীয় বলবিদ্যার (আসন্নকৃত বা বিশেষ তত্ত্ব) পরিবর্তে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ব্যবহার হল মশা মারতে কামান দাগা| কাজেই বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনশীলতা অর্থ আসলে প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত কোনো সত্যকে বাতিল করা নয় বরং সেই সত্যের ক্ষেত্রের আওতাকে নির্দেশ করা এবং সেটিকে আরও বড় (অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ক্ষেত্রের) কোনো সত্যের অংশ হিসেবে দেখানো|

এ অর্থে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ গতিশীল| নতুন নতুন পরীক্ষণলব্ধ তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে এতে সংযোজন, এর সংশোধন তথা সাধারণীকরণ সম্ভব| অন্যদিকে জ্যোতিষশাস্ত্রের মতন অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কখনও নিজেকে সংশোধন করে না| নতুন কোনো আবিষ্কার, নতুন কোনো তথ্য-উপাত্তই এতে বিশ্বাসীদের এর মৌল স্বীকার্যসমূহকে পুনর্বিবেচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে অক্ষম| জ্যোতিষশাস্ত্র কি গতিশীল এবং সংশোধনযোগ্য? জ্যোতিষীদের তাদের বিদ্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি কখনই প্রমাণিত হয় নি যে তারা এর মূলনীতি থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হয়েছে| বড়জোড় তারা হয়ত নতুন আবিষ্কৃত কিছু গ্রহনক্ষত্রকে তাদের শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে কিন্তু অনুবর্তনকারী যাদুবিদ্যার মূলনীতিটি কিন্তু তাদের সমস্ত কার্যকলাপের ভিত্তি হিসেবে আজতক দাঁড়িয়ে আছে| পৃথিবীতে প্রচলিত প্রায় সমস্ত যাদুবিদ্যা বা অপবিজ্ঞান 'দুটি মূলনীতি'র ওপর দাঁড়িয়ে আছে| একটি হল সমতুল্যতার সূত্র (মজার বিষয় হল আরেক অপবিজ্ঞান হোমিওপ্যাথি এর ঠিক বিপরীত নীতিতে কাজ করে)| এর অর্থ হল কার্য এর কারণের সমতুল্য হবে অথবা একটি জিনিস এর অনুরূপ প্রভাব সৃষ্টি

করবে| অন্যটি হল সংলগ্নতার সূত্র (হোমিওপ্যাথি এই নীতিতে কাজ করে)| মানে যদি দুইটি জিনিস পরস্পরের সংস্পর্শে কখনও থাকে তাহলে এদেরকে স্থানিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেও পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে| প্রথম নীতিটি থেকে ছদ্মবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকে তারা যে কোনো ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হবে কেবলমাত্র সেটিকে নকল করবার মাধ্যমে আর দ্বিতীয়টি থেকে সে ধারণা করে কোন ভৌত বস্তুর ওপর যা কিছুই করবে তা ওই বস্তুর সাথে কখনও সংস্পর্শ ছিল এরকম ব্যক্তির ওপর ঠিক একই প্রভাব ফেলবে| বস্তুটি ওই ব্যক্তির শরীরের অংশ হোক বা না হোক| ভুডু ম্যাজিকে পুতুলের গায়ে সূঁচ ফোটানো এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ|

জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশিচক্রের চিহ্নগুলোর ধর্মাবলী সেই প্রাচীন গ্রিক ও ব্যাবিলনীয় আমল থেকে অপরিবর্তিত আছে| নতুন নতুন গ্রহ আবিষ্কৃত হলেও আজতক কোন জ্যোতিষী স্বীকার করেনি যে অপর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে তাদের অতীত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ত্রুটিপূর্ণ ছিল| কারণ একেবারে প্রথমদিককার জ্যোতিষীগণ সৌরজগতের এক তৃতীয়াংশ গ্রহের প্রভাবকে বিবেচনাতেই আনেন নি| তখন এদের আবিষ্কারই হয় নি| প্রাচীন জ্যোতিষীগণ যখন রক্তিমবর্ণী মঙ্গলগ্রহকে দেখল তখন তারা একে রক্ত আর যুদ্ধ-বিগ্রহের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করল| এই অদ্ভুত ধরনের বিশ্বাসটি আজ অবধি জ্যোতিষীদের মধ্যে অব্যাহত আছে| ব্যক্তির চরিত্রের যুদ্ধংদেহী এবং আক্রমণাত্মক বৈশিষ্ট্যকেও তাঁর কোষ্ঠীতে মঙ্গল গ্রহের অবস্থান দিয়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে| কোনো প্রকৃত-বিজ্ঞান মঙ্গলের এই ধরনের বৈশিষ্ট্য আর প্রভাবকে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ এবং পর্বত-প্রমাণ পরীক্ষণলব্ধ পুনরুৎপাদনশীল উপাত্তের ভিত্তিতেই একমাত্র মেনে নিত| আজ অবধি পশ্চিমা জ্যোতিষশাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থটি হল প্রায় দুই হাজার বছর আগে লেখা গ্রিক পণ্ডিত ক্লডিয়াস টলেমি'র লিখিত '*টেট্রাবিবলিওস*'| কোনো বিজ্ঞানের ক্লাসে কি আজকে দুই হাজার বছরের পুরানো পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হয়?

যদি কোনো ঘটনার বর্তমানে ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে বিকল্প ব্যাখ্যার অভাবকে প্রকৃত বিজ্ঞান কখনও এর তত্ত্বসমূহের সত্যতার কারণ হিসেবে দাবি করে না| জ্যোতিষশাস্ত্রের মত অপবিজ্ঞানে এ ধরনের কুযুক্তি সর্বদা ব্যবহার করা হয়ে থাকে| বিজ্ঞান এবং অপবিজ্ঞানের মধ্যকার এই যে তফাৎ-এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ| বিকল্প ব্যাখ্যার বর্তমান দুষ্প্রাপ্যতাকে বিজ্ঞান কখনো এর কোনো তত্ত্বের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করে না| বড়জোড় তত্ত্বটিকে একটি ঘটনার সম্ভাব্য সবচাইতে ভালো ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে| এর চাইতে ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে এবং তা পরীক্ষণে প্রমাণিত হলে বিজ্ঞান দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করবে| বিজ্ঞানের সমস্ত অনুমান বা প্রকল্পই অনিশ্চিৎ এবং পরিবর্তনশীল| যার বিশদব্যাখ্যা ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে| ধ্রুব এবং ১০০% নিশ্চয়তা দেয়া বিজ্ঞানের কাজ নয়|

বিকল্প ব্যাখ্যার বিষয়টি একটু পরিষ্কার করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি| বুধ গ্রহের কক্ষপথের ব্যতিক্রমী গতিকে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল ভালকান নামক একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহের অস্তিত্বের যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ অনুমানের মাধ্যমে| ঠিক এ-ধরনের প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ইতিপূর্বে সফলভাবে ইউরেনাসের কক্ষপথের ব্যতিক্রমী গতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নেপচুন গ্রহ আবিষ্কার হয়েছিল| দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভলকান গ্রহকে খুঁজে পাওয়া গেল না| বিজ্ঞান কিন্তু সে-জন্য 'নিউটনের তত্ত্ব ভুল হতে পারে না'- এই ধরনের গো ধরে বসে থাকল না| বিজ্ঞানীরা দাবি করলেন না যেহেতু এই মুহূর্তে বুধ গ্রহের কক্ষপথের বিচ্যুতির আর কোনো বিকল্প ব্যাখ্যাই পাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু কোন না কোনোভাবে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বই-এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবে| বিকল্প ব্যাখ্যার অনুসন্ধান চলল| শেষাবধি 'ব্যতিক্রমী গতি'র সাফল্যজনক বিকল্প ব্যাখ্যাটি পাওয়া গেল আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে| যা এর পূর্বসূরি নিউটনের তত্ত্বের সাধারণীকরণ|

জ্যোতিষশাস্ত্রের দাবিগুলোকে প্রায়ই অত্যন্ত নেতিবাচক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়| এর পর্যবেক্ষণগুলোর উদ্দেশ্য কিন্তু এমন সব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা নয় যে-গুলোকে কোনো তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে-বরং এমনসব উপাত্তের সন্ধানে এটি থাকে যেগুলো আপাতত ব্যাখ্যাতীত| এ-ধরনের কোনো কিছু পাওয়া গেলে তারা লাফিয়ে ওঠেন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে ফলাফলগুলোতে নির্দ্বিধায় অলৌকিকত্ব এবং আধ্যাত্মিকতা আরোপ করেন|

এ ধরনের চিন্তাভাবনা অবশ্যই আত্মবিধ্বংসী| এবং বিশেষভাবে অবৈজ্ঞানিক| আত্মবিধ্বংসী কিভাবে? এই ধরনের শাস্ত্রগুলোকে খুবই সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়| জ্যোতিষশাস্ত্রের মতন অপবৈজ্ঞানিক বক্তব্যগুলো শুধুমাত্র এমন ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পায় যেগুলোকে বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না| সেজন্য যতদিন প্রকৃত বিজ্ঞানের আওতা বিস্তৃত হতে থাকবে, যতদিন বিজ্ঞান গতকালের ব্যাখ্যাতীত বিষয়টিকে আজকে ব্যাখ্যা করতে থাকবে-ততদিন জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে| এবং একসময় এই বিষয়টি নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে|

অবৈজ্ঞানিক কিভাবে? কারণ বিজ্ঞান ঠিক যে পথ অনুসরণ করে অপবিজ্ঞান (জ্যোতিষশাস্ত্র) ঠিক তার বিপরীত পথে হাঁটে| একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে এমনভাবে গঠন করা হয় যাতে এটা বেশি পরিমাণে তথ্য-উপাত্তকে ধারণ করতে পারে বা ব্যাখ্যা করতে পারে| বিজ্ঞানীরা সর্বদাই স্বল্পসংখ্যক তত্ত্বের মাধ্যমে অনেক বেশি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী| বহুল পরিমাণ তত্ত্বের মাধ্যমে অল্পসংখ্যক ঘটনাকে নয়| একে বলা হয় বৈজ্ঞানিক সংকোচনবাদ বা সায়েন্টিফিক রিডাকশনিজম| একটি উদাহরণ দেই| ধরা যাক আপনি দুইটি গ্রামের সংযোজক রাস্তাটির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন| একটি গ্রামের লোক সত্য ছাড়া

কিছুই বলতে পারে না| অপর গ্রামটির লোক মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলতে পারে না| আপনি সত্যবাদীদের গ্রামে যেতে চান| এখন আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে একটি লোক আসলো| আপনাকে একটি মাত্র প্রশ্নের মাধ্যমে আপনার পথ খুঁজে বের করতে হবে| প্রশ্নটি কি হবে? যদি আপনি প্রশ্ন করেন-আপনি কি সত্যবাদীদের গ্রাম থেকে এসেছেন?-তাহলে লোকটি সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী যাই হোক না কেন-ইতিবাচক উত্তর দেবে| আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন-আপনি কি পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন-তাহলে সত্যবাদী বলবে না, আর মিথ্যাবাদী বলবে হ্যাঁ| এরপর আপনি প্রথমোক্ত প্রশ্নটি করে সঠিক পথটি জেনে নিতে পারেন| কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি একটি নয় দুইটি প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছেন| অতএব সেই একক প্রশ্নটি কি হবে? প্রশ্নটি হবে আমি কোন পথে হাঁটলে আপনার গ্রামে পৌঁছতে পারব-বায়ে নাকি ডানে? সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীর উভয়ের উত্তরই আপনার প্রশ্নের সঠিক সমাধান দেবে| বিজ্ঞান কিন্তু তার তত্ত্বের নির্মাণে সংকোচনবাদের এই কার্যকর পদ্ধতিটি অনুসরণ করে থাকে ধাপের সংখ্যাকে, আর প্রশ্নের-সংখ্যাকে কমাতে থাকে| প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকের সবচাইতে সফল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোতে সরল কতগুলি গাণিতিক সমীকরণের সাহয্যে হাজার হাজার প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে| অসংখ্য পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণজাত উপাত্ত এ ধরনের তত্ত্বের সাথে প্রায় হুবহু মিলে গেছে| জ্যোতিষশাস্ত্রে ঠিক উল্টো কাজটি হয়ে থাকে| এটি একটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা এবং এর সমাধানের জন্য আসলে দুইটি বা তিনটি নয়-অসীম সংখ্যক প্রশ্নের জন্ম দেয় এবং কোনোটিই এর সন্তোষজনক সমাধান করতে পারে না|

প্যারাসাইকোলজি বা পরা-মনোবিজ্ঞানের মতন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যটি যতটা প্রকট জ্যোতিষশাস্ত্রে ঠিক ততটি নয়| জ্যোতিষশাস্ত্র কিছু পরিমাণে এটিকে প্রকাশ করে থাকে বৈকি| যেমন যখন দাবি করা হয় মহাকাশের কিছু ঘটনা আর মানুষের ব্যক্তিত্বসমূহের মধ্যকার একটি পারিসংখ্যানিক সম্পর্ককে যেহেতু প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, কাজেই জ্যোতিষশাস্ত্র সঠিক হতে বাধ্য| এ ধরনের যুক্তিকে বলা হয় 'আর্গুমেন্ট ফ্রম ইগনোরেন্স' অর্থাৎ অজ্ঞতা থেকে প্রমাণের প্রচেষ্টা| বিজ্ঞান যখন কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না তখন সে অনুসন্ধান চালাতে থাকে আর অপবিজ্ঞান এর আগেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়| ভাবটা অনেকটা এ-রকম : 'কোন বেটা চুরি করেছে সেটা যখন জানা যাচ্ছে না তখন মধু বেটাই চোর!' এ ধরনের কুযুক্তির পরিণাম হল হাজার বছর ধরে তথাকথিত শাস্ত্র চর্চা করবার পরও এর দাবিগুলোর পেছনের কারণগুলোর কার্যপদ্ধতি বা মেকানিজম নির্দেশ করতে জ্যোতিষীদের চলমান করুণ ব্যর্থতা|

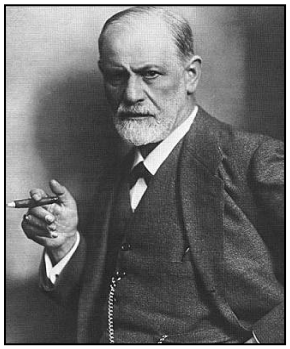

ড. তানভীর হানিফ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং বর্তমান বিভাগীয় প্রধান| তাঁর গবেষণার বিষয় কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব ও উচ্চশক্তির পদার্থবিজ্ঞান|

ফ্রয়েড-তত্ত্ব কি বিজ্ঞানসম্মত?

বিরঞ্জন রায়

১. ভূমিকা

ফ্রয়েড নিজেই তার মনোবিদ্যাকে অভিহিত করেছেন অধিমনোবিদ্যা (Metapsychology) বলে| কাজেই আমাদের শিরোনামে উত্থাপিত প্রশ্নটির একটি স্প ষ্ট না-বোধক উত্তর তো পেয়েই গেলাম| শুরুতেই আর বাগবিস্তারের প্রয়োজন কি? কিন্তু মনোবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণের বোধে ফ্রয়েডতত্ত্বের প্রভাব ব্যাপক| তাই একটি সুস্প ষ্ট 'না' বিবৃতিতেই প্রশ্নটির উত্তর সমাপ্ত করাটা ঠিক হবে না|

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ফ্রয়েডের জীবনের একটি রেখাচিত্র এঁকে তার তত্ত্ব বর্ণনা করব| পরপর থাকবে তার মূল্যায়ন| উপসংহারে মনোবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ধারার উল্লেখ করব, যেন বিজ্ঞানমনস্ক পাঠক তার অনুসন্ধিৎসা সেখানে চালিত করতে পারেন|

২. জীবনের রেখাচিত্র

ফ্রয়েড জন্মেছিলেন মোরাভিয়া অঞ্চলের প্রিবর-ফ্রেইবুর্গ শহরে, ১৮৫৬ সনে| অঞ্চলটি তখন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অধীন ছিল| বর্তমানে তা চেকপ্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত| ফ্রয়েডরা জার্মানভাষী ইহুদি| তার বাবা ফ্রেইবুর্গের কারখানায় চাকুরি করতেন| ১৮৫৯ সনে কারখানাটি বন্ধ হয়ে গেলে, তিনি জীবিকার খোঁজে সপরিবারে ফ্রেইবুর্গ ছেড়ে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ভিয়েনাতে পাড়ি দেন| শৈশবকাল থেকে প্রায় সারাটা জীবন ফ্রয়েড মহাদেশীয় ইউরোপের (Continental Europe) অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ভিয়েনাতেই কাটিয়েছেন|

স্কুল জীবনে গ্যাটে (তার প্রকৃতিবিষয়ক রচনা মাধ্যমে) এবং ডারউইন তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন প্রকৃতি-বিজ্ঞান অধ্যয়নে| সেজন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রকে বেছে নিয়েছিলেন| বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রুক (Ernst Brucke)| ব্রুক বিখ্যাত হেলমহোৎস (Helmholtz) এর সহযোগী ছিলেন| হেলমহোৎস ছিলেন ফ্রয়েডের আইডল| হেলমহোৎস ও তার সহযোগীরা সেই সময়কার ভাববাদী দর্শন অনুপ্রাণিত বিজ্ঞানীদের 'জীবনশক্তি', 'ভাইটাল ইলান', 'আত্মা' ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষার অনুপযোগী ধারণার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন| ফ্রয়েড এদের প্রভাবে নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুবাদী হয়ে পড়েন|

১৮৮১ সনে ফ্রয়েড চিকিৎসাশাস্ত্রে এম ডি ডিগ্রি অর্জন করেন| তার আগ্রহের বিষয় ছিল স্নায়ুতন্ত্র| এ ব্যাপারে তার অনেকগুলো গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে| এগুলোর বিষয় সুষুম্না কাণ্ডের (spinal cord) জাতিজনিক (phylogenic) এবং সুষুম্না শীর্ষের (medulla oblongata) ব্যক্তিজনিক (ontogenic) বিকাশ| ফ্রয়েডের ইচ্ছা ছিল

গবেষণাকেই পেশা হিসাবে বেছে নেয়া| এতে তার পিতারও সম্মতি ছিল| তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না| বর্তমানে যেমন, সে সময়েও কোন ধনী কন্যার পাণিগ্রহণ ছিল আর্থিক সমস্যার একটি সমাধান| কিন্তু ফ্রয়েড পছন্দ করেছিলেন এক নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েকে| এসব বিবেচনা করে তার শুভানুধ্যায়ী শিক্ষক তাকে গবেষকের পেশা ছেড়ে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতে জোর পরামর্শ দেন| তার পরামর্শ মতো ফ্রয়েড ল্যাবরেটরি ছেড়ে ক্লিনিক্যাল মেডিসিন-এ যোগ দেন| এবার তার গবেষণার ক্ষেত্র হয় ক্লিনিক্যাল বিষয়|

১৮৮৬ সনে তিনি বৃত্তি নিয়ে প্যারি যান তৎকালীন শ্রেষ্ঠ স্নায়ূরোগ বিশেষজ্ঞ শার্কো (Jean Martin Charcot)-এর ক্লিনিকে প্রশিক্ষণ নিতে| পেশাগত জীবনে তার উপর শার্কোর প্রভাব ছিল সবচেয়ে গভীর| শারীরিক আঘাতে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ ব্যাহত হয়, এটি চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রমাণিত| শার্কো লক্ষ্য করেন 'হিস্টিরিয়ার' রোগীদের ক্ষেত্রে এরকম কোন শারীরিক রোগ খুঁজে পাওয়া যায় না; বরং মানসিক আঘাতের ইতিহাস পাওয়া যায়| তাই হিস্টিরিয়ার কারণ হিসাবে শার্কো মানসিক আঘাতজনিত dynamic trauma (গতিশীল আঘাত) ওপর গুরুত্ব দিতেন| কিন্তু এর স্বরূপ বা কর্মপ্রক্রিয়া কি, তা তার জানা ছিল না| ধারণাটি ফ্রয়েডকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে|

ভিয়েনায় ফিরে তিনি শিশু হাসপাতালে যোগ দেন এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন| এ হাসপাতালে তিনি কাজ করেন ১৮৯৬ সন পর্যন্ত| তারপর প্রাইভেট প্র্যাকটিস-ই হয় তার জীবিকা|

ফ্রয়েডের রোগীদের উল্লেখযোগ্য অংশই ছিল হিস্টিরিয়ার রোগী| বর্নিহেইম (Hippolyte M. Bernheim) হিস্টিরিয়া চিকিৎসায় 'সম্মোহন অভিভাবন' (hypnotic suggestion) পদ্ধতি ব্যবহার করতেন| এ পদ্ধতি শেখার জন্য ফ্রয়েড ১৮৮৯ সনে ফ্রান্সের নান্‌সিতে যান| শার্কোর ক্লিনিকে কাজ করার সময়ই তার 'ডিনামিক ট্রমা'র কর্মপ্রক্রিয়া হিসাবে মনের অচেতন প্রক্রিয়ার কথা মনে এসেছিল| বার্নহেইমের ক্লিনিকে প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় শক্তিশালী অচেতন মানসিক প্রক্রিয়ার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে তার প্রত্যয় আরো দৃঢ় হয়|

এরপর তিনি ভিয়েনার চিকিৎসক যোসেফ ব্রিউয়ার (Josef Breuer) এর সঙ্গে কাজ শুরু করেন| ব্রিউয়ার হিস্টিরিয়া চিকিৎসায় রোগীকে সম্মোহিত করে রোগীর মনে চেপে রাখা কথা প্রকাশ করার অভিভাবন দিতেন| রোগী চাপা কষ্টকে উগরে দিতে পারলে রোগ সেরে যেত| তাদের দুজনের যৌথ গবেষণার ফল ১৮৯৫ সনে 'Studies on Hysteria' নামে প্রকাশিত হয়| এটি ফ্রয়েডের গবেষণা ধারায় নতুন বাঁক| এখানেই তিনি স্নায়ুতন্ত্রের উপর অচেতন মানসিক ক্রিয়ার প্রভাব নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং তার নতুন চিন্তাধারার সূচনা হয়| উপরিউক্ত রচনার ভূমিকায় বলা হয় মানসিক শক্তি (psychic energy) যদি প্রকাশের পথ না

পায়, তাহলে তা মনোবিকারের উপসর্গে রূপান্তরিত হয়| এই শক্তিকে নিজস্ব পথে চালিত করতে পারলে রোগ উপসর্গ দূর হয়|

ব্রিউয়ার এর সঙ্গে কাজ করার সময় ফ্রয়েড এর কাছে সম্মোহন পদ্ধতিতে চিকিৎসার কিছু সমস্যা ধরা পড়ে| যেমন সব রোগীকে সম্মোহিত করা যায় না এবং অনেক রোগীর ক্ষেত্রে 'সম্মোহন অভিভাবন' এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না| এসব ত্রুটি কাটানোর জন্য তিনি উদ্ভাবন করেন অবাধ অনুসঙ্গ (free association) পদ্ধতি| পরবর্তী জীবনে তিনি এ পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন| অবাধ অনুসঙ্গেরই অঙ্গ হিসাবে তিনি যুক্ত করেন স্বপ্ন সমীক্ষণ (dream analysis)| স্বপ্ন নিয়ে তার গবেষণার ফলশ্রুতি 'Interpretation of Dreams' বের হয় ১৯০০ সনে| এটিই 'ফ্রয়েডবাদের' প্রথম প্রকাশ| এখানে তিনি গবেষণার প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি, যা তিনি নিউরোলজিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল গবেষণায় প্রয়োগ করেছিলেন, তা থেকে সরে এসেছেন| তার পরবর্তী গবেষণাসমূহ যা ফ্রয়েডবাদের অঙ্গ, সে সবেও তিনি এ নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন| উল্লেখ্য ফ্রয়েড প্রবর্তিত এ গবেষণা পদ্ধতি, যা মনোবিজ্ঞানের সাইকোডাইনামিক (psychodynamic) ধারার অঙ্গ, এখনো পরীক্ষাভিত্তিক মনোবিজ্ঞানে স্বীকৃত নয়|

১৮৮৭-১৯০২ এ পর্বে ফ্রয়েড তার বন্ধু বার্লিন এর চিকিৎসক ফ্লেস (Witheim Fleiess) এর সহযোগিতায় আত্ম-সমীক্ষণ সম্পন্ন করেন| পরে তার প্রবর্তিত সাইকোথেরাপির থেরাপিস্টদের জন্য 'আত্ম-সমীক্ষণ' একটি পূর্বশর্ত রূপে প্রযোজ্য হয়| ফ্রয়েড তার তত্ত্ব গঠনে আত্মসমীক্ষণে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেন এবং আত্মসমীক্ষণের অভিজ্ঞতাকেই তার তত্ত্বের সঠিকতার প্রমাণ বলে গণ্য করেন| ফ্রয়েড এর তত্ত্ব গঠনে ফ্লেস এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ|

১৯০২ সনে ফ্রয়েড 'College of Professors of the Faculty of Medicine'-এর অনুমোদনক্রমে অস্ট্রিয়ার সম্রাট কর্তৃক 'Professor Extra Ordinaries' (Associate Professor) পদে বৃত হন| অস্ট্রিয়ার পার্লামেন্ট তার 'সাইকো-এনালাইটিক' চিকিৎসা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেয়| ১৯০৩ সনে প্রকাশিত হয় তার 'Psychopathology of Everyday Life' গ্রন্থ| ফ্রয়েড তত্ত্বের অবৈজ্ঞানিক প্রকৃতির জন্য বিজ্ঞানীমহলে তার কদর হয় নি| কিন্তু স্বপ্ন সম্বন্ধে এবং প্রাত্যহিক জীবনের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে তার লেখা বই দুটি জনপ্রিয়তা পায়| কারণ মানুষের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে নিয়ে সহজবোধ্যভাবে এমন ব্যাখ্যামূলক মনস্তত্ত্বের বই তার আগে কেউ লিখেন নি| এসব বইয়ে তিনি শুধু রুগ্ন মনের কথাই লিখেননি—একটা সার্বিক ও সর্বজনগ্রাহ্য মানসিক দর্শন প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন| তিনি ব্যক্তি মন থেকে সমাজ-মানস ও বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি সর্ব ব্যাপারের মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্ণয়ে মন দিয়েছেন|

একাডেমিক পদোন্নতি, চিকিৎসায় সাফল্য এবং জনপ্রিয় লেখার জন্য ফ্রয়েডের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে| তরুণ শিক্ষার্থীরা তার পাশে জড়ো হয় এ ধারায় গবেষণা করতে, প্র্যাকটিস করতে, কিংবা প্রচার করতে| এ শিষ্যবর্গের মধ্যে কেবল ডাক্তাররাই

ছিলেন না—ছিলেন শিল্পী, কবি, লেখক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার লোক| তার শিষ্য নিউইয়র্কের চিকিৎসক ব্রিল (A. Brill) তার জার্মান ভাষার লেখাগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করেন| ফলে আন্ত র্জাতিক অঙ্গনে তার পরিচিতির পথ সুগম হয়|

১৯০৫ সনে প্রকাশিত হয় তার নতুন ধারার গবেষণা সমীক্ষণ 'Three Contributions to the Sexual Theory'| ১৯০৯ সনে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন এর প্রতিষ্ঠাতা স্টানলি হল (Stanly Hall) এর আমন্ত্রণে ফ্রয়েড শিষ্য আমেরিকা যান ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে| তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকায়, ইউরোপের চেয়েও বেশিমাত্রায় এবং বেশি স্থায়ীভাবে|

১৯১০ সনে বিভিন্ন স্থানে যেসব সাইকোএনালাইটিক সোসাইটি গড়ে উঠেছিল সেসবের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'আন্ত র্জাতিক সাইকোএনালাইটিক এসোসিয়েশন'|

১৯১১ সনে তার প্রথম দিককার গুরুত্বপূর্ণ শিষ্য এডলার (Alfred Adler) তার সঙ্গ ত্যাগ করে নিজস্ব ধারা 'Individual Pschology' গড়ে তোলেন| অবশ্য এটি ফ্রয়েডীয় মূল প্রত্যয় কাঠামোর (paradyme) বাইরে নয়|

১৯১৩ সনে প্রকাশিত হয় 'Totem and Taboo'| এখানে ফ্রয়েড তার তত্ত্বকে নৃতত্ত্বে ও সমাজতত্ত্বে বিস্তৃত করেন| ১৯১৪ সনে তার আরেক গুরুত্বপূর্ণ শিষ্য ইয়ুঙ্গ (Carl Gustav Jung) তার সঙ্গে সম্প র্ক ছিন্ন করে নিজস্ব ধারা 'Analytical Psychology' গড়ে তোলেন| এটিও প্রত্যয় কাঠামোতে ফ্রয়েডীয়|

১৯২০ সনে বের হয় 'Beyond the Pleasure Principle'| এতকাল তার তত্ত্বে মানুষের মূল চালিকাশক্তি ছিল 'Libido' বা যৌনাকাঙ্ক্ষা-যা তত্ত্ব বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে 'Eros' বা 'জীবনাকাঙ্ক্ষা'র ধারণায় প্রসারিত হয়| এবার তার তত্ত্বে এল 'Eros'-এর বিপরীত প্রবণতা 'Thanatos' বা 'মরণাকাঙ্ক্ষা'র ধারণা| জীবনাকাঙ্ক্ষা জীবন্ত বস্তুকে একত্রে ধরে রাখতে চায়, মরণাকাঙ্ক্ষা জৈব বস্তুকে অজৈব বস্তুতে বিচ্ছিন্ন করে| আগেই তিনি আগ্রাসনকে (aggression) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেষণা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন| এবার বললেন 'আগ্রাসন' এর মূলে রয়েছে 'মরণাকাঙ্ক্ষা'|

১৯২০ সনে তিনি 'Professor' পদে কৃত হন| তার পরবর্তী রচনা 'Group Psychology and the Analysis of the Ego' বের হয় ১৯২১ সনে| এতে তিনি মনোসমীক্ষণের ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের ধারণার সাহায্যে গ্রুপ এবং সামাজিক মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন| তিনি দেখাতে চেয়েছেন, আন্ত-ব্যক্তি আবেগগত বন্ধন 'সমষ্টি মনস্তত্ত্বের'ও সারমর্ম|

তার তত্ত্বীয় কর্মের শেষ গুরুত্বপূর্ণ বই 'The Ego and the Id', প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সনে| এতে তিনি Id, Ego, Superego সংবলিত প্রকোষ্ঠভিত্তিক মনের তত্ত্বগত ভিত্তিটি সম্প ন্ন করেন| Superego উদ্ভবের প্রক্রিয়াটিও এতে বিকশিত করেন তিনি| এ বছরই তার

চোয়ালে ক্যান্সারের জন্য প্রথম অপারেশন হয়| এ জন্য তার মোট ২৩ বার অপারেশন হয়েছে|

ফ্রয়েড ১৯৩০ সনে প্রকাশ করেন 'Civilization and Its Discontents'| এতে তার 'Eros-Thanatos' দ্বন্দ্বের তত্ত্বটিকেই সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেন|

১৯৩৩ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধ প্রতিরোধে গঠিত বুদ্ধিজীবী সংঘের পক্ষে আইনস্টাইনের আহ্বানে 'যুদ্ধ কেন হয়' এ ব্যাপারে তার মত জানিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেন| সংঘের পক্ষ থেকে আইনস্টাইনের চিঠি এবং ফ্রয়েডের উত্তর 'Why War' নামক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়| তার মতে মনের অন্ত র্নিহিত মরণাকাঙ্ক্ষাই যুদ্ধের কারণ| এটি মানব-প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ-তাই মুছে ফেলা সম্ভব নয়| কেবলমাত্র সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটিয়ে, মরণাকাঙ্ক্ষার বিপরীত প্রবৃত্তি জীবনাকাঙ্ক্ষাকে পুষ্ট করে এবং মানুষের আত্মবোধের বিস্তার ঘটিয়েই যুদ্ধ বন্ধের আশা করা যেতে পারে|

১৯৩৮ সনে নাৎসিরা অস্ট্রিয়া দখলের পর ফ্রয়েডের প্রকাশনালয় সমেত সমস্ত সম্প ত্তি বাজেয়াপ্ত করে| তাকে বন্দী করে ঘেটোতে রাখে| আন্তর্জাতিক সাইকোএনালাইটিক এসোসিয়েশন ফ্রয়েডের মুক্তির জন্য তীব্র আন্দোলন করে| মোটা অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে নাৎসিরা ফ্রয়েডের পরিবারকে লন্ডনে যাওয়ার অনুমতি দেয়| ফ্রয়েড তার চার বোনকে সঙ্গে নেন নি কিংবা নিতে পারেন নি| নাৎসিরা তাদেরকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করে|

১৯৩৯ সনে লন্ডনেই ফ্রয়েডের মৃত্যু হয়| তার জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত শেষ গ্রন্থ 'Moses and Monotheism' প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সনেই| এতে তিনি তার তত্ত্বীয় অবস্থান থেকে সাধারণভাবে ধর্মের উৎপত্তি এবং বিশেষভাবে ইহুদি একেশ্বরবাদের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন| এটি তার ২৫ বৎসর আগে প্রকাশিত 'Totem and Taboo' গ্রন্থেরই সম্প্রসারণ| তার জীবনের শেষ লেখাটি অসম্পূর্ণ| এটি তার মৃত্যুর পর 'An Outline of Psychoanalysis' নামে প্রকাশিত হয়|

৩. ফ্রয়েড তত্ত্ব

ফ্রয়েড তার তত্ত্ব গড়েছেন মনোসমীক্ষণের (psychoanalysis) মাধ্যমে রোগী চিকিৎসায় অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে| তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন 'প্র্যাকটিসিং ডাক্তার' হিসাবে| ৪১ বৎসর বয়স থেকে বাকি জীবনে 'প্রাইভেট প্র্যাকটিস'-ই হয় তার পেশা| তার রোগীরা বায়ুরোগের (neurotic disorder) এবং হিস্টিরিয়ার (dissociative disorder) রোগী| তার চিকিৎসা পদ্ধতি মনোসমীক্ষণ| চিকিৎসার প্রয়োজনেই তিনি এসব রোগের কারণ এবং এসব নিরাময়ের উপায় বের করার চেষ্টা করছিলেন| তার সময়ে এ ক্ষেত্রগুলো ছিল সম্পূর্ণ অজানা এক রাজ্য| এজন্য তাকে মানুষের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ব্যক্তিত্বের প্রেষণা এবং ব্যক্তির

বিকাশের সমস্যা—যা রোগ আকারে প্রকাশিত হয়, এসব সম্বন্ধে একটি সার্বিক তত্ত্ব গড়ে তুলতে হয়| তত্ত্ব গড়ে তোলার পর এ তত্ত্বকে তিনি চিকিৎসার গণ্ডিতে সীমিত না রেখে প্রয়োগ করেন নৃতত্ত্ব, ধর্ম, সমাজতত্ত্ব-এসব সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যার কাজে| আমরা তার পূর্ণ বিকশিত তত্ত্বটিকে বর্ণনা করে তার প্রয়োগ বর্ণনা করব|

৩.১ স্তরভিত্তিক মন

প্রথমেই আসা যাক সচেতনতার প্রেক্ষিতে মনের কাজের বিভাজনের বিষয়টি| মনের কিছু কাজ সম্বন্ধে আমরা সচেতন এবং কিছু কাজ সম্বন্ধে অসচেতন| মনের কাজের সচেতন অসচেতন ভাগ বহু পুরানো ও সর্বজন স্বীকৃত| কিন্তু ফ্রয়েড পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় মনের অসচেতন দিকটি গুরুত্ব পায় নি| ফ্রয়েড মনের কাজের এই সচেতন ও অসচেতন দিককে মনের স্তর হিসাবে কল্পনা করেন| তিনি মনের অসচেতন কাজকে আবার দুভাগ করেন, অচেতন এবং প্রাকচেতন| অচেতন তাই, চেষ্টা করেও যা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায় না| আবার প্রাকচেতন তা, যা সম্বন্ধে আমরা অসচেতন থাকলেও চেষ্টা করলে সচেতন হতে পারি| এভাবে ফ্রয়েডের তত্ত্বে মন তিন স্তর বিশিষ্ট, অচেতন (Unconscious), প্রাকচেতন (Preconscious) এবং সচেতন (Conscious)| ফ্রয়েড শুধু অচেতন মনকে গবেষণায় নিয়ে আসেন নি, তিনি একে মানুষের আচরণের চূড়ান্ত নির্ধারকের ভূমিকায় বসিয়েছেন| মনোবিজ্ঞানের অন্য ধারায় মনের অসচেতন কাজের গুরুত্ব স্বীকৃত, কিন্তু এর চূড়ান্ত নির্ধারক ভূমিকা স্বীকৃত নয়|

৩.২ প্রকোষ্ঠভিত্তিক মন

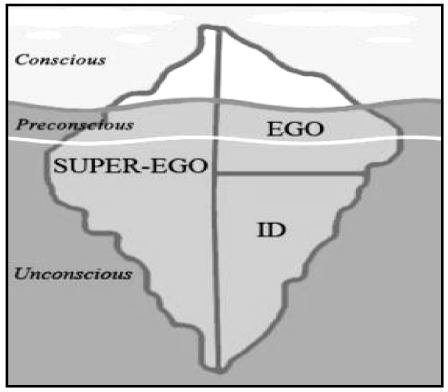

ফ্রয়েড মানুষকে একটি জটিল শক্তিতন্ত্র (complex energy system) হিসাবে কল্পনা করতেন| তার ধারণা, খাদ্যে সঞ্চিত শক্তি বিপাক প্রক্রিয়ায় শারীরিক শক্তিতে পরিণত হয়| সেই শারীরিক শক্তি আবার রূপান্তরিত হয় মানসিক শক্তিতে| ইদ্ (Id) হল শারীরিক শক্তির মানসিক শক্তিতে রূপান্তরের স্থান|

ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন বাইরের জগত যেমন, অন্তর্জগতও তেমনি কার্যকারণ নিয়মাধীন| তিনি বাইরের জগতকে বলতেন বস্তুগত বাস্তবতা (material reality) এবং অন্তর্জগতকে মানসিক বাস্তবতা (psychical reality)| তিনি বিশ্বাস করতেন ভৌত বিজ্ঞানের কাজ যেমন বাইরের জগতের নিয়ম আবিষ্কার, তেমনি মনোবিজ্ঞানের কাজ অন্তর্জগতের নিয়ম আবিষ্কার| কিন্তু তিনি বাইরের জগত ও অন্তর্জগতের পারস্পরিক বা দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটিকে বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র অন্তর্জগতের মধ্যেই

অন্তর্জগতের নিয়ম অনুসন্ধানে রত হন| তার মতে অন্তর্জগতের নিয়ম আবিষ্কারে 'বাস্তবের বোধ' ও 'কল্পনা' উভয়কেই সমান হিসাবে বিবেচনা করতে হবে| মনোজগতের কার্যকারণ নিয়মকে তিনি মানসিক নির্ধারণবাদ (psychic determinism) বলে আখ্যায়িত করেন|

ফ্রয়েডের তত্ত্ব রচনার সূত্রপাত স্তরভিত্তিক মনের কল্পনার উপর| তারপর তিনি যুক্ত করেন প্রকোষ্ঠভিত্তিক মনের ধারণা| প্রকোষ্ঠ তিনটি, ইদ্ (Id=It), ইগো (Ego=The me) এবং সুপারইগো (Superego=The Conscience)| স্তরভিত্তিক মন এবং প্রকোষ্ঠভিত্তিক মন এর আন্তঃসম্প র্কটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিবৃত করা যাক|

ইদ্ মনের অচেতন স্তরে অবস্থিত| এটি মনের চালিকাশক্তি, মানসিক শক্তির (psychic energy) আধার| এখান থেকেই মানসিক শক্তি অন্য প্রকোষ্ঠে চালিত হয়| ইদ্ এ মানসিক শক্তি বিভিন্ন প্রেষণার (motivation) আকারে সঞ্চিত থাকে| ইদ্ এর প্রেষণা বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলে মনে যে পীড়ন (tension) দেখা দেয়, তা দূর করার জন্য ইদ্ নিম্নোক্ত দুটির একটি প্রক্রিয়া বেছে নেয়| পরাবর্ত ক্রিয়া (reflex action) যেমন শিশুর মায়ের স্তনবৃন্ত চোষা; কিংবা কল্পনার মাধ্যমে ইচ্ছাপূরণ (primary process thinking)| ইদ্ এর কর্মনীতি 'সুখ পাওয়া' (pleasure principle)| ফ্রয়েড সহজাত প্রেষণা হিসাবে একটি প্রেষণাকেই চিহ্নিত করেছিলেন, তা যৌনাকাঙ্ক্ষা (libido)| তারপর তিনি আরেকটি প্রেষণার প্রস্তাব করেন, তা আগ্রাসন (aggression)| তত্ত্ব বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যৌনাকাঙ্ক্ষাকে প্রসারিত করেন জীবনাকাঙ্ক্ষায় (eros) যা প্রতিটি জীবকোষকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়| আর আগ্রাসন রূপান্তরিত হয় জীবনাকাঙ্ক্ষার বিপরীত মরণাকাঙ্ক্ষায় (thanatos)| যে আকাঙ্ক্ষা জৈব বস্তুকে অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিক করতে চায়| ফ্রয়েড ব্যাখ্যা দেন, মরণাকাঙ্ক্ষা নিজের দিকে ধাবিত হলে ইগোর আত্মরক্ষা কৌশলে তা স্থানান্তরিত হয় অন্যের প্রতি আগ্রাসনে|

ইগোর বিস্তার মনের চেতন, প্রাকচেতন ও অচেতন স্তর জুড়ে| ইদ্ এর আকাঙ্ক্ষা পূরণের যে দুটি প্রক্রিয়া রয়েছে তা জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়| সব খাদ্যই স্তনবৃন্তের মতো সহজলভ্য নয়; কল্পনায় পোলাও খেলেও পেট ভরে না| তাই ইগোর প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক চিন্তা (secondary process thinking)| যা ইদের আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য কার্যকর পথ স্থির করবে, আবার সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে মানানসইও হবে| হয় খেটে খাওয়ার টাকা জোগাড় করবে, নয় রাজনৈতিক দলের মিছিলে যোগ দিয়ে পোলাও খাবে| তাই ইগোর কর্মনীতি বাস্তবতার নীতি (reality principle)| ইদ্ এর প্রয়োজন মেটাতে ইগো যে বাস্তব কর্মনীতি গ্রহণ করে, তার প্রক্রিয়া চলে মনের সচেতন স্তরে| এসব মেটাতে গিয়ে সমাধান অযোগ্য দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ইগো যে আত্মরক্ষা কৌশল অবলম্বন করে, তার অবস্থান মনের প্রাকচেতন বা অচেতন স্তরে|

সুপার ইগোর বিস্তারও মনের চেতন, প্রাকচেতন এবং অচেতন স্তরে| 'কি করা অনুচিত' সামাজিক এ শিক্ষাকে আত্মস্থ

করে যে বিবেকবোধ গড়ে উঠে এবং 'কি করা উচিত' সামাজিক এ শিক্ষাকে আত্মস্থ করে 'আদর্শবোধ' গড়ে উঠে; এ দুয়ের সমাকলনেই সুপার ইগো গঠিত|

৩.৩.১ মনের কিংবা ব্যক্তিত্বের বিকাশ

ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে বেশিমাত্রায় যৌনপীড়ন অনুভূত হয় এবং সে পীড়ন নিবারণের জন্য ঐসব স্থানকে উদ্দীপিত করার তাড়না জাগে| এসব যৌনপীড়নবহুল অঞ্চলগুলোকে যৌনপীড়ন অঞ্চল (eratogenas zone) বলে| ব্যক্তির বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়কে চিহ্নিত করার হয়, সে সময়ের প্রধান যৌনপীড়ন অঞ্চলের নাম অনুযায়ী|

মুখ পর্যায় (oral stage) : জন্ম থেকে আঠারো মাস বয়স পর্যন্ত| তখন শিশু চুষে বা কামড়িয়ে তৃপ্তি পায়|

পায়ু পর্যায় (anal stage) : দেড় থেকে তিন চার বছর বয়স পর্যন্ত| তখন শিশু মল আটকে রেখে বা ইচ্ছানুযায়ী ত্যাগ করে তৃপ্তি পায়|

শিশ্ন পর্যায় (phallic stage) : তিন চার থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত| ব্যক্তিত্ব বিকাশে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়| এ পর্যায়ে পীড়ন অঞ্চল যৌনাঙ্গ| শিশুরা তখন এ অঞ্চল মর্দনের মাধ্যমে তৃপ্তি পায়| কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, শিশু চায় তার বিপরীত লিঙ্গের পিতা বা মাতার সঙ্গে যৌন সম্প র্ক করতে| তখন সে সমলিঙ্গের পিতা বা মাতাকে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাধা হিসাবে দেখে| তাই সে তাকে শত্রু ভেবে সরিয়ে দিতে চায়| পিতা বা মাতা হত্যা কামনার জন্য তার মনে আবার অপরাধবোধও দেখা দেয়|

ছেলেদের এ জটিল বোধটিকে বলে ইডিপাস কমপ্লেক্স আর মেয়েদেরটিকে ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স| ছেলেদের মধ্যে তখন অপরাধবোধের সঙ্গে এমন ভয় জন্মায় যে, পিতা বুঝি তাকে খোজা বানিয়ে দেবে| এটি Castration Complex| মেয়েদের এ ভয়টি নেই| কিন্তু তাদের ছেলেদের মতো শিশ্ন নেই বলে রয়েছে ছেলেদের প্রতি এক ধরনের ঈর্ষা- Penis Envy| ইদ্ জাত আকাঙ্ক্ষার মতোই এসব কমপ্লেক্সও অচেতন| শিশু অসাধ্য কামনাটি সাধন করতে না পেরে সমলিঙ্গের পিতা বা মাতার সঙ্গে একাত্মবোধ করে আংশিক পরিতৃপ্তি পায়| এজন্য সমলিঙ্গের পিতা বা মাতাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী আত্মস্থ করে| এভাবেই তার ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয়|

প্রচ্ছন্ন পর্যায় (latency period) : পাঁচ বছর থেকে যৌন সক্ষমতা অর্জন পর্যন্ত কাল| তখন ইদ্-এর তাড়নার প্রশমন ঘটে| শিশু তার পরিবেশ থেকে শিক্ষালাভ করে|

জননেন্দ্রিয় পর্যায় (genital stage) : বয়ঃসন্ধিকালে আবার যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়| তখন ইদ্ এর আকাঙ্ক্ষাকে পূরণের জন্য

বাস্তবের দাাব এবং সামাজিক শিক্ষায় ইতোমধ্যে গঠিত সুপারইগো, এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে ইগোকে প্রচণ্ড চাপে থাকতে হয়| এভাবেই ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে|

৩.৩.২ বিকাশ অবরুদ্ধের ধারণা (the concept of fixation)

বিকাশের কোন পর্যায়ে শিশুর আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকলে বা অতিতৃপ্ত হলে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ সে পর্যায়ে অবরুদ্ধ হয়ে যায়| ব্যক্তিত্বের অবরুদ্ধ দশাটির ছাপ পড়ে তার পরিণত ব্যক্তিত্বে| কোন পর্যায়ে বিকাশ অবরুদ্ধ হলে ব্যক্তিত্ব কেমন হবে এর একটি তালিকা দিলাম|

মুখ পর্যায় : আশাবাদী, নির্ভরশীল, উদার, নাছোরবান্দা, কুটিল|
পায়ু পর্যায় : শৃঙ্খলাপরায়ণ, মিতব্যয়ী, সময়ানুবর্তী, একগুঁয়ে, বিদ্রোহী|
শিশ্ন পর্যায় : গর্বিত, আত্মপ্রত্যয়ী, দাম্ভিক, ভীতু, লাজুক|

এক পর্যায়ে বিকাশ অবরুদ্ধতার জন্য এত ভিন্নরকম ফল হয় কেন, তা ফ্রয়েড ব্যাখ্যা করেন নি|

ব্যক্তিত্ব বিকাশে শৈশবের গুরুত্ব 'বিকাশ মনোবিজ্ঞানে' (Developmental Psychology) স্বীকৃত| কিন্তু বিকাশ মনোবিজ্ঞানের কোন ধারাই ফ্রয়েড এর মডেলটি গ্রহণ করে নি| ফ্রয়েডীয় ধারার মনোবিজ্ঞানেও বিকাশ মডেলটি ভিন্ন|

৩.৪ ইগোর আত্মরক্ষা কৌশল (Ego defense mechanism)

মনের এ ধরনের কর্মপ্রক্রিয়াকে আবিষ্কার এবং লিপিবদ্ধ করেন বিভিন্ন সাহিত্যিক| ফ্রয়েড এসবকে সূত্রবদ্ধ করে তার তত্ত্বের অঙ্গ করেন| এসবকে পদ্ধতিবদ্ধ রূপ দেন তার মেয়ে আনা ফ্রয়েড, ১৯৩৬ সনে 'Ego and the Mechanism of Defense' বইয়ে|

বাস্তবের দাবি মিটিয়ে, সুপারইগোর নজরদারিকে এড়িয়ে, ইদ্ এর কামনাকে তৃপ্ত করতে গিয়ে, ইগো যাতে অতিরিক্ত উদ্বেগ, অপরাধবোধ, ক্রোধ, দ্বন্দ্ব প্রভৃতিতে ভারাক্রান্ত না হয়ে পড়ে, সেজন্য ইগো নিম্নবর্ণিত আত্মরক্ষা কৌশলগুলো ব্যবহার করে| এসব কৌশল ব্যক্তি অসচেতনভাবেই ব্যবহার করে| তবে আত্মসমীক্ষণ কিংবা সাইকোথেরাপির মাধ্যমে তাকে এ ব্যাপারে সচেতন করা যায়| নিচে কিছু আত্মরক্ষা কৌশল বর্ণিত হল|

আচরণকে ভিন্নখাতে চালিত করার কৌশলসমূহ (Behaviour-Channeling Defense)

একাত্মবোধ (identification) : বিকাশের শিশ্ন পর্যায়ে শিশু কিভাবে তার সমলিঙ্গের পিতা বা মাতার সঙ্গে একাত্মবোধ করে পিতা বা মাতার প্রতি তার ঘৃণা ও ভয়কে প্রশমিত করে, তা ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে| পরিণত বয়সেও মানুষ তার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা বোধকে অচেতনে পাঠিয়ে দিয়ে সচেতনভাবে তার প্রতি একাত্মবোধ করে নিজের মধ্যে এসব গুণের বিকাশ ঘটায়|

স্থানান্তরকরণ (displacement) : উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো| যেমন আপনার আত্মীয় মারা গেলে দোষ চাপালেন ডাক্তারের অবহেলার উপর| আপনি যে এ ব্যাপারে যথাযথ মনোযোগ দেন নি সেটা মনে করতে চাইলেন না|

উদ্‌গতি (sublimation) : যেমন যৌনাকাঙ্ক্ষা ও আগ্রাসী মনোভাবকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য চিত্রকলা ও খেলাধূলায় রূপান্তরিত করা|

প্রথম পর্যায়ের বাস্তব বিকৃতকারী কৌশলসমূহ (Primary Reality Distorting Defense) : কোন উদ্বেগ উদ্রেককারী অনুভূতি বা ঘটনা সম্বন্ধে সচেতন না হওয়াই এর লক্ষ্য|

অবদমন (repression) : মনের যেসব কামনা বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় কিংবা যেসব স্মৃতি বিবেককে পীড়িত করে সেসব কামনা ও স্মৃতিকে মনের সচেতন স্তর থেকে অচেতনে চালান করে দেয়াই এর কাজ|

অস্বীকৃতি (denial) : বহিঃবাস্তবের যেসব বিষয় উদ্বেগ উদ্রেক করে, সেসবকে মনের অচেতন স্তরে পাঠিয়ে দেয়া| যেমন, ডাক্তার ঘোষণা করার পরও আপনি অস্বীকার করলেন আপনার বড় কোন অসুখ হয়েছে|

দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তব বিকৃতকারী কৌশলসমূহ (Secondary Reality Distorting Defense) : এ কৌশলসমূহ মনের দ্বন্দ্বগুলোকে অচেতনে চাপা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না; এর উপর আরো নতুন কৌশল যুক্ত করে|

প্রত্যাবৃত্তি (regression) : বিকাশের পূর্ববর্তী পর্যায়ের আচরণের ধরনে ফিরে যাওয়া| তেমন কেউ চাপে পড়লে বাচ্চাদের মতো পরনির্ভরশীল আচরণ করে|

অভিক্ষেপ (projection) : এ কৌশলে নিজের অন্তস্থিত নিজেরই অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যাবলীকে শুধু অস্বীকার করা হয় না—তা আরোপ করা হয় অন্যের উপর| যেমন বাস্তবে আপনি অন্যকে ঈর্ষা করেন, কিন্তু অনুভব করেন অন্যে আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত|

প্রতিক্রিয়া সংগঠন (reaction formation): মনের অগ্রহণযোগ্য আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কাজ বেশি মাত্রায় করা| যেমন নিজের যৌনাকাঙ্ক্ষা নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না, তখন বেছে নিলেন কঠোর পর্দা|

যুক্তাভ্যাস (rationalization): অযৌক্তিক আচরণকে যুক্তি দিয়ে সামাজিকভাবে এবং নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য করা| হয়তো কাউকে আপনি আক্রমণ করলেন ক্রোধান্ধ হয়ে| কিন্তু যুক্তি দাঁড় করালেন, এ শাস্তি তার প্রাপ্য|

ফ্রয়েড ইগোর আত্মরক্ষা কৌশলসমূহ সূত্রবদ্ধ করেছিলেন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মনোরোগের কারণ ব্যাখ্যায়| এসব ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হয় নি| তবে কৌশলসমূহ চাপে পড়া মানুষের দৈনন্দিন আচরণ বুঝতে সাহায্য করে| অর্থাৎ 'আত্মরক্ষা কৌশল' ধারণাটি

প্রয়োগের জন্য ইদ্, ইগো, সুপারইগো এ তিন প্রকোষ্ঠভিত্তিক মন এবং ইদ্স্থিত যৌন কিংবা আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সুপারইগোর দ্বন্দ্ব কল্পনার প্রয়োজন নেই| মনের অন্তদ্বর্ন্দ্ব বা বাইরের চাপ থেকে উদ্ভূত নেতিবাচক আবেগ নিরসনে ব্যক্তির তাৎক্ষণিক স্বয়ংক্রিয় অসচেতন প্রতিক্রিয়া বুঝতে 'আত্মরক্ষা কৌশল' ধারণাটি প্রয়োগ করা যায়|

৩.৫ সাইকোথেরাপি

নিউরোটিক ও হিস্টিরিয়ার রোগীদের সাইকোথেরাপি করতে গিয়েই ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব গড়ে উঠে এবং সাইকোথেরাপিতেই তার প্রথম প্রয়োগ ঘটে| ফ্রয়েডের মতে রোগলক্ষণসমূহ রোগীর মনের অচেতন স্তরস্থিত অসমাধিত দ্বন্দ্বের প্রকাশ| ইদ্স্থিত আকাঙ্ক্ষাসমূহ সুপার ইগোর অনুমোদনযোগ্য না হওয়ার ইগো তার 'আত্মরক্ষা কৌশল' প্রয়োগে এসব অচেতন স্তরে চাপা দিয়েছে| এসব দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করে এসবের নিরসনের মাধ্যমে রোগীকে রোগলক্ষণমুক্ত করা সম্ভব| সচেতন মন-ই যখন এসব দ্বন্দ্বকে চাপা দিয়ে রেখেছে, তাই সচেতন কিংবা যুক্তিযুক্ত চিন্তার মাধ্যমে অচেতনস্থিত এসব দ্বন্দ্বের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়| মন যেহেতু মানসিক নির্ধারণবাদী (psychic deterministic) নীতি মেনে চলে, তাই আমাদের কথাবার্তার ভুলচুকে, ভুলে যাওয়ার, স্বপ্নে কিংবা রোগলক্ষণের মতো অযৌক্তিক, অর্থহীন বিষয়গুলোর পিছনেও মনের কার্যকারণ নিয়মটি কার্যকর| অর্থাৎ উপরিউক্ত আপাত অর্থহীন, যুক্তিহীন, উদ্ভট কিংবা তুচ্ছ বিষয়গুলোও অর্থবহ| প্রকৃতপক্ষে এসবের মাধ্যমেই অচেতন আকাঙ্ক্ষা ছদ্মবেশে সচেতন প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে বাইরে প্রকাশিত হয়| তাই অচেতন দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করার জন্য এসব আপাত অর্থহীন, চুক্তিহীন, উদ্ভট, তুচ্ছ বিষয়াবলীকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন| এ কাজ সমাধার জন্য ফ্রয়েড উদ্ভাবন করেন অবাধ অনুসঙ্গ (free association) ও স্বপ্ন সমীক্ষণ (dream analysis) পদ্ধতি| ফ্রয়েডের মতে উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে যা প্রকাশিত হয়, তা প্রতীকী| এর অন্তরে একটি গূঢ় অর্থ থাকে| এসব প্রতীক বিশ্লেষণও ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক| 'স্বপ্ন সমীক্ষণ' অংশে তা আলোচনা করেছি|

ফ্রয়েড যখন সাইকোথেরাপি শুরু করেন| তখন এর পদ্ধতি ছিল 'সম্মোহন অভিভাবন' (hypnotic suggestion)| এর দুটি সীমাবদ্ধতা ছিল| সব রোগীকেই সম্মোহিত করা যায় না এবং অনেক রোগীর ক্ষেত্রে সম্মোহন অভিভাবন এর ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না| তাই সম্মোহনের বিকল্প খুঁজতে গিয়ে ফ্রয়েড উদ্ভাবন করে 'অবাধ অনুষঙ্গ' এবং 'স্বপ্ন সমীক্ষণ' পদ্ধতির| এসব পদ্ধতির মাধ্যমে 'সম্মোহন অভিভাবন' এর সমস্যাগুলোর অনেকটা সমাধান হলেও 'সম্মোহন অভিভাবন' এর কার্যকর দিকটির পূর্ণ প্রতিস্থাপন যে সম্ভব হয় নি, এ বোধ ফ্রয়েডের শেষ জীবন পর্যন্ত বহাল ছিল|

অবাধ অনুসঙ্গ পদ্ধতিতে রোগী একটি আরাম কেদারায় শুয়ে তার মনে যা আসে তাই বর্ণনা করতে থাকেন-যেমন তার স্মৃতি, স্বপ্ন কল্পনা, অনুভব| থেরাপিস্ট দৃষ্টিরেখার বাইরে পাশের চেয়ারে বসে এসব মনোযোগের সঙ্গে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় নোট নেন| থেরাপিস্ট লক্ষ্য করেন, কোন বিষয় বর্ণনায় রোগী বাধা (resistance) বোধ করছেন| থেরাপিস্ট ধরে নেন রোগীর অচেতন মানসিক দ্বন্দ্বটির হদিস এখানেই পাওয়া যাবে| এখানেই তিনি তার অনুসন্ধানকে কেন্দ্রীভূত করেন| সাইকোথেরাপির সময় থেরাপিস্ট বুঝতে পারেন, রোগী থেরাপিস্টকে পেশাগত সম্পর্কের বাইরেও অন্য একটি সম্পর্কে সম্পর্কিত করতে চাইছে| রোগী থেরাপিস্ট এর মধ্যে তার অতীত অভিজ্ঞতার অন্য কোন ব্যক্তিত্বকে আরোপ করছে; যেমন পিতা, মাতা বা প্রেমাস্পদ| সাইকোথেরাপির ভাষায় এটি পাত্রান্তরণ (transference)| থেরাপিস্ট এটিও বুঝতে পারেন তিনি নিজেও রোগীর উপর তার নিজের অভিজ্ঞতার কাউকে আরোপ করছেন| এটি প্রতি-পাত্রান্তকরণ (counter transference)| থেরাপিস্ট তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করে রোগীর অতীত সম্পর্কের ধরন ও তার আচরণের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করতে পারেন| তিনি মনোসমীক্ষণের এই অভিজ্ঞতাকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও প্রতীকার্থের সাহায্যে বুঝার চেষ্টা করেন| এভাবে তার মনে রোগীর ব্যক্তিত্বের বিকাশের বাধাগুলো সম্বন্ধে এবং রোগীর বর্তমান সমস্যাগুলোর গূঢ় অর্থ প্রসঙ্গে একটি অন্তর্দৃষ্টি জন্মায়| থেরাপিস্ট এ অন্তর্দৃষ্টির আলোকে রোগীর নিকট তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমস্যা এবং এরই প্রকাশ বর্তমান সমস্যাসমূহের একটি ব্যাখ্যা (interpretation) হাজির করেন| ব্যাখ্যাটি রোগীর কাছে গ্রহণযোগ্য হলে রোগী তা গ্রহণ করেন| তখন উভয়ে মিলে এ থেকে উত্তরণের কৌশল নির্ধারণ করা হয়| রোগী তার সমস্যা সমাধানে এসব প্রয়োগ করেন| এভাবে থেরাপির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়|

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে যেমন বহির্জগত ও অন্তর্জগত বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন অন্তর্জগত নিয়েই তত্ত্ব গড়া হয়েছে; তেমনি ফ্রয়েডীয় থেরাপিতেও থেরাপিস্টের নজর রোগীর অর্ন্তদ্বন্দ্বের প্রতি, পরিবেশের প্রতি নয়| সুতরাং পরিবেশের পরিবর্তন থেরাপির উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য অন্তর্দ্বন্দ্ব মুক্ত হয়ে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া| অন্য ভাষায় বললে, যন্ত্রণার বাইরের কারণটিকে দূর কথা নয়, বরং যন্ত্রণার বোধটিকে ভোঁতা করে দেয়া|

ফ্রয়েডের সাইকোথেরাপি পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদী| সব রোগীও এতে অংশ নেয়ার উপযুক্ত নন| তাই পরবর্তীতে স্বল্পমেয়াদি পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে| এসবে ফ্রয়েড তত্ত্ব ছাড়াও এই ধারার অন্য তত্ত্ব যুক্ত হয়েছে| এসব থেরাপিতে সমগ্র জীবনের চাইতে বর্তমান সমস্যার প্রতিই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয়| এসব পরিবর্তনের পরও ফ্রয়েডীয় ধারার সাইকোথেরাপি বর্তমানে সাইকোথেরাপির মূল ধারা নয়| 'আন্তঃব্যক্তি সাইকোথেরাপি' (interpersonal psychotherapy) 'জ্ঞানাত্মক-আচরণবাদী থেরাপি' (cognitive behaviour therapy)-এসবই বর্তমানে বেশি ব্যবহৃত হয়|

সাইকোথেরাপিতে ফ্রয়েডের পথিকৃতের ভূমিকা স্বীকৃত| তার উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রকরণ পরিবর্তিত রূপে বর্তমানেও ব্যবহার করা হয়|

৩.৬ স্বপ্ন সমীক্ষণ

জীবনের রেখাচিত্রেই আমরা দেখেছি স্বপ্ন সমীক্ষণ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ| ফ্রয়েডীয় ধারার লেখায় একটি বড় অংশ স্বপ্ন সমীক্ষণ| মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েডই প্রথম স্বপ্নের গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন| ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে স্বপ্নের উদ্দেশ্য 'ইচ্ছাপূরণ'| যদিও আমাদের অভিজ্ঞতা, বেশিরভাগ স্বপ্নই 'ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন' নয়| এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানও দেখিয়েছে, মানুষের স্বপ্নের সামান্য অংশই ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন|

ফ্রয়েড এর মতে ইদ্ এর যে কামনাসমূহ সুপারইগোর নজরদারী এড়িয়ে মনের চেতন স্তরে উঠে আসতে পারে না, তারাই ঘুমন্ত সুপারইগোর নজর এড়িয়ে স্বপ্ন আকারে দেখা দেয়| এজন্য ফ্রয়েডের মতে 'স্বপ্ন অচেতনে পৌঁছানোর সদর রাস্তা'| স্বপ্নেও ইদ্ এর যে কামনাটি প্রকাশিত হয় তা খোলামেলা নয়, ছদ্মবেশী| তাই প্রতিটি স্বপ্নেরই রয়েছে একটি 'প্রকাশিত রূপ' (manifest content) এবং একটি 'প্রচ্ছন্ন মর্মকথা' (latent content)| স্বপ্নের প্রকাশিত রূপে একটি কাহিনি একটি বাস্তব ঘটনার মতো 'স্থান-কাল-পাত্র' এ তিনটি বিষয় দ্বারা সমন্বিত রূপে প্রকাশিত হয় না| সেখানে এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনা জট পাকিয়ে যায়, স্থান ও কাল যায় উল্টেপাল্টে জট পাকিয়ে| ফ্রয়েডীয়রা তত্ত্বের আলোকে এগুলোকে গুছিয়ে নেন| এভাবে কাহিনিটি পুনঃনির্মাণের পরও যা দাঁড়ায় তা প্রতীকী মাত্র| প্রকাশিত রূপের প্রতীকগুলোর ব্যাখ্যার মাধ্যমেই শুধুমাত্র স্বপ্নের প্রচ্ছন্ন মর্মকথা বুঝা সম্ভব| স্বপ্নের কোন প্রকাশিত রূপের প্রতীকী তাৎপর্য কি, এ সম্বন্ধেও ফ্রয়েডীয়দের নিজস্ব উদ্ভাবন রয়েছে—যা তাদের তত্ত্ব নির্দেশিত|

সাধারণভাবে স্বপ্নে দেখা প্রতীকগুলো ফ্রয়েডের মতে যৌনাঙ্গ বা যৌনকার্যের প্রতীক| দুনিয়ার যা কিছু লম্বা শক্ত জিনিস যেমন ছাতা, লাঠি, পেন্সিল, কলম--সবই পুরুষাঙ্গের প্রতীক| তীক্ষ্ণ ধারালো জিনিস, ছুরি, বর্শা, তলোয়ার; আঘাত করার ক্ষমতা আছে যা কিছুর যেমন বন্দুক পিস্তল--সবই পুরুষাঙ্গের ছদ্মবেশ| এরোপে-ন, রকেট এগুলো অভিকর্ষকে তুচ্ছ করে আকাশে উঠতে পারে, সুতরাং এগুলোও ঐ গোত্রে পড়ে| দুনিয়ার সব মাছ ও সরীসৃপ এই আওতায় পড়ে| বাড়ি পুংলিঙ্গ, কিন্তু বাড়িতেই যদি বারন্দা ইত্যাদি থাকে তবে সেটা স্ত্রীলিঙ্গ| অন্যদিকে, শিশিবোতল, খানাখন্দ, বাক্সপেঁটরা, অলিগলি, গুহা, নৌকা, জাহাজ-স্ত্রী যৌনাঙ্গের প্রতীক| পাপেল, পীচ ইত্যাদি কর্তুলাকার ফল নারীবক্ষের প্রতীক| ল্যান্ডস্কেপের দৃশ্য স্ত্রী অঙ্গ নির্দেশক| আবার জটিল যন্ত্রপাটি পুরুষাঙ্গের প্রতীক| প্রতীকগুলো আবার সুবিধামতো অদলবদল করা যেতে পারে| প্রতীকগুলোর কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণের তো সম্ভাবনাই নেই; উপরন্তু এসবের পিছনে কোন একক যুক্তিও কার্যকর নয়| ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্ব

থেকে প্রতীকগুলো উদ্ভাবিত হয়েছে| আবার প্রতীকগুলোকে স্বপ্ন সমীক্ষণে ব্যবহার করে লিবিডো তত্ত্ব প্রমাণ করা হয়| এটি বৃত্তাকার যুক্তির (circularity of logic) দোষে দুষ্ট|

স্বপ্নকে পুনর্নির্মাণের পর প্রতীকার্থের সাহায্যে যে ব্যাখ্যা দাঁড়াল তাই যথাযথ কি না, এর বক্তা নিরপেক্ষ (objective) মাপকাঠি কী--এর উত্তর ফ্রয়েড তত্ত্বে নেই| ফ্রয়েড স্বপ্নের প্রকাশিত রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, স্বপ্নের ঘটনাসমূহ বাস্তব ঘটনার তুলনায় অতিরিক্ত প্রসারিত বা সংকোচিত, বিকৃত বা স্থানান্তরিত এসব পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হয়| স্বপ্নের এ প্রপঞ্চমূলক (phenomenal) বর্ণনাটি যথাযথ| স্বপ্নের কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন স্বপ্ন ইচ্ছাপূরণ করে| এডলার বলেছেন স্বপ্ন বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের সহায়ক| ইয়ুঙ্গ বলেছেন স্বপ্ন মানসিক ভারসাম্য আনে| স্বপ্নের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে তাদের এ ধারণাগুলো কোন কোন স্বপ্নের বেলায় সত্য; সব স্বপ্ন প্রসঙ্গে সাধারণ সত্য নয়| তাদের এসব ধারণা একত্র করলেও স্বপ্ন সংগঠনে ক্রিয়াশীল সাধারণ প্রক্রিয়ার কোন হদিস মেলে না| স্বপ্নকে ঘুমন্ত মস্তিষ্কের বিশেষ প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করলেই কেবল এ সাধারণ প্রক্রিয়ার হদিস মিলতে পারে| স্বপ্ন নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পাভলভের প্রদর্শিত এ পথেই অগ্রসর হচ্ছে|

৪.১ মূল্যায়ন : উৎস

৪.১.১ উৎস : অচেতন

প্রথমেই আসা যাক মনের অসচেতন দিকটি প্রসঙ্গে| ফ্রয়েডপূর্ব মনোবিজ্ঞানে মনের অসচেতন দিকটি উপেক্ষিত ছিল| ফ্রয়েড শুধুমাত্র এর গুরুত্বকে তুলে ধরেন নি; একেই মানুষের আচরণের নির্ধারকের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন| এ ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানে না থাকলেও, দর্শনে তার পূর্বসূরি রয়েছেন| অষ্টাদশ শতকে লেইবনিজ (Leibniz) মনের অসচেতন কাজকে তার দর্শনের আলোচ্যসূচিতে নিয়ে আসেন| ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'অচেতন অযৌক্তিক ইচ্ছা'কেই মানুষের চালিকাশক্তির আসনে বসিয়ে দেন শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) এবং নীটশে (Nietzsche)| সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকী ইউরোপীয় দর্শনে 'সচেতন যৌক্তিক মন'-এর জয় জয়কার| ঊনবিংশ শতকে এসে তা 'অচেতন অযৌক্তিক মন'-এর বিজয় ঘোষণায় পর্যবসিত হয়| এর গভীরে আর্থসামাজিক কারণ রয়েছে| উপরিউক্ত প্রথম দুই শতক ছিল পুঁজিবাদের বিকাশ এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে তার বিজয়ের কাল| কিন্তু ঊনবিংশ শতকে বিজয়ী পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংকটের রূপ নিতে থাকে, যা প্রকাশিত হয় সামাজিক অসন্তোষ ও আন্দোলনে| পুঁজিবাদ ক্রমেই সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অর্জিত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহকে সংকোচিত করে স্বৈরাচারী রূপ নিতে থাকে| বিশ শতকের নাৎসি জার্মানিতে নীটশের দর্শনই হয়ে দাঁড়ায় প্রাধান্যশীল দর্শন| উল্লেখ্য, মনের

অসচেতন কাজের প্রতি গুরুত্বদানকারী উপরিউক্ত তিন দার্শনিকই জার্মান| ফ্রয়েড নিজেও জার্মানভাষী| তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে জার্মান সংস্কৃতি বলয়ে|

৪.১.২ উৎস : প্রকোষ্ঠ ভিত্তিক মন

মনের তিন প্রকোষ্ঠের ধারণা ইউরোপীয় দর্শনে অতি পুরাতন| প্লেটো তার 'রিপাবলিক' গ্রন্থের ৪র্থ পুস্তকে মানসসত্তাকে তিনটি স্বাধীন অংশে ভাগ করেছেন–desiring, reasoning এবং spiritual| অর্থাৎ একটি 'অন্ধ-কামনা', একটি 'বিচার-বিবেক' এবং আরেকটি 'সংগ্রামী'| সংগ্রাম মানে, বেঁচে থাকার জন্য একান্তই যা করণীয়, তাই| দীর্ঘ তর্ক তুলে প্লেটো প্রমাণ করতে চাইছেন এ তিনটি অংশ স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ| তিনটি অংশের মধ্যে প্রবল বিরোধ ও দ্বন্দ্ব| বিরোধটা অবশ্য সবচেয়ে তীব্র ওই অন্ধ-কামনা আর বিচার-বিবেক এর মধ্যেই| সংগ্রামী অংশটাকে তাই প্রায়ই এ বিরোধের মধ্যস্থতা করতে হয়| আমরা যদি প্লেটোর মনের এ তিনটি অংশকে যথাক্রমে ইদ্, সুপারইগো এবং ইগো দ্বারা প্রতিস্থাপিত করি, তাহলেই ফ্রয়েডতত্ত্বের প্রকোষ্ঠভিত্তিক মনের ধারণাটি পেয়ে যাই|

এ প্রকোষ্ঠভিত্তিক মনের সঙ্গে মস্তিষ্কের কর্মাঞ্চল ও কর্ম প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ কী, তা ফ্রয়েড তত্ত্বে অনুল্লেখিত| তাই তার মনটি আপাত মস্তিষ্কভিত্তিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে অবলম্বনহীন| আমরা জৈব ও অজৈব পদার্থের পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ট্য জানি| যদিও জৈব পদার্থ অজৈব পদার্থ দিয়েই গঠিত, তবু গঠন বিন্যাসে জটিলতার জন্য সেখানে এমন কিছু গুণের উদ্ভব হয় যা জৈব বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত| নতুন গুণের উদ্ভব ঘটলেও জৈব পদার্থের ভিত্তিতে কিন্তু রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার নিয়মাবলী কার্যকর থাকে| একই কথা প্রযোজ্য রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সম্পর্কের বেলাতেও| অর্থাৎ বস্তু বিভিন্ন স্তরের সংগঠনে বিন্যস্ত হয়, রূপান্তরিত হয়| সংগঠনের প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্যসূচক কিছু গুণাবলী থাকে| আবার সংগঠনের অপেক্ষাকৃত সরলতর ও জটিলতর পর্যায়ের সঙ্গে তার একটি সম্পর্কও থাকে| মনের কিছু গুণাবলী রয়েছে যা জৈব-পদার্থের গুণাবলী থেকে ভিন্ন ও নতুন| কিন্তু এ গুণাবলীর সঙ্গে মস্তিষ্কের কর্মপ্রক্রিয়ার একটি সম্বন্ধও রয়েছে| কারণ মন মস্তিষ্কের কর্মপ্রক্রিয়ার প্রকাশ| আমরা দেখলাম এ সম্বন্ধটি ফ্রয়েডতত্ত্বে অনুপস্থিত| পক্ষান্তরে ফ্রয়েড প্রতিটি জীবকোষের জীবন্ত সবকিছুকে একত্রে ধরে রাখতে চাওয়ায় এবং জীবন্ত বস্তুর অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতায় মনের দুই বিপরীতমুখী চালিকাশক্তির সন্ধান করেছেন| এসব দার্শনিক দূর কল্পনার প্রকাশ-বৈজ্ঞানিক অনুকল্প (hypothesis) নয়| আমরা এটিও লক্ষ্য করেছি, ব্যক্তি মনসমূহের মিথস্ক্রিয়াতে উদ্ভূত সমষ্টিমন বা সমাজমনস্তত্ত্বে যে নতুন গুণের উদ্ভব ঘটে, সে ধারণাও ফ্রয়েডতত্ত্বে অনুপস্থিত| বিপরীতে ফ্রয়েড ব্যক্তি মনস্তত্ত্ব দিয়েই সমষ্টিমনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন|

৪.১.৩ উৎস : প্রেষণা

ফ্রয়েডের পর্যবেক্ষণের বিষয় ছিল নিউরোটিক রোগীদের আচরণ| এর উদ্দেশ্য ছিল এসব অস্বাভাবিক আচরণের কারণ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা| তা করতে গিয়ে তিনি যে তত্ত্ব গড়েন তাকেই তিনি প্রসারিত করেন সব যুগের সব মানুষের সাধারণ মনস্তত্ত্বে| এজন্য তিনি তার পর্যবেক্ষণকে শিশুদের লালন পালন এবং মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে বিস্তৃত করেছিলেন| তিনি তত্ত্ব রচনায় স্বীকার্য হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন সে সময়ের প্রকৃতিবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের প্রচলিত কিছু ধারণাকে| এবার আমরা এ দিকটিতে নজর দেব|

তার সময় প্রকৃতি-বিজ্ঞানে ভৌত ও রাসায়নিক শক্তির ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল| এই দুয়ের অনুকরণে জীববিজ্ঞানেও 'প্রাণশক্তি'র ধারণাটি তত্ত্ব প্রস্তাব আকারে চালু ছিল| পরে এটি পরিত্যক্ত হয়| ফ্রয়েড এসবের অনুকরণে 'মানসিক শক্তি'র (psychic energy) কল্পনা করে এ শক্তির চলনপ্রক্রিয়া (psychodymics) নিয়েই তত্ত্ব রচনা করেন| মনোবিজ্ঞানে তার প্রবর্তিত ধারাটি 'সাইকোডিনামিকস' নামেই পরিচিত| কিন্তু এ মানসিক শক্তির প্রকৃতিটি কী, তা তিনি কখনোই ব্যাখ্যা করেন নি|

তত্ত্ব রচনার প্রথম পর্যায়ে ফ্রয়েড একটিমাত্র প্রেষণাকে চিহ্নিত করেছিলেন, এটি যৌনাকাঙ্ক্ষা (libido)| শুধুমাত্র একটি প্রেষণা দিয়ে সব মানবিক আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, তিনি লিবিডো-তত্ত্বকে সর্বরতিবাদ (pansexualism) পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন| তার মতে, লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ এর মূল চালিকাশক্তি, ক্ষুধা নিবারণের লক্ষ্যে খাদ্য উৎপাদনের সচেতন ইচ্ছা নয়; তা ইডিপাস কমপ্লেক্স বা মায়ের সঙ্গে সঙ্গম করে তাকে গর্ভবতী করার অচেতন আকাঙ্ক্ষা| ফ্রয়েড যে এ উদ্ভট তত্ত্ব প্রণয়নে সাহসী হয়েছিলেন, এর পিছনে শুধু তার সাইকোথেরাপিতে লব্ধ অভিজ্ঞতাই কাজ করে নি; কাজ করেছিল জীববিজ্ঞানে ডারউইন তত্ত্বের সফলতার উদাহরণ| ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে প্রজনন সফলতার ভাষ্যেও প্রকাশ করা যায়| যে জীব যত বেশি প্রজনন সফল অর্থাৎ যত বেশি বংশধর রেখে যেতে পারে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে তার বংশাণুর টিকে থাকার সম্ভাবনা ততোধিক| এ তত্ত্বটি থেকে ফ্রয়েড অচেতন যৌনাকাঙ্ক্ষাকে মানুষের একমাত্র চালিকাশক্তি হিসাবে কল্পনার সাহস পেয়েছিলেন| কিন্তু 'ভৌত শক্তি'র ধারণাটিকে যেমন 'মানসিক শক্তি'র ধারণায় রূপান্তরিত করা যায় না, তেমনি জীববিজ্ঞানের কোন তত্ত্বকে সরাসরি মনোবিজ্ঞানে আরোপ করা যায় না|

যৌনাকাঙ্ক্ষার পর ফ্রয়েড আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেষণাকে চিহ্নিত করেন, তা আগ্রাসী মনোভাব (aggression)| তত্ত্ব বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যৌনাকাঙ্ক্ষাকে জীবনাকাঙ্ক্ষা (eros) এবং আগ্রাসনকে মরণাকাঙ্ক্ষা (thanatos) বলে চিহ্নিত করেন| জীবনাকাঙ্ক্ষা ধারণাটি সাধারণভাবে স্বীকৃত, কিন্তু মরণাকাঙ্ক্ষার তাত্ত্বিক উৎস কি? এটি তার সময়ে শারীরবিজ্ঞান-এ (Physiology)

প্রচলিত স্থিরতার নীতি (Constany Principle)| এ নীতি অনুযায়ী সকল জীবন প্রক্রিয়াই অজৈব জগতের স্থিরতায় প্রত্যাবর্তন করতে চায়| আমরা জানি অজৈব জগতও স্থির নয়| বস্তুত কোন জগতই স্থির নয়| স্থিরতার নীতিও আজ পরিত্যক্ত|

৪.১.৪ উৎস : বিকাশ

এবার আসা যাক ব্যক্তিত্ব বিকাশের তত্ত্বে| বিকাশের মুখ, পায়ু ও শিশ্ন পর্যায় কল্পনার মূলে কিছু পর্যবেক্ষণ নিশ্চয়ই রয়েছে| প্রথম দেড় বছর চুষণ এবং কামড়ানো ক্রিয়াটি শিশুর প্রধান ক্রিয়া বলেই চোখে পড়ে| দেড় থেকে তিন/চার বৎসর বয়সে নাগরিক সমাজে শিশুকে মলমূত্র ত্যাগের সামাজিক নিয়মে অভ্যস্ত করানো হয়| চার/পাঁচ বয়সে শিশুর শিশ্নের প্রতি কৌতূহল জাগে| এ সময়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের কিছু লক্ষণও দেখা দেয়| কিন্তু এ ব্যক্তিত্বের বিকাশ যে এ পথ ধরেই অগ্রসর হয়, তা নিশ্চিত হওয়া যায় কি করে? ফ্রয়েড ব্যক্তিত্ব বিকাশের তত্ত্ব রচনায়, এ অনুমানটি আহরণ করেছেন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রস্তাব এবং একটি নৃতাত্ত্বিক মিথ থেকে|

সে সময় জার্মান জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল (Ernst Haeckel) এর একটি তত্ত্বপ্রস্তাব চালু ছিল| বিবর্তন সমর্থক এ তত্ত্বপ্রস্তাবটি-- 'ব্যক্তিজনিতে জাতিজনি পুনরাবৃত্ত হয়' (ontogeny recapitulates phylogeny)| অর্থাৎ কোন প্রাণী ভ্রূণ পর্যায়ে, তার প্রজাতিটি বিবর্তনের যেসব পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে সেসব অতিক্রম করে| যেমন একটি মানবশিশু ভ্রূণাবস্থায় প্রথমে এককোষী, তারপর বহুকোষী গোলাকার, তারপর মৎসাকার, তারপর লেজবিশিষ্ট সরীসৃপাকার, তারপর বানরাকার এবং শেষে মানুষাকার ধারণ করে| এ তত্ত্বের সঙ্গে মিল রেখে মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে একটি ধারণা চালু ছিল| 'মানব শিশু মানসিক বিকাশের প্রথম পর্যায়ে, মানুষ তার ইতিহাসে যেসব পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে, সেসব পর্যায়গুলো অতিক্রম করে|' ফ্রয়েডের ভাষায়, প্রতিটি ব্যক্তি তার বৃদ্ধি বিকাশের সময় কমবেশি তার জাতির বৃদ্ধি বিকাশের পর্যায়গুলো অতিক্রম করে, পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়| ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের তত্ত্বের ভিত্তি এই অনুমান|

হেকেল তত্ত্বের আপাত দৃশ্যমান কিছু প্রমাণ থাকলেও, গভীর পর্যবেক্ষণে এর অসারতা ধরা পড়ে এবং পরিত্যক্ত হয়| মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানেও হেকেল তত্ত্বের অনুসরণে রচিত তত্ত্বটি প্রমাণাভাবে পরিত্যক্ত| একটি শিশু জন্মায় পুরোপুরি পরনির্ভর হয়ে| জন্মের পর শুধু স্তন শোষণ ছাড়া, জীবন ধারণের অন্য কোন কাজেই সে অপারগ| দীর্ঘ সামাজিক লালনেই সে স্বনির্ভর মানুষ হয়ে উঠে| পক্ষান্তরে মানবসমাজ কখনোই পরনির্ভর নয়| উদ্ভবের সময় থেকে অস্তিত্বের সংগ্রামে জয়ী হয়েই সে বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকে আছে| তাই মানবসমাজের বিকাশ ও ব্যক্তির বিকাশ তুলনীয় নয়|

এবার আসা যাক মানব সমাজের ইতিহাসের পরিবর্তে, ফ্রয়েড যে নৃতাত্ত্বিক মিথকে অবলম্বন করে তার বিকাশ তত্ত্ব রচনা করেছেন সে প্রসঙ্গে| এ মিথ তিনি গ্রহণ করেছেন রবার্টসন স্মিথ (Robertson Smith) এর কাছ থেকে| বর্তমানের কোন নৃতত্ত্ববিদই একে সত্য মনে করেন না| এতে ফ্রয়েড নিবৃত্ত হন নি| তার তত্ত্বের জন্য যা মানানসই তাই গ্রহণ করেছেন| 'Moses and Monotheism' এ তিনি লিখছেন, "আমার বইয়ের (*Totem and Taboo*) পরবর্তী সংস্করণে আমার অভিমত পরিবর্তন করি নি বলে, আমাকে কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে| কারণ সম্প্রতি নৃতত্ত্ববিদরা বিনা ব্যতিক্রমে রবার্টসন স্মিথের তত্ত্বসমূহ পরিত্যাগ করেছেন এবং যথেষ্ট ভিন্নরকম তত্ত্ব দ্বারা এসবের আংশিক প্রতিস্থাপন করেছেন| কিন্তু সর্বোপরি, আমি নৃতত্ত্ববিদ নই| আমি একজন মনোসমীক্ষক| মনোসমীক্ষণের প্রয়োজনে নৃতত্ত্ব থেকে আমার প্রয়োজনমত তথ্য নির্বাচনের অধিকার আমার রয়েছে| মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের বিশ্লেষণে স্মিথের তথ্যসমূহ আমাকে মূল্যবান সংযোগসূত্র যোগায়| তার বিরোধীদের লেখা সম্বন্ধে আমি এটা বলতে পারি না|"

স্মিথ কথিত মিথটির ফ্রয়েডীয় ভাষ্য এরকম -- অনেক অনেকদিন আগে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ নির্মম অত্যাচারী দলপতির কঠোর শাসনে দিন কাটাত| গোষ্ঠী গড়ে উঠে নি, টোটেম চালু হয় নি, ট্যাবুর বালাই নেই| দলের সমস্ত মেয়েদের একমাত্র ভোগ স্বত্ত্বাধিকারী দলপতি বা পিতা| ছেলেদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা দল থেকে বিতাড়িত হত; পাছে পিতার ভোগদখলে তারা বাধা সৃষ্টি করে| মানবমন সেসময় পশু মনের মতোই অসংগঠিত| চেতন তখনও অচেতন থেকে আলাদা হয়ে যায় নি, সুপারইগোর আভাস নেই, মনের মধ্যে কর্তব্য-অকর্তব্য, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব নেই| আদর্শ বলে কোন কথাই তৈরি হয়নি| প্রবৃত্তির অন্ধ আবেগকে বাধা দেবার বা অবদমনের কোন আন্তর্মানসিক বিধি ব্যবস্থাই নেই| প্রবৃত্তি আর আবেগকে বশীভূত করতে পারে একমাত্র দলপতির শাসন| মন অখণ্ড অবিভক্ত—জড় জগতের সঙ্গে একাত্ম| মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ অজানা| যা কিছু দ্বন্দ্ব, বাইরের| সংঘর্ষ লড়াই নিজেদের মধ্যে অথবা পশুর সঙ্গে| অন্তর্দ্বন্দ্বহীন এই যুগকে ফ্রয়েড অলীক বিশ্বাসের যুগ বলেছেন| তারপর ঐসব খেদিয়ে দেওয়া ছেলের দল একদিন দল বেঁধে ফিরে এল| দলপতি পিতাকে হত্যা করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল| শুধু তাই নয়, তার মাংস দিয়ে করল বিরাট ভোজের ব্যবস্থা| এতেই মনে প্রথম পাপবোধের সঞ্চার ঘটল মানবমনে| ইদ্ আর ইগোর মধ্যে প্রথম পাঁচিল আদিম পাপবোধ| এই পাপবোধ জন্ম দিল সেন্সর সুপারইগোর| ন্যায় অন্যায়, পাপপূণ্য ইত্যাদির বিচার শুরু হল মানুষের মনে| অবদমন হয়ে উঠল শক্তিশালী মনন ক্রিয়া| এ হলো প্রকোষ্ঠভিত্তিক মন উদ্ভবের কাহিনি| আদমের স্বর্গচ্যুতির কাহিনির সঙ্গে এর পার্থক্য শুধু বিষয়বস্তুতে|

ফ্রয়েডের মতে শিশু তার বিকাশের সময় মানবেতিহাসকে সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করে| বিকাশের মুখপর্ব স্বগোত্র ভোজনকারী মানসিকতার অভিব্যক্তি স্তর, পায়ুপর্ব পূর্বপুরুষের হিংস্রতা ও উগ্রতার স্তর, আর শিশ্নপর্ব তো 'ইডিপাস' ও 'ইলেকট্রা' নামাঙ্কিত গ্রিক ট্রাজিক কাহিনীতে বিধৃত পৌরাণিক স্তরের পুনরাবৃত্তি|

ফ্রয়েডের 'বিকাশ রুদ্ধতা'র ধারণাও 'পুনরাবৃত্তি তত্ত্বের' অনুসিদ্ধান্ত| হেকেল তত্ত্বের এ অনুসিদ্ধান্তটিও দ্রুতই জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে ছড়িয়ে পড়ে, সাহিত্যও এতে প্রভাবিত হয়| হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) প্রস্তাবিত সামাজিক ডারউইনবাদ (Social Darwinism) যেমন প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদীদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল, বিকাশ রুদ্ধতার ধারণাটিও তাই হয়ে উঠল| এক শ্রেণির জীববিজ্ঞানী ঘোষণা করলেন, মানব প্রজাতির পূর্ণাঙ্গ বিকশিত রূপ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ| শেতাঙ্গ স্ত্রীলোক এবং শিশু এর পূর্ববর্তী স্তর| মানব বিকাশের নিম্নতম স্তরে আটকে রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গরা|

আমরা ফ্রয়েড তত্ত্ব বর্ণনায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সময় বিকাশ রুদ্ধতার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছি| মনোরোগের ব্যাখ্যার জন্যও ফ্রয়েড 'পুনরাবৃত্তি' এবং 'বিকাশ রুদ্ধতার' তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন| ফ্রয়েডের মৃত্যুর পর তার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হাঙ্গেরীয় ফেরেঞ্চির (Sandor Ferenczi) সম্পাদনার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বই '*A Phylogenetic Fantasy*'-তে এসবের বর্ণনা রয়েছে| ১৯১৫ সনের ১২ই জুলাই লিখিত চিঠিতে ফ্রয়েড ফেরেঞ্চিকে লিখেছেন, "ইদানীংকালে বায়ুরোগ বলতে আমরা যা দেখি, তা একসময় মানবসমাজের ইতিহাসে মানবীয় আচরণ ছিল| বায়ুরোগ হল মানব সভ্যতার মানুষের মনের বিকাশের সাক্ষী|" ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমস্যার বেলায় শুধুমাত্র 'বিকাশ রুদ্ধতাই' দায়ী| সুস্থ ব্যক্তির মানসিক রোগ হওয়ার পিছনে, আত্মরক্ষা কৌশলের প্রত্যাবৃত্তি (regression) প্রক্রিয়াটি কার্যকর| অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যক্তির বিকাশের আগের স্তরটিতে অবনমন হয়|

হেকেলের পুনরাবৃত্তি তত্ত্বটিকে জীববিজ্ঞানের বাইরে এনে, মানুষের মনের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য, লামার্কের (Lamarck) তত্ত্বটি স্বীকার করা প্রয়োজন| অর্থাৎ স্বীকার করা প্রয়োজন, মানুষের অর্জিত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ মানুষের সংস্কৃতিও বংশগতিতে স্থানান্তরিত হয়| নতুবা মানব ইতিহাস কিভাবে ব্যক্তির বিকাশের সময় পুনরাবৃত্ত হবে? তাই ফ্রয়েড "Phylogenetic Fantasy"-তে লিখেছেন, "আমরা সঠিক যুক্তির ভিত্তিতে দাবি করতে পারি, কোন ব্যক্তি তার জীবনকালে অর্জিত গুণাবলী বংশগতিতে তার সন্তান-সন্ততির মারফত প্রবাহিত করে|" যদিও আমরা জানি, ফ্রয়েড যখন এসকল তত্ত্ব রচনা করছেন, তখন জীববিজ্ঞানে লামার্কের তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়েছে| ১৯৩৫ সনে বংশগতি এবং ডারউইন তত্ত্বের সংশ্লেষণে 'বিবর্তনের সংশ্লেষিত তত্ত্ব' প্রকাশিত হয়ে দ্রুতই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে| তবু ফ্রয়েড ১৯৩৯ সনে প্রকাশিত *Moses and Monotheism* বইতে লিখেছেন, "অর্জিত গুণাবলি প্রাণির বংশগতি মারফত সঞ্চারিত হয়, এই

তত্ত্ব বাতিল করে দেওয়া হয়েছে| কিন্তু সমস্ত কিছু বিবেচনা করে আমার মনে হয়, জীববিজ্ঞানের বৃদ্ধি-বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এ তত্ত্বটি বাতিল করা উচিত নয়|''

৪.২ মূল্যায়ন : পদ্ধতি

আমরা দেখলাম, ভৌত-জীব-নৃ এ তিনটি বিজ্ঞানের কতকগুলো অপ্রমাণিত ও পরে পরিত্যক্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে ফ্রয়েড তার তত্ত্ব রচনা করেছেন| কাজেই যৌক্তিক বিচারে তা ভুল হতে বাধ্য| কিন্তু একটি তত্ত্বের প্রকৃতিটি বৈজ্ঞানিক কি না, তা তত্ত্বটির ভুল কিংবা সঠিকতা দ্বারা নির্ণিত হয় না| একটি তত্ত্বের প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক কি না, তা নির্ণিত হয় তত্ত্বটি রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে কি না এর দ্বারা| একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (theory) কোন ঘটনার অন্তরনিহিত কারণ কিংবা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে অন্তরলীন সম্প র্ক বিষয়ে একটি বিবৃতি| একটি অনুকল্প রচিত হয় এসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ/পরীক্ষণে (observation/ experiment) প্রাপ্ত যাচাইযোগ্য তথ্য/উপাত্তের (fact/data) উপর ভিত্তি করে| তত্ত্বপ্রস্তাব থেকে অবরোহী পদ্ধতিতে যেসব অনুপ্রস্তাব (inferance) গ্রহণ করা সম্ভব, যদি সে সব পর্যবেক্ষণ/পরীক্ষণে সত্য প্রমাণিত হয়, তবে অনুকল্পটি তত্ত্বের মর্যাদা পায়|

এই নিরিখে ফ্রয়েডের তত্ত্ব বিচার করা যাক| ফ্রয়েড সাইকোথেরাপির সময় অবাধ অনুসঙ্গে কথিত রোগীর স্মৃতি, চিন্তা, অনুভব, স্বপ্ন রোগীর পাশে বসে শুনতেন| থেরাপির পর তিনি তার শ্রুত বিষয়গুলোর মধ্যে যেসব তথ্য গুরুত্বপূর্ণ মনে হত তা টুকে রাখতেন| রোগীর 'পত্রান্তরিত' আচরণকে বিশ্লেষণ করে তাও তিনি নথিভুক্ত করতেন| সুতরাং তার সংগৃহীত তথ্য কতটুকু তার পর্যবেক্ষণ, কতটুকু তার ব্যাখ্যা, তা নিশ্চিত হওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় এসব তথ্য যাচাই করে দেখা| ফ্রয়েড তার সংগৃহীত তথ্য থেকে কিভাবে তার তত্ত্বে পৌঁছেছেন তার বর্ণনা দেন নি| তত্ত্ব থেকে কিভাবে অনুকল্প টানা যাবে এবং সেসব কিভাবে যাচাই করা যাবে, সেসবও তার লেখায় অনুপস্থিত| ফ্রয়েডীয়রা, যেসব তথ্য থেকে ফ্রয়েড-তত্ত্ব রচনা করছেন, সেসবকেই তত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে হাজির করতে চান| এটি বৃত্তাবদ্ধ যুক্তির দোষদুষ্ট| কাজেই পদ্ধতিগত বিবেচনায় ফ্রয়েডতত্ত্ব কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়|

ফ্রয়েডতত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত না হলেও মনোবিজ্ঞান বিকাশে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে| বিজ্ঞানের প্রতিটি মৌলিক শাখা বিকাশেরই তিনটি পর্যায় রয়েছে| প্রথমটি দর্শনমূলক বা অধিবিদ্যক (metaphysical), দ্বিতীয়টি গুণাত্মক পর্যবেক্ষণমূলক (qualitative observational), তৃতীয়টি পরিমাণাত্মক পরীক্ষামূলক (quantitative experimental)| মনোবিজ্ঞান এখন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে ক্রিয়াশীল| তাই এখন ফ্রয়েডের অধিবিদ্যক তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মর্যাদা দেয়ার প্রয়োজন নেই|

এজন্য ব্রিটিশ *Oxford Text Book of Psychiatry* ফ্রয়েডতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব না বলে সাহিত্য হিসাবে আখ্যায়িত করেছে| তাদের মতে সাহিত্য যেমন মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের অন্ত র্দৃষ্টি যোগায়, ফ্রয়েডতত্ত্বও তাই| বিজ্ঞানের তত্ত্ব যেমন ঘটনার কার্যকারণকে বিবৃত করে, এটি এমন নয়| অন্যদিকে আমেরিকান *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry* ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনোসমীক্ষণ ধারাটিকে '*Science of Psychoanalysis*' নামে অভিহিত করে| কিন্তু প্রচলিত বিজ্ঞানের সঙ্গে এই বিশেষ বিজ্ঞানটির সম্বন্ধ কি তা ব্যাখ্যা করে না| ফ্রয়েডতত্ত্বের প্রভাব তার উৎপত্তিস্থল ইউরোপ থেকে আমেরিকাতেই বেশি বিস্তৃত হয়েছিল| American Psychiatric Association এর মানসিক রোগের শ্রেণিবিভাগ সংক্রান্ত বই '*Diagnostic and Statistical Manual*' এর প্রথম দুটি সংস্করণের তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল ফ্রয়েডতত্ত্ব| কিন্তু এটি বাস্তবে কর্মোপযোগী না হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ থেকে ফ্রয়েডবাদের পরিবর্তে এর ভিত্তি হয় অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) | পরবর্তী সংস্করণগুলিতেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে|

ফ্রয়েড যখন তার সাইকোথেরাপি শুরু করেন, তখন মানসিক রোগের কোন কার্যকর ভৌত চিকিৎসা (যেমন, ওষুধ, ECT) ছিল না| কিন্তু ১৯৫০ এর দশক থেকে ভৌত চিকিৎসার সুযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ভৌত প্রণালীই মনোরোগ চিকিৎসায় প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে| সাইকোথেরাপিতেও বিভিন্ন তত্ত্বভিত্তিক সাইকোথেরাপি চালু হয়েছে| ফলে বর্তমানে মনোরোগ চিকিৎসা ফ্রয়েডতত্ত্বের স্থান প্রান্তীয়| এখনো সারগ্রাহী (eclectic) একাডেমিশিয়ানগণ মনে করেন ফ্রয়েডতত্ত্বের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি| কোন গবেষক তার তত্ত্ব রচনার ফ্রয়েডতত্ত্ব থেকে কোন অন্তর্দৃষ্টি পেতেও পারেন| কিন্তু তার তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে, তাকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে তত্ত্ব রচনা করতে হবে|

আমরা 'জীবনের রেখাচিত্রেই' দেখেছি, ফ্রয়েড প্রথম জীবনে বৈজ্ঞানিক ধারার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন| সুতরাং তার তত্ত্ব যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হয়ে উঠে নি, এটা তিনি জানতেন| তবু তিনি যে আমৃত্যু এ কাজে নিয়োজিত রইলেন, এর সমর্থনে তার যুক্তি "আমি মনে করি, সৃষ্টিশীল কল্পনা ছাড়া মনোবিজ্ঞানের মতো বিজ্ঞানের বিকাশ হতে পারে না| তাই আমি এইসব সৃষ্টিশীল কল্পনার খেলা খেলেছি, যাতে নিরন্তর গঠনমূলক সমালোচনার মধ্য দিয়ে আসল সত্যটা বেড়িয়ে আসে|" কিংবা, "মানসিক ক্ষেত্রটিকে জৈবিক ভিত্তিহীন বায়ুতে ভাসমান বিষয় হিসাবে রেখে দেয়ার কোন অভিপ্রায় আমার নেই| কিন্তু এ (জৈবিক ভিত্তি— বি.রা) সম্বন্ধে আমার এ বিশ্বাসটুকু ছাড়া কোন তত্ত্বীয় বা চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান নেই| কাজেই আমাকে এভাবে আগাতে হয়েছে, যেন আমার সামনে শুধু মানসিক ক্ষেত্রই রয়েছে|" ফ্রয়েডের সাফাইটি আংশিক সত্য| ফ্রয়েডের তত্ত্ব রচনার কালেই, পাভলভ মস্তিষ্কের উচ্চতর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তার গবেষণার ফল প্রকাশ করেছেন| ফ্রয়েড যে অচেতন মানসিক

প্রেষণাকেই মানুষের প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার পিছনে ক্রিয়াশীল জার্মান দর্শনের একটি ধারার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি| বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে যে তিনি তত্ত্ব রচনায় অগ্রসর হয়েছেন, তার পিছনেও একটি জার্মান ভাবাদর্শ ক্রিয়াশীল| সেটি Hermeneutic| সে ধারায় বলা হয়, কার্যকারণ সম্প র্ক না পাওয়া গেলে, সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তি দিয়ে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করতে হবে|

৪.৩ মূল্যায়ন : প্রয়োগ

রোগ চিকিৎসায় ফ্রয়েডতত্ত্বের প্রয়োগ এর মূল্যায়ন আমরা সাইকোথেরাপি এবং স্বপ্ন সমীক্ষণ অধ্যায়ে করেছি| মানসিক রোগীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে ফ্রয়েড তত্ত্ব রচনা করলেও, তার তত্ত্বকে তিনি প্রয়োগ করেছেন মানুষের প্রাত্যহিক আচরণ থেকে শুরু করে ধর্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রতিটি ক্ষেত্রেই| ব্যক্তিমনের কার্যপ্রণালি একবার ঠিক করার পর, তিনি শুধু এর মাধ্যমে সমস্ত মানবিক বিষয়াবলীকে ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন| চির অচেতনস্থিত অন্ধ প্রেষণাই ব্যক্তির চালিকাশক্তি, সমাজ ব্যক্তির বৈরী, অচেতন সচেতনের দ্বন্দ্ব উদ্‌গতির মাধ্যমেই সভ্যতার উদ্ভব-এই হচ্ছে তার প্রত্যয় কাঠামো|

রেখাচিত্রে 'যুদ্ধ কেন' প্রসঙ্গে আলোচনাতেই আমরা দেখেছি, যুদ্ধের পিছনে ব্যক্তির মনস্থিত এ দ্বন্দ্বের বাইরে, কোন কারণই তিনি দেখতে পান না| এভাবে ফ্রয়েড মানুষের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশাবাদী হতে পারেন না| কারণ মানুষের চালিকাশক্তি অচেতন প্রেষণা এবং সমাজের দ্বন্দ্ব সনাতন-অতীতে যেমন ছিল, ভবিষ্যতেও তেমন থাকবে| তার ফলশ্রুতিতে দুটি সম্ভাবনা প্রকট, হয় সমাজের চাপে ব্যক্তি নিউরোটিক হবে, নতুবা ব্যক্তির আগ্রাসী ভূমিকায় সমাজ লণ্ডভণ্ড হবে| একটিমাত্র ক্ষীণ আশার রেখা আছে, এ দ্বন্দ্বকে উদ্‌গতির মাধ্যমে সভ্যতা নির্মাণে বা রক্ষায় নিয়োজিত করা| কিন্তু এজন্য প্রয়োজন প্রতিটি ব্যক্তির মনোসমীক্ষণ| তা কি বাস্তবায়ন যোগ্য? ফ্রয়েডই স্বীকার করেছেন, এটি বাস্তবায়ন যোগ্য নয়| তিনি Civilization and Its Discontents বইয়ে লিখেছেন, "সামাজিক উদ্বায়ুতার প্রখরতম বিশ্লেষণ-ই বা কি কাজে লাগবে, যখন সমাজকে সে থেরাপি নিতে বাধ্য করতে পারে, এমন ক্ষমতা কারো নেই|" আর মনোসমীক্ষণও কি খুব কার্যকর দাওয়াই? ফ্রয়েডের গুরুত্বপূর্ণ শিষ্য এবং আন্তর্জাতিক সাইকোএনালাইটিক সমিতির এক সময়ের সভাপতি জোন্‌স (E. Jones) হতাশ কণ্ঠেই স্বীকার করেছেন, "পক্ষপাতহীন পর্যবেক্ষক এই বিচলিতকারী তথ্য দ্বারা আহত না হতে পারেন না যে, বুদ্ধির ব্যবহারের ক্ষেত্রে, মনোসমীক্ষক ও সমীক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে অসমীক্ষিত ব্যক্তিদের পার্থক্য বিস্ময়করভাবে নগণ্য|"

ফ্রয়েড যখন তার তত্ত্বকে মানবসমাজের ইতিহাস ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেন, তখনও তা হতাশাব্যঞ্জক| যদিও নৃতত্ত্ববিদগণ তাদের গবেষণায় ফ্রয়েড বর্ণিত এ ব্যাখ্যার সমর্থন পান না| নৃতত্ত্বে ফ্রয়েড তত্ত্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক মেলিনফ্স্কি

(Malinowski) মন্তব্য করেছেন, "ফ্রয়েড তার খুবই আকর্ষণীয় কিন্তু উৎকাল্পনিক তত্ত্বে, একটি আদিম নরগোষ্ঠীকে (ঊনবিংশ শতাব্দীর) ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের সব ধরনের প্রবণতা, অসমন্বয়তা এবং বদমেজাজে সাজিয়ে, প্রাগৈতিহাসিক জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছেন|" লিন্টন (Linton) মীড (Mead) প্রমুখ কৃষ্টিবাদী সাইকোএনালিস্টরা ফ্রয়েডের বহু মত খণ্ডন করেছেন| আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে গবেষণা করে অনেক মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন| কিন্তু তারা ফ্রয়েডীয় প্যারাডাইমটি ত্যাগ করতে পারেন নি| তাই তাদের গবেষণা সীমিত রয়েছে শিশুদের স্ত ন্যপান, স্তন্যপান ত্যাগ, মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস ইত্যাদি কয়েকটি সামাজিক ক্রিয়ার মধ্যে| এতে তাদের তথ্যের উপযোগিতা হ্রাস পেয়েছে, সামাজিক নৃতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বের কোন সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব গড়ে উঠে নি|

ফ্রয়েডের মতে সামাজিক সংহতির কারণ সমাজের সদস্যদের একে অপরের প্রতি একাত্মবোধ| সদস্যরা যে পরস্প রের প্রতি একাত্মবোধ করে তার কারণ, প্রত্যেকেই সমাজের একটি 'পিতৃ-চরিত্র'র প্রতি একাত্মবোধ করে| অর্থাৎ সামাজিক সংহতির মূলে রয়েছে একটি সর্বজন মান্য পিতৃ-চরিত্র| সামাজিক ঐক্য ও সামাজিক নেতৃত্বের মূলসূত্র এটি| ফ্রয়েড লক্ষ্য করেন, তার সমসাময়িক সমাজে ঐক্য বিধায়ক ও নেতৃত্বদানকারী এমন পিতৃ-চরিত্র নেই| এ সমাজের সদস্যরা শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে একাত্মবোধে সংগঠিত| ফ্রয়েড মনে করেন সমসাময়িক সমাজের অসন্তোষের অন্যতম কারণ এটি| একটি পিতৃ-চরিত্রর প্রয়োজনকামী তত্ত্বের ফল অচিরেই ফললো; তবে তত্ত্বরচয়িতার জন্য বুমেরাং হয়ে| পিতৃ-চরিত্র 'ফুয়েরার' হিটলারের উত্থান হল| এ পিতৃ-চরিত্রর মাধ্যমে সংগঠিত সমাজ ফ্রয়েডকে তার আজন্মের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করল, তার চার বোনকে হত্যা করল|

৪.৪ দার্শনিক বিচার

ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের অন্যতম পথিকৃৎ রেনে দেকার্ত (Rene Descartes)| তিনি বিশ্বকে দুভাগে ভাগ করেছেন, বস্তুর জগত এবং আত্মার জগত| বস্তুর জগতে যান্ত্রিকতার নিয়ম (mechanism), আর আত্মার জগতে 'অভিজ্ঞতা উর্দ্ধ যুক্তিবাদে'র (rationalism) নিয়ম কার্যকর| অভিজ্ঞতাউর্দ্ধ যুক্তিবাদ মনে করে, কোন বিষয়ে গূঢ় জ্ঞান আত্মায় বর্তমান রয়েছে| সজ্ঞা (intution) এর মাধ্যমে এ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব| এ জন্য কোন প্রাক্অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই| সজ্ঞালব্ধ জ্ঞান থেকে অবরোহী যুক্তি প্রয়োগ করে আমরা অন্য ব্যবহার্য জ্ঞানে পৌঁছাতে পারি| দেকার্তের বিশ্বাস, স্থানাঙ্কের ধারণাটি তার সজ্ঞালব্ধ| তিনি এ ধারণাটি থেকে অবরোহী যুক্তি প্রয়োগে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি রচনা করেছেন, যা অভিজ্ঞতার দুনিয়ায় কাজে লাগে| দেকার্তের মতে আত্মা শুধু মানুষেরই রয়েছে, মানুষের মনন ক্রিয়ায় তা প্রকাশিত| অন্য প্রাণিরা জটিলতর যন্ত্রমাত্র| মানুষেরও আত্মা ভিন্ন মস্তিষ্ক

সমেত শরীর প্রাণিদের মতোই যন্ত্রবৎ| তাই মানুষের মস্তিষ্কেও যান্ত্রিকতার নিয়ম কার্যকর| মস্তিষ্কের কর্মপ্রক্রিয়া হিসাবে পরাবর্ত (reflex) এর ধারণাও দেকার্তের উদ্ভাবন| তার মতে দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ ঘটে মস্তিষ্কস্থিত পিনিয়াল গ্রন্থিতে (pleal gland)| এভাবে দেকার্ত বস্তুর জগত সম্বন্ধে যান্ত্রিক বস্তুবাদ (mechanical materialism), আত্মা বা মনের জগত সম্বন্ধে ভাববাদ (idealism) এবং এ দুটি জগতকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি দিয়ে, দার্শনিক দ্বয়বাদ (dualism)- এ তিনটি দার্শনিক ধারা সমর্থন করেন| আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে নতুন আঙ্গিকে চালু করা এ ত্রিবেনী দেকার্তীয় দর্শন-ই আজ পর্যন্ত পুঁজিবাদী সমাজের প্রধান দর্শন|

এর সঙ্গে ফ্রয়েডের ধারণা মিলিয়ে দেখতে পারি| ফ্রয়েডও বাস্তবতাকে 'বস্তুগত বাস্তবতা' ও 'মানসিক বাস্তবতা' এ দুভাগে ভাগ করেছেন| তার মতে 'শারীরিক শক্তি' ইদ্ এ 'মানসিক শক্তিতে' রূপান্তরিত হয়| যদিও ফ্রয়েড দেকার্তের মতো মস্তিষ্কের কোন অঞ্চলকে নির্দেশ করেন নি, তিনি শক্তির রূপান্তরের কথা বলেছেন এবং মনের নিয়ম হিসাবেও বস্তুজগতের নিয়ম যান্ত্রিকতা (mechanism) কে ব্যবহার করেছেন| অর্থাৎ তিনি দ্বয়বাদী নন, অদ্বয়বাদী (monist)| কিন্তু তিনি বাস্তবের ধারণা এবং কল্পনাকে সমতুল্য বিবেচনা করেছেন, প্রতীক ও মিথ এর যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন| এভাবে প্রয়োগক্ষেত্রে মনের নিয়মটিকে বস্তুজগতের নিয়মের মতো বক্তা নিরপেক্ষ (objective) না রেখে বক্তা সাপেক্ষ (subjective) করে ফেলেছেন| ফলে তা দেকার্তের অভিজ্ঞতা উর্দ্ধ যুক্তিবাদের মতোই ভাববাদী রূপ নিয়েছে|

দার্শনিক বিবেচনার ফ্রয়েডতত্ত্ব জৈব নির্ধারণবাদী (biological deterministic)| এতে জন্মলব্ধ অচেতন জৈবিক প্রেষণাই মানুষের একমাত্র চালিকাশক্তি| সামাজিক শিক্ষা এতে পরিবর্তন আনতে পারে না| এটি একই সঙ্গে খণ্ডতাবাদী (reductionist) মানুষের বিচিত্র জটিল সামাজিক আচরণকে তা ব্যাখ্যা করেছে সমসত্ত্ব (homogeneous) দুটি জৈবিক প্রেষণা দিয়ে| মনের অধঃস্তর মস্তিষ্কের গড়নে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য রয়েছে| অর্থাৎ জন্মগতভাবে ব্যক্তিগণ অসমসত্ত্ব (heterogeneous)| সামাজিক শিক্ষায় ব্যক্তির মধ্যে নতুন গুণের উদ্ভব ঘটে| একাধিক ব্যক্তির সমাকলনে গঠিত সমষ্টি মন বা সমাজ মনস্তত্ত্বেও নতুন গুণের উদ্ভব ঘটে| ফ্রয়েডবাদে এ গুণগত পরিবর্তনের ধারণাটি অনুপস্থিত| যদিও ফ্রয়েড তত্ত্বে প্রকোষ্ঠভিত্তিক মনটির আধার যে মস্তিষ্ক তা ধরে নেয়া হয়েছে, কিন্তু এর সঙ্গে মস্তিষ্কের শারীরস্থানিক-শারীরবৃত্তিক সম্পর্ক কি তা বর্ণিত হয় নি| এটি অবলম্বনহীন, রহস্যময়| এভাবে তার তত্ত্বটি জৈব নির্ধারণবাদী হয়েও বস্তুসম্পর্কহীন ভাববাদী (idealist)|

ফ্রয়েডবাদ ইউরোপের চেয়ে আমেরিকায় বেশি প্রভাব বিস্তার করল কেন? এজন্য বিভিন্ন কারণ দায়ী| আমি দার্শনিক কারণটি বিবেচনা করব| আমেরিকায় ফ্রয়েডবাদ আমদানির আগেই প্রাতিষ্ঠানিক মনোবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে| শুরুতে তা ছিল

ডারউইন এবং ইউলিয়াম জেমস (William James) প্রভাবিত কার্যবাদী (functionalist) ধারায়| ক্রমে তা আচরণবাদী (beheviourist) ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে| আমেরিকাতে আচরণবাদ ও ফ্রয়েডবাদের প্রসার ঘটেছে সমতালে| দার্শনিক বিচারে এ দুটি ধারা পরস্পরের বিপরীত হয়েও পরস্পরের পরিপূরক| আচরণবাদ অতিমাত্রায় বিষয়নিষ্ঠ (objective)| তারা মনকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না বলে মন (mind) বা বিষয়ীকে (subject) কে আলোচ্যসূচি থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে| পক্ষান্তরে ফ্রয়েডবাদ অতিমাত্রায় বিষয়ীনিষ্ঠ (subjective)| এখানে মানসিক জগতকে বস্তুর জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে| এবং তা গবেষণা করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে বিষয়ীনিষ্ঠ অন্তর্দর্শন (introspection) পদ্ধতির|

আমাদের মানবিক জগত তো বিষয় (বস্তু) এবং বিষয়ীর (ব্যক্তির) দ্বান্দ্বিক ঐক্যেই অস্তিত্বমান| কাজেই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বস্তু কিংবা বস্তুকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি নিয়ে গবেষণা করা তো একপেশেমি| এই একপেশেমি কাটাতেই আমেরিকাতে আচরণবাদ ও ফ্রয়েডবাদ পরস্পরের পরিপূরক হয়েছে| বস্তু (বিষয়) ও ভাবের (বিষয়ীর) দ্বান্দ্বিক ঐক্যের প্রতিফলক কোন দর্শন ও পদ্ধতি সেখানে গড়ে উঠে নি| তাই গবেষকরা হয় যান্ত্রিক বস্তুবাদী (যেমন আচরণবাদী) কিংবা ভাববাদী (যেমন ফ্রয়েডবাদী) মডেল ব্যবহার করেন| প্রয়োগের প্রয়োজনে একাডেমিক বিশেষজ্ঞরা সারগ্রাহী পদ্ধতিতে দু'ধারার সারমর্ম নিয়ে টেক্সট বই রচনা করেন|

এভাবে আমেরিকার একাডেমিক মহলে যান্ত্রিক বস্তুবাদী বা ভাববাদী (উভয়ই একই সঙ্গে খণ্ডতাবাদীও বটে), এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সারগ্রাহী ভাবধারারই প্রাধান্য| কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাধান্যশীল দর্শন কার্যসিদ্ধিবাদ (pragmatism)| অর্থাৎ কোন মতবাদের সত্যতার মাপকাঠি, তা দিয়ে কার্যসিদ্ধি হয় কি না তা| তাই শাসকরা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেমন আচরণবাদী অপারেন্ট কন্ডিশনিং (operent conditioning) ব্যবহার করেন, তেমনি ব্যবহার করেন 'কামনার অবিচ্ছেদ্য কারাগারে বন্দী মানুষের অসহায়ত্বের' ফ্রয়েডীয় ধারণার| দীর্ঘকালই শাসকদের সহায়, ধর্মীয় নিয়তিবাদ| যা জনগণকে প্রচলিত ব্যবস্থা মেনে নিতে প্ররোচিত করে| বর্তমানে জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশে ধর্মের প্রভাব কমে আসায়, ধর্মীয় নিয়তিবাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে জৈব নির্ধারণবাদ|

কেন শুধু আমেরিকাতেই নয়, সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়াতেই যান্ত্রিক বস্তুবাদ, ভাববাদ, খণ্ডতাবাদ, সারগ্রহিতা, কার্যসিদ্ধিবাদ– এসব দার্শনিক ধারাগুলোর প্রাধান্য? এর উত্তর দর্শনে মিলবে না| এর উত্তর মিলবে সমাজে| উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গড়া, মুনাফাজীবী ও শ্রমজীবী এই দুই ভাগে গভীরভাবে বিভক্ত এ সমাজে, কোন ঐক্যবদ্ধ দর্শন

প্রাধান্যলাভ করতে পারে না| উপরে বর্ণিত আপাতবিরোধী এসব দার্শনিক ধারা একত্রে এ সমাজে স্থিতাবস্থা বজায় রাখে|

৪.৫ ফ্রয়েডবাদ জনপ্রিয় কেন?

ফ্রয়েডতত্ত্ব একাডেমিক মহলে স্বীকৃতি পাওয়ার আগেই সাধারণ্যে আলোড়ন তুলেছে| সে সময় প্রাতিষ্ঠানিক মনোবিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের কোন যোগ ছিল না| ফ্রয়েডই প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা- তা হোক রোগচিকিৎসা কিংবা ব্যক্তির আচরণের অনুধাবন-তার আলোচনায় নিয়ে আসেন| তার রচনা নীরস একাডেমিক নিবন্ধের মতো নয়; সরস সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ| এতে বৈজ্ঞানিকতার ঘাটতি থাকলেও সাহিত্যের ঘাটতি নেই| শিল্প, সাহিত্য, পুরাণ, প্রাত্যহিক দিনযাপন, এসবের অপূর্ব সংশ্লেষ ঘটেছে তার রচনায়| শুধু একাডেমিক মহল নয়, সকলের উদ্দেশ্যে প্রচারিত তার রচনায়, সে সময়ের প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জও ছিল| ফ্রয়েড যেসব মূল্যবোধের বিরোধিতা করেছিলেন (যেমন যৌনতা বিষয়ে অতিরিক্ত বাধানিষেধ), সেসব ছিল তৎকালীন ধর্মপ্রভাবিত সামন্তবাদী সংস্কৃতির অবশেষ| যদিও তার তত্ত্বেও এর কিছু চিহ্ন বর্তমান (যেমন পুরুষতান্ত্রিকতা)| তবু স্থিতাবস্থার সমর্থকরা এতে রুষ্ট হয়| ফ্রয়েড তত্ত্ব পরিবর্তনকামীদের প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়ে সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করে|

ফ্রয়েডবাদের সে বিপ্লবী পর্যায় বহু পূর্বেই অবসিত| একাডেমিক ও শাসক মহলে তার স্বীকৃতি জোটে গেছে অনেক আগেই| তবুও তা সাধারণ্যে জনপ্রিয় কি কারণে? প্রথমেই বলা দরকার, সাধারণ্যে মনোবিজ্ঞানের অন্য ধারাগুলো পরিচিত নয়| তাই অনেকের কাছে মনোবিজ্ঞান এবং ফ্রয়েডতত্ত্ব সমার্থক| অন্য একটি কারণ ফ্রয়েডবাদের সহজবোধ্যতা| রিপু (কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি) আমাদের তাড়না করে| বিবেক আমাদের সুপথে চলতে বলে| আমাকে বেছে নিতে হবে আমি কোন পথে যাব| এসবই আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সারৎসার| এর সঙ্গে ফ্রয়েডের ইদ্, সুপারইগো এবং ইগোকে মিলিয়ে দেখুন| আমাদের ধর্মীয় নিয়তিবাদের সঙ্গে ফ্রয়েডীয় জৈব-নির্ধারণবাদেরও সাদৃশ্য রয়েছে| ইগোর আত্মরক্ষা কৌশলগুলো আমরা একটু আত্ম-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সহজেই উপলব্ধি করতে পারি| ফ্রয়েডতত্ত্বের এসব উপকরণ সাক্ষাৎ বোধগম্য হয়ে গেলে, তার অচেতন মনের ক্রিয়াকলাপকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নিতে আপত্তি থাকে না| আমাদের মনের যে একটা অসচেতন দিক রয়েছে, তাও তো আমরা উপলব্ধি করি| এভাবে এ সমাজের মানুষ ফ্রয়েডতত্ত্বে যেন তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়| একবার ফ্রয়েডতত্ত্বের কাঠামোটা আয়ত্ব হয়ে গেলে, নিজেকে মনোবিদ ভাবতেও অসুবিধা হয় না| কারণ তখন মনে হয়, আমরা যে কোন মানবিক বিষয়কেই এর দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি| 'আত্মরক্ষা কৌশল' ও 'প্রতীক' এর যথেচ্ছ ব্যবহারের উদাহরণ তো ফ্রয়েডীয়রাই রেখে

গেছেন| তারপরও যা ব্যাখ্যা করা যায় না, তা অচেতনের ক্রিয়া বলে চালিয়ে দিলেই হলো|

এ 'সহজ-যান' এর বিকল্প পথটি কঠিন| এ জন্য মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের চর্চা আবশ্যক| এসব তত্ত্বের আলোকে কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করেই সন্তুষ্ট থাকা যায় না| দেখতে হয় তা বাস্তবের সঙ্গে মিলে কি না| কিন্তু সত্য সব সময়ই কঠিন| সাক্ষাৎ উপলব্ধি সত্যের নিশ্চয়তা দেয় না| সূর্য যে পূর্বে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়, এ সাক্ষাৎ উপলব্ধি আমাদের প্রতিদিনই হয়| তবু তা সত্য নয়| পৃথিবী যে নিজ অক্ষের চারপাশে ঘুরে, এটা কখনো উপলব্ধ না হলেও সত্য| একইভাবে অন্ত র্দর্শনের মাধ্যমে আমরা মনের যেসব বিষয় উপলব্ধি করি, তাও আংশিক সত্য মাত্র| যা অন্তর্দর্শনে উপলব্ধ হচ্ছে না, তা মনের অচেতনে এবং জানা যাবে না, এমন ভাবাও ঠিক নয়| বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে তাও জানা সম্ভব| মনোবিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থার খবর নিলে জানা যাবে আমরা এসব কতটুকু জানি|

সহজতার কারণ ছাড়াও সাধারণ্যে ফ্রয়েডবাদ টিকে থাকার আরো কারণ রয়েছে| স্থিতাবস্থার সমর্থকরা সব সময় প্রচার করেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অন্ধ অযৌক্তিক আবেগ চালিত জীব| কাজেই মানুষের পক্ষে পরিকল্পিত ন্যায়ানুগ সমাজ গড়া সম্ভব নয়| যারা প্রচলিত ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট, তারাও পরিবর্তনের দিশা কিংবা সাহস না পেয়ে, স্থিতাবস্থার সমর্থকদের প্রচারিত আপ্তবাক্যে আস্থা রেখে সান্ত্বনা খুঁজেন| শিল্প-সাহিত্য রচনা কিংবা সংস্কৃতি-সমালোচনায় (Cultural Criticism) ফ্রয়েডবাদের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে 'সহজযান' এবং 'সান্ত্বনা' তত্ত্ব আংশিক কার্যকর| ভাবাদর্শগত সংগ্রামের এ ক্ষেত্রগুলোতে শাসকশ্রেণির প্রতিনিধিরা ফ্রয়েডবাদকে সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেন|

৫. উপসংহার

ফ্রয়েড উদ্ভাবিত সাইকোথেরাপির কিছু প্রত্যয় ফ্রয়েডতত্ত্ব নিরপেক্ষভাবে সাইকোথেরাপিতে গৃহিত হয়েছে| তার সূত্রায়িত 'ইগো আত্মরক্ষা কৌশল'ও তার তত্ত্ব নিরপেক্ষভাবে মনোবিজ্ঞানে অঙ্গীকৃত| মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে ফ্রয়েডের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ| তিনি মনোবিজ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো সমস্যাকে সামনে নিয়ে আসেন; যেমন অচেতন প্রেষণা, স্বভাবী ও অস্বভাবী মানসিক ক্রিয়ার সম্প র্ক, মনের আত্মরক্ষা কৌশল, যৌনতার ভূমিকা, বয়স্কদের আচরণে শৈশবের মানসিক আঘাতের প্রভাব, ব্যক্তিত্বের জটিল গঠন এবং ব্যক্তির মানসিক কাঠামোর অভ্যন্তরস্থ দ্বন্দ্ব সংঘাত| কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি যে তত্ত্বপ্রস্তাব করেন, তাতে ধরে য়ো হয়েছে, মন সমাজ বিযুক্ত জৈব প্রকৃতির অধীন এবং চেতন ও অচেতন পরস্প রের প্রতিদ্বন্দ্বী (antagonistic)| এ দুটি ধারণাই বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়| তার তত্ত্বপ্রস্তাবে

ফ্রয়েড অসম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত একটি মানসিক নির্ণায়ক (factor), 'অচেতন জৈবিক প্রেষণা' কে ব্যক্তির জৈবিক ও সামাজিক উভয় জীবনের নির্ধারকের (determinant) ভূমিকায় বসিয়ে দিয়েছেন| মানব সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকেও সে নির্ণায়কের অধীন করে, ফ্রয়েড মানুষের প্রেষণা এবং মানব সমাজের ইতিহাস উভয়কেই রহস্যাবৃত করেছেন| এভাবে তার তত্ত্ব প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের সহায়ক হয়েছে|

পুরাণ, দর্শন, বিজ্ঞান-এ সবই সামাজিক চেতনার প্রকাশ| এ সবগুলিতেই বাস্তবতার এক ধরনের প্রতিফলন ঘটে| কিন্তু সত্যের মাপকাঠিতে সবই তুল্যমূল্য নয়| ফ্রয়েডের আকাঙ্ক্ষা মনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রচনা| কিন্তু যে পদ্ধতিতে তিনি তা রচনা করেছেন তা বৈজ্ঞানিক নয়| ফ্রয়েডতত্ত্বের বয়ানটিও পৌরাণিক| মনের বিভিন্ন কাজকে তিনি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন| তারপর এ তিন শ্রেণির কাজকে তিনি তিনটি চরিত্ররূপে কল্পনা করে, মনের গতিবিদ্যাকে এ তিন চরিত্রের নাটকরূপে উপস্থাপন করেছেন| অন্তরবস্তুর দিক দিয়ে এটি পুরাণ-আশ্রিত দর্শন| তাই মনোবিজ্ঞান বিকাশে ফ্রয়েডতত্ত্ব একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করলেও মনোবিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় তা কার্যকর তত্ত্ব নয়|

মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েডীয় ধারার বাইরেও অনেক ধারা রয়েছে| সেসবের পরিচয় মনোবিজ্ঞানের টেক্সট বইয়ে পাওয়া যায়| একটি ধারার উল্লেখ সেখানে নেই| সেটি 'দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদ' ভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের ধারা| সোভিয়েত ইউনিয়নে এর সূচনা ও বিকাশ হয়েছিল| বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে এ ধারায় মনোবিজ্ঞান চর্চা অব্যাহত রয়েছে| এ ধারার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্থানস্থল, ১. পাভলভ (I. P. Pavlov) এবং তার অনুসারীদের মনের অধঃস্তর মস্তিষ্কের, উচ্চতর কার্যকলাপ গবেষণার ধারা| এ ধারার একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি তেপলভ (B. M. Teplov)| পাশ্চাত্যের টেক্সট বইয়ের কল্যাণে পাভলভ ব্যবহারবাদী (behaviourist) বলে পরিচিত| এ ধারণা ভুল| ব্যবহারবাদীরা পাভলভ আবিস্কৃত সাপেক্ষ পরাবর্ত (conditioned reflex) কাজে লাগায় মাত্র| তারা পাভলভের সামগ্রিক গবেষণার ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত নয়| ২. ভাইগট্স্কি (L. S. Vygotsky) ও তার সহকর্মী লুরিয়া (A. P. Luria) এবং লিওনতিয়েভ (A. N. Leontyev) সূচিত শিশু বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারা| এ ধারার সক্রিয়তার তত্ত্ব (Cultural Historical Activity Theory) বর্তমানে ব্যাপকভাবে চর্চিত তত্ত্ব| ৩. মনের অসচেতন কাজ নিয়ে উজনাদ্জে (D. Uznadze) এবং তার অনুসারীদের স্কুল| উজনাদ্জে-র 'Set Theory' সর্বজনস্বীকৃত|

আশা করি যারা কৃত্রিম রহস্যে বুঁদ হয়ে না থেকে মনের সত্যিকার রহস্য উদ্ঘাটনে আগ্রহী, যারা মনোবিজ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে চান, তারা মনোবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ধারার সঙ্গে পরিচিত হবেন|

পরিশিষ্ট :

ইয়ুং (Jung), এডলার (Adler), ফ্রম (Fromm), লাকাঁ (Lacan) প্রমুখ মনোসমীক্ষণগণ ঘোষিত বা অঘোষিতভাবে ফ্রয়েড থেকে স্বতন্ত্র হয়ে তাদের তত্ত্ব রচনা করেছেন| যে মনোরোগ চিকিৎসার জন্য ফ্রয়েডবাদের জন্ম, সেখানে তার অবস্থান প্রান্তীয়| কিন্তু নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব, শিল্প-সংস্কৃতি-সমালোচনা এসব ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে ফ্রয়েডবাদ এখনো প্রভাবশালী| এ কথাটি উপরিউক্ত মনোসমীক্ষকদের প্রসঙ্গে ফ্রয়েড থেকেও বেশি সত্য| নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও পদ্ধতিগত ও দার্শনিক বিচারে উপরিউক্ত অফ্রয়েডীয়রা ফ্রয়েডবাদের বাইরে যেতে পারেন নি| আমার প্রকাশিতব্য 'অফ্রয়েডীয় ফ্রয়েডবাদীগণ' প্রবন্ধে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি|

তথ্যসূত্র :

1. Textbook of Psychology, Andrew B Crider et el, Scott, Foresman and Company, USA, 1983.
2. Sigmund Freud, An exhibition of Goethe Institute, Munich, 1972.
3. Theories of Personality, Hall and Lindzey, John Wiley & Sons, Inc. 1970.
4. Oxford Textbook of Psychiatry. 2nd Edition, Oxford University Press, 1989.
5. Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry, 10th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
6. Psychology In The Soviet Union, A. Petrovsky, Progress Publishers, 1990.
7. Christopher Caudwell, A Study in Bourgeois Psychology: Freud, In 'The Concept of Freedom', Lawrence & Wishart, London, 1965
8. পাভলভ পরিচিতি, ডা: ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পাভলভ ইন্সটিটিউট, কলকাতা, ২০০০|
9. ফ্রয়েড প্রসঙ্গে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৪|
10. সত্য তাই যা রচিবে তুমি, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, মানবমন ৪৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০৭|
11. ভাইগটস্কি পরিচয়, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, পাভলভ ইন্সটিটিউট, কলকাতা, ২০১২|
12. মনোবিদ্যার অভিধান, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, পাভলভ ইন্সটিটিউট, কলকাতা, ২০১১|

বিরঞ্জন রায় : পেশায় মনোরোগ চিকিৎসক| অধ্যয়নের বিষয় প্রকৃতি ও মানুষ এবং বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে তার প্রতিফলন| সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত| প্রকাশিত গ্রন্থ : *চেতনার বিজ্ঞান : সামাজিক চেতনার মনস্তত্ত্ব*, (২০১০, ন্যাশনাল পাবলিকেশন), ঢাকা|

বিজ্ঞানের আলোয় 'হোমিওপ্যাথি'

কাজী মাহবুব হাসান

"If homeopathy works, then obviously the less you use it, the stronger it gets. So the best way to apply homeopathy is to not use it at all"--Phil Plait

"The findings of currently available Cochrane reviews of studies of homeopathy do not show that homeopathic medicines have effects beyond placebo."--Edjard Ernst

প্রাক্‌কথন

২০০৯ সালের ২০ আগস্ট বিবিসি ওয়েব সাইটে প্রকাশিত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (ডঐঙ) একটি সতর্কবাণী দিয়ে লেখাটি শুরু করছি| বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এক ঘোষণায় জানিয়েছে : '*যক্ষা, এইচআইভি, ম্যালেরিয়ার, ইনফ্লুয়েঞ্জা, শিশুদের ডায়রিয়া মতো রোগগুলি হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে মোটেও নিরাময় হয় না| এইসব রোগ থেকে হোমিওপ্যাথির ওষুধগুলো লোকজনকে রক্ষা করতে পারে না, চিকিৎসা দিতে পারে না| কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মেডিকেল স্বাস্থ্যসেবার বদলে হোমিওপ্যাথির প্রসারের কারণে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জনজীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি অনেক বেড়ে গেছে|*' সংস্থাটির যক্ষা নিরাময় বিভাগের পরিচালক ড. মারিও রাভিগলিওনি (Dr. Mario Raviglione) বলেন, 'আমাদের সংস্থার যক্ষা চিকিৎসার আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্বীকৃত যে চিকিৎসাব্যবস্থা রয়েছে তাতে হোমিওপ্যাথির কোনো স্থান নেই|' শিশুরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে বিশ্বের অনেক দেশেই হোমিও-চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা রয়েছে| কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন বিভাগের মুখপাত্র বলেন, হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে শিশুদের ডায়রিয়া প্রতিরোধ বা নিরাময়ের কোনো প্রমাণ নেই| ইংল্যান্ডের রয়েল লিভারপুল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. নিক বিচিং বলেছেন, '*ম্যালেরিয়া, এইচআইভি, যক্ষা ইত্যাদির মতো সংক্রামক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির থেকে কোনো নৈর্ব্যক্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি| বরং এইসব রোগের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির ওষুধ ব্যবহারে রোগীর জীবন আরও মৃত্যু-ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়া|* (দ্রষ্টব্য : http://news.bbc.co.uk/2/hi/8211925.stm)|

চিকিৎসাসেবা নিয়ে যারা একটু খোঁজ খবর রাখেন, তারা সবাই জানেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হোমিওপ্যাথির বিজ্ঞাপনগুলোতে প্রতিনিয়ত দাবি করা হয় ক্যান্সার, ম্যালেরিয়া, যক্ষা, এইচআইভি, ডায়রিয়া ইত্যাদি মতো রোগগুলি অনায়াসে সারানো যায় হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে| শুধু তাই না বিভিন্ন ধরনের জটিল ও পুরাতন রোগের চিকিৎসাও নাকি করা যায় হোমিওপ্যাথি দিয়ে| বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতো একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সেবা সংস্থা হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতাকে

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে ‘প্রমাণহীণ’ এবং ‘অবৈজ্ঞানিক’ হিসাবে চিহ্নিত করে বাতিল করে দিয়েছে মূলধারার চিকিৎসাসেবা হিসাবে এর নানা অযৌক্তিক দাবিগুলোকে| কিন্তু এরপরও বিশ্বের প্রচুর লোক জেনে কিংবা না-জেনে প্রতিদিনই হোমিওপ্যাথির দ্বারস্থ হন এদের তথাকথিত চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য| এতে রোগ নিরাময় তো দূরের কথা, অর্থের যেমন অপচয় হচ্ছে শুধুশুধু, তেমনি রোগীর জীবনও ক্রমে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে|

হোমিওপ্যাথি নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার জন্য আজকের এই প্রবন্ধের সূত্রপাত| অনেকে হোমিওপ্যাথিকে ‘গুরত্বপূর্ণ’ রোগউপশমকারী ওষুধ-ব্যবস্থা মনে করলেও আদতে এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই| বরং এটি আসলে ছদ্মবিজ্ঞান বা সুডোসায়েন্সের অন্তর্ভুক্ত একটি পদ্ধতি, যা দীর্ঘদিন ধরে সহজে বিশ্বাসী মানুষকে বোকা বানিয়ে আসছে| হোমিওপ্যাথির মূলনীতি, এই সংক্রান্ত নানা গবেষণাগুলোর ফলাফল ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-পদ্ধতি বা প্যাটার্নের উপর আলোচনা বিস্তৃত হলে হোমিওপ্যাথির ‘ছদ্মবিজ্ঞানীয় চরিত্র’ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে|

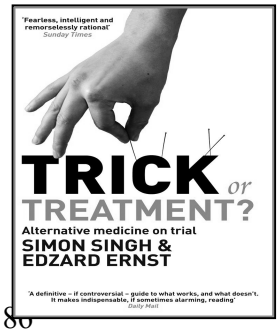

ইডজার্ড আর্নস্ট (Edzard Ernst)-এর বেশ কিছু গবেষণা-নিবন্ধের উপর ভিত্তি করে আমার এই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে, সে কারণে আর্নস্টের পরিচয় সম্বন্ধে অগ্রিম কিছু বলে রাখা প্রয়োজন বোধ করছি| জার্মান বংশোদ্ভূত ইডজার্ড আর্নস্ট হোমিওপ্যাথিসহ নানা বিকল্প চিকিৎসা-পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন মিউনিখের একটি হোমিওপ্যাথি হাসপাতালে| পরে ১৯৯৯ সালে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পি-মেন্টারি মেডিসিনে’র অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন (উল্লেখ্য এ বিষয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এটাই ছিল প্রথম কোন অধ্যাপকের পদ)| আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত দুইটি চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণা জার্নালের সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন তিনি| এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা ও লেখালেখির মাধ্যমে অল্টারনেটিভ ও কম্পি-মেন্টারি মেডিসিনের নানা দাবি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নির্ভর চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে ব্যবচ্ছেদ করে আসছেন| তার সমালোচনাপূর্ণ নানা গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশের পর থেকেই বিকল্প চিকিৎসার সমর্থকরা (বিশেষ করে হোমিওপ্যাথ ঘরনার লোকেরা) তাকে ‘বিকল্প চিকিৎসার জন্য অভিশাপ’ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন|

২০০৫ সালে অর্থনীতিবিদ ক্রিস্টফার স্মলউড ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য প্রিন্স চার্লস-এর ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে (‘স্মলউড রিপোর্ট’ নামে যা পরিচিত) ব্রিটিশ ন্যাশনাল হেল্‌থ সার্ভিসে হোমিওপ্যাথিসহ নানা বিকল্প চিকিৎসাকে যুক্ত করাকে ‘ব্যবসাশ্রয়ী’ হিসাবে মতামত দেন| এই রিপোর্ট তৈরির কাজের শুরুতে আর্নস্ট সহযোগী হিসাবে

থাকলেও পরবর্তীতে তিনি তার নাম প্রত্যাহার করে নেন খসড়া রিপোর্টটি পড়ার পর| তিনি দাবি করেন স্মলউড কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা গবেষণা নিবন্ধ পর্যালোচনা ছাড়াই বিশেষ কিছু বিকল্প চিকিৎসাকে সমর্থন করে গেছেন| তার এই অবস্থানের কথা তার স্বভাবসুলভ স্প ষ্টবাদিতায় পত্রিকাতে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন| কিন্তু চিঠিটি প্রকাশিত হলে আর্নস্টকে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়| প্রভাবশালীদের চাপে এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে একরকম বাধ্য করা হয় পদত্যাগের জন্য| তার গবেষণার সমস্ত অনুদানও প্রত্যাহার করে নেয়া হয়| অবশেষে ২০০৮ সালে তিনি সিমন সিংকে নিয়ে যৌথভাবে লেখেন বেশ আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি গবেষণা গ্রন্থ '*Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial*'| এই বইয়ে লেখকেরা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বছর ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড 'অপ্রমাণিত চিকিৎসা পদ্ধতি'তে অপব্যয় করার বিষয়টি নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তুলেন| বইটি আবার মজা করে উৎসর্গ করা হয়েছে প্রিন্স চার্লসকে, ব্রিটিশ রাজ পরিবারের মধ্যে হোমিও-চিকিৎসার প্রতি যিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত| হোমিওপ্যাথিসহ বিভিন্ন বিকল্প চিকিৎসার তথাকথিত অবাস্তব বিভ্রান্তিকর প্রতারণামূলক দাবিগুলোর প্রতি আর্নস্ট ও সিমনের নির্মোহ অনুসন্ধান ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত পর্যালোচনাগুলো নিঃসন্দেহে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহবাদীদের জানার ক্ষেত্রটি প্রসারিত করেছে অনেকটুকু| আর্নস্টের বই থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি এই অংশটি :

> "If homeopathy is correct, much of physics, chemistry, and pharmacology must be incorrect.... To have an open mind about homeopathy or similarly implausible forms of alternative medicine (eg, Bach flower remedies, spiritual healing, crystal therapy) is therefore not an option. We think that a belief in homeopathy exceeds the tolerance of an open mind."

যদি হোমিওপ্যাথি সঠিক হয়, তবে পদার্থবিদ্যা,রসায়ন এবং ওষুধ বিজ্ঞান এর প্রমাণিত অনেক কিছু তাহলে সঠিক নয়; হোমিওপ্যাথি কিংবা একই ধরনের অসম্ভব ধরনের কিছু বিকল্প-চিকিৎসা (যেমন, বাখ ফ্লাওয়ার রেমেডি, স্পি রিচ্যুয়াল হিলিং, ক্রিস্টাল থেরাপি) সম্বন্ধে খোলা মন রাখা সে কারণে সম্ভব নয়| আমরা মনে করি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস একটি খোলা মনের সহনযোগ্য সীমাকেও অতিক্রম করে|

ভূমিকা

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতির বাইরে তথাকথিত 'বিকল্প' বা 'অল্টারনেটিভ' নামধারী চিকিৎসাগুলোর মধ্যে একটা জনপ্রিয় স্থান দখল করে আছে হোমিওপ্যাথি| অবশ্য সময়ের হিসাবে চীন বা ভারতের সনাতন চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলো থেকে হোমিওপ্যাথি কিন্তু তুলনামূলক সাম্প্রতিক সময়ের একটি আবিষ্কার| প্রায় ২০০ বছরের একটু বেশি সময় ধরে হোমিওপ্যাথি বিস্তার লাভ করেছে সারা বিশ্বে| এছাড়া বর্তমান যুগে 'বিকল্প চিকিৎসা' সম্প র্কে গড়ে ওঠা নতুন কৌতূহলের সুফলও হোমিওপ্যাথিকে সুযোগ করে

দিয়েছে এর বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতিতে| হোমিওপ্যাথির 'নিরাময়'গুলো বা যাকে হোমিওপ্যাথরা ওষুধ হিসাবে দাবি করেন, সেগুলো সম্ভবত একমাত্র 'হাতুড়ে' বা 'কোয়াক' দ্রব্য যা আইনগতভাবে বহুদেশে 'ওষুধ' হিসাবে বিক্রয় হয়| এমন কী ওষুধ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের '*ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন* (FDA) হোমিওপ্যাথি 'নিরাময় দ্রব্যগুলি'কে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নানা কঠিন নিয়মকানুনগুলো শিথিল করে|

ভারতীয় উপমহাদেশে হোমিওপ্যাথির প্রচলন ঘটেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে, এক শতাব্দীরও কিছু সময় আগে| বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথির কথিত 'চিকিৎসকদের' সংখ্যা আসলে কত খুঁজে দেখার প্রচেষ্টায় ওয়েব সাইট ঘাটতে গিয়ে জানা গেল, আমাদের দেশে প্রায় ৪০টি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আছে, যার মধ্যে একটি সরকারি| সবগুলো হোমিওপ্যাথিক কলেজ নিয়ন্ত্রণ করছে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ও সার্জারির স্নাতক ডিগ্রিটি প্রদান করে থাকে| এছাড়াও হোমিওপ্যাথির উপর ডিপে-মা কোর্সও চালু রয়েছে এদেশে|

বাংলাদেশে দুই ধরনের হোমিওপ্যাথি 'চিকিৎসক' রয়েছেন, যারা ডিগ্রি প্রাপ্ত বা বলা হয় কোয়ালিফায়েড হোমিওপ্যাথ আর যাদের কোনো ডিগ্রি নেই বা আনকোয়ালিফায়েড, মানে স্বশিক্ষিত হোমিওপ্যাথ, আর সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বলছে দেশে এই ধরনের হোমিওপ্যাথ-চর্চাকারীর সংখ্যাই বেশি| গবেষণাগুলো থেকে আরো জানা যায়, বাংলাদেশে প্রতি ১০,০০০ মানুষের জন্য প্রায় ৬ জন হোমিওপ্যাথ 'চিকিৎসক' আছেন| গ্রামের তুলনায় শহরের হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের সংখ্যা বেশি (৭/১০,০০০)| বিশেষ করে খুলনা (প্রায় ৯/১০,০০০), রাজশাহী (প্রায় ৮/১০,০০০) এবং সিলেটের (৬/১০,০০০) শহরাঞ্চলগুলোয়| একটি হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত বাংলাদেশি ওয়েব সাইটের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মানুষ নাকি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকেন| যদিও বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার উপর পরিচালিত গবেষণাগুলোতে হোমিওপ্যাথি সাধারণত অন্যান্য প্রথাগত-চিকিৎসার সাথে শ্রেণীভুক্ত করে দেখিয়েছে| আসলে অ্যালোপ্যাথিক বা সেই সংক্রান্ত আংশিক-শিক্ষিত আর আধা-পেশাজীবীরাই আমাদের মূল চিকিৎসাসেবা প্রদান করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে| এবং বিষয়টি একই সাথে বাংলাদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশাল অপ্রতুলতার বিষয়টিও ইঙ্গিত করছে| আর্থ-সামাজিক অবস্থান যেখানে রোগের চিকিৎসা কিভাবে হবে তার একটি প্রধান নিয়ামক, সেখানে বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য 'বিকল্প চিকিৎসা' হিসেবে হোমিওপ্যাথিও অন্যতম ভূমিকা রাখছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই| এ কারণে হয়তো বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির ২৮তম কৌশলে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক

ও ইউনানি, এই তিনটি শাখাকে আরো 'বৈজ্ঞানিক' (যার মানে নীতিনির্ধারকরাই ভালো বলতে পারবেন!) করার উপর জোর দিয়ে পদ্ধতিগুলোকে জাতীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে|

কিছু সুনির্দিষ্ট কারণে 'বিজ্ঞানসম্মত' বলে দাবি করা চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলোর মধ্যে হোমিওপ্যাথি অন্যতম বিতর্কিত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি| হোমিওপ্যাথি নিয়ে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার সিস্টেম্যাটিক বা পদ্ধতিগত বিশ্লেষণে এখনও পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি রেমেডি বা চিকিৎসার কোন কার্যকারিতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে| নির্দিষ্টভাবে দেখা গেছে কোনো অসুখের চিকিৎসা হিসাবে হোমিওপ্যাথির ওষুধগুলো, মূলধারা চিকিৎসায় ব্যবহৃত পরীক্ষিত অন্য কোন ওষুধ এবং 'প্ল্যাসিবো' বা ওষুধকল্প থেকে কোনোভাবেই বেশি কার্যকর না| (প্ল্যাসিবো বা ওষুধকল্প আসলে কোনো ওষুধ বা ফার্মাকোলজির গুণাগুণ সম্প ন্ন কোন ড্রাগ নয়, বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা গবেষণা পরিচালনা করার সময় গবেষকরা র‍্যানডোমভাবে বা অনির্দিষ্টভাবে তুলনা করা সম্ভব এমন কয়েকটি গ্রম্নপ রোগীদের মধ্য থেকে নির্বাচন করে থাকেন, যেখানে এক দল রোগীদের দেয়া হয় প-্যাসিবো বা ওষুধকল্পটি দেয়া হয় পরীক্ষাধীন ওষুধের বিকল্প হিসাবে, উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা যে পরীক্ষাধীন ওষুধটি বিকল্প প-্যাসিবো বা ওষুধকল্প, প্রায়ই এ আসলে চিনি ছাড়া কিছু নয়| গবেষণায় যাতে মানসিক প্রতিক্রিয়াপ্রাপ্ত ফলাফলকে প্রভাবিত না করতে পারে, সেজন্য রোগীদেরকে অবশ্যই এবং কখনো কখনো গবেষকদেরও যা জানানো হয় না কাকে কোন ওষুধটি দেয়া হচ্ছে, যেমন ডাবল ব্লাইন্ড স্টাডি)|

প্রকাশিত সব গবেষণার মেটাঅ্যানালাইসিস থেকে দেখা যাচ্ছে, কোনো প্রস্তাবিত হোমিও ওষুধই প্ল্যাসিবো বা ওষুধকল্প থেকে রোগীর শরীরে সুস্প ষ্ট বা ভিন্ন কোনো ক্লিনিক্যাল ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে না, যা কিনা প্রমাণ করা সম্ভব| যেমন আমরা এখানে ২০০৩ সালে মেডিকেল জার্নাল *Thorax*-এ প্রকাশিত একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করতে পারি| হোমিও-ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে ৯৩ জন অ্যাজমায় আক্রান্ত শিশুর উপর ইংল্যান্ডের পেনিনসুলা মেডিকেল স্কুলের ড. অ্যাড্রিয়ান হোয়াইট একটি গবেষণা করেন| ড. হোয়াইটের গবেষণার ফলাফল হচ্ছে একমাত্র গভীরভাবে বিশ্বাসনির্ভর (অন্যার্থে প্ল্যাসিবো) ক্রিয়া ছাড়া সেখানে হোমিও-ওষুধের আর কোনো ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় নি| কিন্তু দুঃখজনক খবর হচ্ছে ইংল্যান্ডের মতো উন্নত দেশেও শিশুরা অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হলে হোমিওপ্যাথ নিরাময় গ্রহণ করার প্রবণতা খুব বেশি| যেমন একটি গবেষণা বলছে সে দেশে প্রায় ১৫% শিশু-কিশোর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পেয়ে থাকে| ড. হোয়াইট গবেষণার জন্য তীব্র অ্যাজমায় আক্রান্ত থেকে শুরু করে হালকা অ্যাজমা আক্রান্ত ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী ৯৩ জন

শিশুকে বেছে নেন| তাদেরকে একাধিক দলে ভাগ করা হয়| একটি দলকে ইনহেলারসহ চিকিৎসার প্রচলিত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়| আরেকটি দলকে এক বছর ধরে ছয় কিস্তিতে হোমিও রেমেডি প্রদান করা হয়| সর্বশেষ দলটিকে হোমিও-ওষুধের বদলে প্ল্যাসিবো (চিনির ট্যাবলেট) প্রদান করা হয়| টানা এক বছর ধরে এই কার্যক্রম চললেও দেখা গেছে হোমিও-ওষুধের কোনো ভূমিকা নেই অ্যাজমা উপশমের ক্ষেত্রে| বরং যেসব শিশু স্বাভাবিক চিকিৎসার বদলে হোমিও রেমেডি গ্রহণ করেছিল তারা আরো প্রবলভাবে অ্যাজমায় আক্রান্ত হয়েছে| (দ্রষ্টব্য : http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/2903029.stm)|

অথচ যদি আপনি সাধারণ রোগীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শোনেন, তাহলে সন্দেহ নেই বিশাল সংখ্যক মানুষ অত্যন্ত

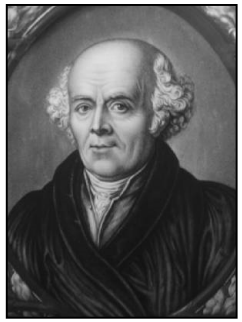

'নিশ্চয়তা'র সাথে দাবি করবেন, তারা প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়ে যখন উপকৃত হন নি, তখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় হয় সুস্থ হয়েছেন, নয়তো উপকার পেয়েছেন| এবার স্বভাবত প্রশ্ন জাগতে পারে মনে| তাহলে হোমিওপ্যাথি কি আসলেই কাজ করে?

এই প্রশ্নটিতে আবার ফিরে আসা যাবে তবে তার আগে একটা বিষয় জেনে নেয়া ভালো এই যে 'উপকারী' বলে দাবি করা চিকিৎসা-পদ্ধতিটা আসলে কি?

হোমিওপ্যাথির উদ্ভব ও স্যামুয়েল হ্যানিম্যান :

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছিলেন জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান (Christian Friedrich Samuel Hahnemann)| ১৭৫৫ সালে জন্ম হ্যানিম্যান তার শৈশব কাটিয়েছেন জার্মানির মেইসেন শহরে| এরপর প্রথমে লাইপজিগ এরপর ভিয়েনা হয়ে ১৭৭৯ সালে এরলাঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন| চিকিৎসক হিসাবে পেশাগত জীবনের প্রথম ১৫ বছর অর্থনৈতিকভাবে বেশ লড়াই করতে হয়েছিল হ্যানিম্যানকে, অবশ্য পরবর্তী জীবনে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে| ১৮৪৩ সালে ৮৮ বছর বয়সে প্যারিসে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন

হ্যানিম্যানের সমসাময়িক চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলো ছিল শরীরের নানা হিউমর বা তরল পদার্থের (Humor-ল্যাটিন শব্দটির অর্থ 'তরল') ভারসাম্য রক্ষা করার মাধ্যমে নানা অসুখের নিরাময় করা| ভারসাম্য বা তথাকথিত সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্য বেশ কিছু স্থূল কৌশল প্রয়োগ করা হতো সেসময়| যেমন শিরা কেটে নিয়ন্ত্রিতভাবে রক্তপাত ঘটানো (Venesection ev blood letting), রক্তশোষক জোঁক (যেমন *Hirudo medicinalis*) ব্যবহার (leeching), গরম ক্যাপ ব্যবহার করে চামড়ায় ফোসকা সৃষ্টি করা (Blistering)

কিংবা খুব বিষাক্ত ওষুধ (যাদের মধ্যে প্রায়ই পারদ থাকতো) দিয়ে চিকিৎসা করা ইত্যাদি| এগুলো ব্যবহার করে রোগীর শরীরে অতিরিক্ত ঘাম, মুখের অত্যাধিক লালা সৃষ্টি করা বা জোরপূর্বক বমি করানো, ডায়রিয়ার (purging) উদ্রেক করা, ইত্যাদি ছিল মূল উদ্দেশ্য| চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত এইসব কলাকৌশল আসলে রোগীদের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করতো|

হ্যানিম্যান তার পেশাগত জীবনে শুরুতে লক্ষ্য করেছিলেন রোগীদের আসলে এ ধরনের কোন ভয়ঙ্কর চিকিৎসা দেবার চাইতে না-দিলে প্রায়ই ভালো ফলাফল পাওয়া যায়| কিছুটা সে কারণে ৩৫ বছর বয়সে হ্যানিম্যান প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে চিকিৎসা পেশা ত্যাগ করেন| সংসার চালানোর জন্য বেছে নেন নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ প্রস্তুত ও অনুবাদ করা| বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন হ্যানিম্যান| কথিত আছে ১৭৯০ সালে বিখ্যাত স্কটিশ চিকিৎসক উইলিয়াম কালেনের একটি ভেষজ চিকিৎসার বই ইংরেজি থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করার সময় কালেনের একটি মন্তব্য তার নজরে পড়েছিল| কালেন বলেছিলেন সিনকোনা (Cinchona) গাছের (*China officalis*) বাকল থেকে প্রস্তুত দ্রবণটি ম্যালেরিয়া নিরাময় করতে পারে কারণটি এর 'তিক্ততা'| পরবর্তীতে আমরা জেনেছি সিনকোনা গাছের বাকলে আসলে অ্যালকালয়েড থাকে যার মূল উপাদান হচ্ছে কুইনিন| ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় কুইনিনের এখনও প্রচলন আছে| হ্যানিম্যানের কাছে ব্যাপারটা প্রথমে অযৌক্তিক মনে হয়, কারণ অন্য কোন তিক্ত স্বাদযুক্ত কিছু তো সেভাবে ম্যালেরিয়া নিরাময় করতে পারছে না| কৌতূহল বশেই হ্যানিম্যান নিজে বেশ কয়েক ডোজ সিনকোনা গ্রহণ করেন| উদ্দেশ্য সুস্থ শরীরে এটি কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা লক্ষ্য করা| তিনি দেখলেন সুস্থ শরীরে সিনকোনা ঠিক ম্যালেরিয়ার মতই রোগ-লক্ষণ সৃষ্টি করে| তবে মূল ম্যালেরিয়া রোগ থেকে যা বেশ কিছুটা মৃদু; সেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসার ব্যাপারটা সেখানে ঘটছে না| আর হ্যানিম্যান ঠিক এখান থেকে তার বিখ্যাত ধারণাটি পেয়ে যান|

হ্যানিম্যান দাবি করেন সিনকোনা ম্যালেরিয়া নিরাময়ে কার্যকর তার কারণ হচ্ছে এটি যে রোগ নিরাময় করছে ঠিক সেই রোগের মতই এটি সুস্থ শরীরে উপসর্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম| উৎসাহিত হ্যানিম্যান এরপর ধীরে ধীরে আরো বেশ কিছু প্রচলিত ওষুধ এবং রাসায়নিক পদার্থ একইভাবে নিজের উপর পরীক্ষা করে দেখেন| সুস্থ শরীরে তাদের প্রভাব লক্ষ্য করেন, কী ধরনের উপসর্গ তৈরি করছে, এবং একই ধরনের উপসর্গযুক্ত রোগের নিরাময়ে তারা কতটুকু কার্যকরী| নিজের সাফল্যে আত্মবিশ্বাসী হয়ে তিনি তার Laws of Similar বা সদৃশ্যতার সূত্রটি প্রণয়ন করেন তার প্রস্তাবিত রোগ-নিরাময় পদ্ধতির জন্য সাধারণ একটি মূলনীতি হিসাবে| সেই ধারণাটি ১৭৯৬ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'Essay on a New Principle for Ascertaining the Curative Power of Drugs' শীর্ষক একটি নিবন্ধে| এখানে তিনি তার প্রস্তাবিত চিকিৎসা-

পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা দেন| তিনি যার নামকরণ করেন 'Homeopathy' (হোমিওপ্যাথি)|

মূলধারার চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে হোমিওপ্যাথির প্রথম মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে-এটি এমন একটা চিকিৎসা-পদ্ধতি, যেখানে দাবি করা হয় কোনো অসুখের জন্য সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা হবে সেই ওষুধটি, যা কিনা কোন সুস্থ মানুষের শরীরে প্রয়োগ করলে সেই রোগের মত একই ধরনের কিছু মৃদু উপসর্গ সৃষ্টি করে| সেজন্য হ্যানিম্যানের নামকরণ করেছিলেন হোমিওপ্যাথি (Homeopathy)| হোমিওপ্যাথি শব্দটার উৎস দুটি গ্রিক শব্দ, 'Hómoios' যার অর্থ সদৃশ বা একই রকম বা like এবং 'páthos' যার অর্থ কষ্ট বা অসুখ বা Suffering| এখানে বলে রাখা ভালো 'অ্যালোপ্যাথি' (Allopathy) প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতির আরেকটি নাম, সেটিও কিন্তু হ্যানিম্যানেরই দেয়া| ১৮১০ সালে প্রকাশিত হয় তার সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা '*The Organon of The Healing Art*', যে বইটি এখনো হোমিওপ্যাথি শিক্ষার মূল ভিত্তি| ওই সময়ের প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতি যেমন নিয়ন্ত্রিত রক্তপাত ঘটানো, জোঁক দিয়ে রক্ত শোষণ করানো ইত্যাদির চেয়ে রোগীবান্ধব নিরাপদ পদ্ধতি হিসাবে হোমিওপ্যাথি আকর্ষণ করেছিল বহু চিকিৎসককে| ১৭৯৭ সালে চিকিৎসা পেশায় আবার ফিরে আসেন হ্যানিম্যান| তবে একজন হোমিওপ্যাথ হিসাবে|

হোমিওপ্যাথির মূলনীতিগুলোর একটু বিস্তারিক ব্যাখ্যা দেয়া যাক|

সাদৃশ্যতার সূত্র বা **The law or Principle of Similarity** ev **like cures like :** আগের অনুচ্ছেদে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে হ্যানিম্যান বিশ্বাস করতেন কোনো একটি রোগীর রোগ সারানো যাবে এমন কোন ওষুধ দিয়ে, যা কোন সুস্থ মানুষ সেবন (ওষুধ) একই অসুখের মতই মৃদু অসুস্থতার কারণ হবে| যেমন যদি কোনো রোগীর অসুখটি হয় তীব্র বমি বমি ভাব, তাকে এমন একটি ওষুধ দেয়া হবে যা কোনো সুস্থ মানুষ সেবন করলে মৃদু বমি বমি ভাব হবে| এছাড়া আর্সেনিক সুস্থ মানুষের শ্বাসকষ্ট তৈরি করতে পারে| এজন্য শ্বাসকষ্টের চিকিৎসার জন্য আর্সেনিক ব্যবহার করা যেতে পারে| হ্যানিম্যান এভাবে একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেছিলেন বিভিন্ন ধরনের পদার্থ ব্যবহার করে, যা তিনি নানা অসুখের কার্যকরী চিকিৎসা হিসাবে দাবি করেছিলেন| তার প্রস্তাবনা অনুযায়ী রোগীর অসুখের উপসর্গের সাথে কোন ওষুধের সৃষ্ট উপসর্গ মিলিয়ে চিকিৎসার জন্য কার্যকরী ওষুধ দিতে হবে| এভাবে জন্ম হয়েছিল হোমিওপ্যাথি'র বিখ্যাত প্রবচন 'Like cures like' বা পরিচিত 'law' বা 'Principle of Similarity'| তিনি উদাহরণ হিসেবে এডওয়ার্ড জেনারের গরুর বসন্ত (কাউ পক্স) ব্যবহার করে গুটি বসন্তের চিকিৎসার কথা বলেছিলেন| কিন্তু হ্যানিম্যানের সে-সময় রোগজীবাণু কিংবা আমাদের রোগপ্রতিরোধ তন্ত্র সংক্রান্ত কোনো ধারণা থাকার কথা না|

হ্যানিম্যানের মতে, 'শরীরের নিজস্ব নিরাময় শক্তির কোনো অস্থিতিশীলতাকেই আসলে প্রতিনিধিত্ব করছে কোনো না কোন একটি অসুখ এবং নিরাময়ের জন্য সামান্য একটি স্টিমুলাস বা প্রণোদনার প্রয়োজন এই নিজস্ব নিরাময় শক্তির প্রক্রিয়াটি শুরু করার জন্য|' পরবর্তীতে তিনি নানা ধরনের 'ওষুধ' (বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, খনিজ, ভেষজ পদার্থ) তৈরি করে সুস্থ স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে তাদের শরীরে এই ওষুধগুলো কি ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি করে তা নথিভুক্ত করেছিলেন| ওই প্রক্রিয়াকে তিনি বলতেন 'Proving' (মূল জার্মান শব্দ 'Prüfung', ইংরেজিতে হচ্ছে test), আধুনিক হোমিওপ্যাথরা একে বলেন 'Human pathogenic trial'| হোমিওপ্যাথিতে 'Proving' হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে হোমিও-ওষুধের প্রোফাইল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে| এই প্রক্রিয়ায় একজন সুস্থ মানুষ কোনো একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষাধীন পদার্থের খুব সামান্য পরিমাণ সেবন করেন| তারপর এই পদার্থটির কারণে সৃষ্ট সকল উপসর্গ ও শারীরিক-মানসিক সকল প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়| এভাবে হ্যানিম্যান ও তার অনুসারীরা কোন অসুখের জন্য কোন চিকিৎসা 'ভালো' কাজ করবে তা প্রমাণ করেছেন বলে দাবি করেন| হ্যানিম্যান ও তার অনুসারীরা এভাবে প্রায় একশত'র উপর নানা পদার্থ নিজেদের উপর পরীক্ষা করেছিলেন| যদিও এভাবে কোনো ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা আসলেই ব্যাখ্যাতীত এবং সে কারণে এটি তর্কের ঊর্ধ্বে না| এরপর হ্যানিম্যান চেষ্টা করেন অসুস্থ রোগীদের উপসর্গের সাথে এসব ওষুধের সৃষ্ট উপসর্গগুলো মিলিয়ে সেই অসুখের চিকিৎসা-ব্যবস্থা তৈরি করা| এভাবে proving-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা অভিজ্ঞতাগুলো দিয়ে হ্যানিম্যান পরবর্তীতে '*ম্যাটেরিয়া মেডিকা*' বা '*হোমিও ফার্মাকোপিয়া*'র ভিত্তি রচনা করেছিলেন|

হোমিও ফার্মাকোপিয়া'র তালিকাভুক্ত ওষুধগুলো কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয় নি| এটি করা হয়েছে তথাকথিত 'প্রুভিং'-এর মাধ্যমে, এবং বেশিরভাগই সম্পাদিত হয়েছে এক শতাব্দীর বেশি সময় আগে| স্পষ্টত এই প্রুভিং প্রক্রিয়াগুলো কোনো আদর্শ বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে করা হয় নি| প্রক্রিয়াগতভাবে দুটি একই পদার্থের প্রুভিং প্রক্রিয়ারও পারস্পরিক মিলও তেমন ছিল না প্রায় সবক্ষেত্রে| কারণ একজন হোমিওপ্যাথ থেকে অন্য হোমিওপ্যাথের করা প্রুভিংগুলোর মধ্যে পার্থক্য ছিল; যেমন ডোজের পার্থক্য, কতদিন ধরে তা খাওয়া হয়েছে তার পার্থক্য এবং পদার্থটির ঘনত্বের নানা তারতম্য তো ছিলই| হোমিও ফার্মাকোপিয়া বইটির সাম্প্রতিক সংস্করণে এক হাজারের বেশি এ ধরনের প্রুভিংয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত ওষুধের বিবরণ আছে| ঠিক কোন অসুখ বা উপসর্গের জন্য কোন ওষুধটি ব্যবহার করতে হবে সেটা সেখানে কিন্তু লেখা নেই| এটা নির্ভর করে হোমিও-চিকিৎসক বা ওষুধ প্রস্তুতকারকের উপর| সুতরাং হোমিওপ্যাথির ওষুধ নামের বড়ি, গুড়া বা তরল

পদার্থগুলোকে ‘ওষুধ’ বলে দাবি করা হলেও আদতে এদের ‘ওষুধ’ বলে স্বীকৃতি দেবার কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই|

মিয়াজমা :

১৮২৮ সালে হ্যানিম্যান ‘মিয়াজম’ (Miasm বা Miasma) ধারণাটি প্রস্তাব করেন অনেক পরিচিত রোগের মূল কারণ হিসাবে| এই শব্দের উৎপত্তি গ্রিক ভাষা থেকে, যার অর্থ দূষণ বা দূষিত করা| হোমিওপ্যাথিতে মিয়াজমা হচ্ছে আমাদের মূল প্রাণ শক্তি বা Vital force-এর অসুস্থতার কারণ| হ্যানিম্যান নির্দিষ্ট অসুখের সাথে মিয়াজমের কারণ যুক্ত করেন, এবং একই মিয়াজমকে চিহ্নিত করেন নানা রোগের কারণ হিসাবে| হ্যানিম্যানের মতে প্রায় সকল দীর্ঘমেয়াদী অসুখের কারণ হচ্ছে মিয়াজমা| তার মতে প্রথম যখন মিয়াজমার মুখোমুখি হয় আমাদের শরীর এটি স্থানীয় উপসর্গ যেমন চর্মরোগ, যৌনরোগ সৃষ্টি করে| এই উপসর্গগুলো যদি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় চেপে রাখার জন্য, যেমনটা প্রচলিত চিকিৎসায় করা হয়, তবে তা ব্যর্থ হবে| কারণ এটি টিকে থাকবে শরীরের গভীরে, দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা হিসাবে| সেই গভীর অসুখটাকে আগে চিকিৎসা করতে হবে, আমাদের ভাইটাল ফোর্সকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে| প্রাথমিকভাবে হ্যানিম্যান তিনটি মিয়াজমার কথা বলেছিলেন| যার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হলো ‘চংড়ৎধ’ বা সোরা (গ্রিক শব্দ, যার অর্থ চুলকানি)| একে অনেক রোগের কারণ বলে হ্যানিম্যান বিশ্বাস করতেন| যেমন মৃগীরোগ, ক্যান্সার, জন্ডিস ইত্যাদি|

হ্যানিম্যানের উত্তরসূরিরা পরবর্তীতে আরো বিভিন্ন ধরনের ‘মিয়াজমা’র প্রস্তাব করেছেন, এমন কী যখন রোগ সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে সমসাময়িক চিকিৎসাবিজ্ঞান বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল তখনও| হ্যানিম্যান প্রবর্তিত চিকিৎসা-পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে কারো কারো কাছে ‘আধুনিক’ মনে হতে পারে, যেমন রোগী অনুযায়ী নাকি রোগের জন্য সঠিক ওষুধটি খুঁজে বের করে চিকিৎসা দেয়া হয় হোমিওপ্যাথিতে| কিন্তু শুভঙ্করের ফাঁকি হচ্ছে, হ্যানিম্যান প্রবর্তিত হোমিও চিকিৎসা-পদ্ধতি হচ্ছে উপসর্গগুলোর (রোগ-লক্ষণ) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চিকিৎসা করার একটি চেষ্টা, কিন্তু যে মূল অসুখের কারণে উপসর্গগুলো সৃষ্টি (মানে রোগ-লক্ষণ তৈরি হচ্ছে শরীরে) হচ্ছে সে অনুযায়ী চিকিৎসা দেয়া হয় না| এই বিষয়টি আজকের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতির সাথে হোমিওপ্যাথির একটা বড় পার্থক্য| একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে| যেমন কোনো ধরনের ভাইরাস বা জীবাণুর আক্রমণে আমাদের দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ-লক্ষণ দেখা দিতে পারে| জ্বর হওয়া, পেট ব্যাথা, বমি বমি ভাব, কিংবা শরীরে অ্যালার্জিসহ যন্ত্রণা, ইত্যাদি| এখন এইসব রোগ-লক্ষণকে আলাদা আলাদা বিবেচনা করে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা চালালে সঠিক ফল পাওয়া যাবে না| যদি-না রোগীকে ভালোভাবে ডায়াগোনসিস করে ওই ক্ষতিকারক জীবাণু চিহ্নিত করে তার প্রতিষেধক শরীরে দেয়া হয়|

আসলে হোমিওপ্যাথিতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'জীবাণু-তত্ত্ব' (জার্ম থিওরি) বলে কিছু নেই|

ক্ষুদ্রতম মাত্রা ও অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা :

প্রথম দিকে হ্যানিম্যান প্রুভিং করার সময় প্রচলিত ওষুধের অল্পমাত্রার ডোজ সেবন করলেও পরবর্তীতে সেইসব পদার্থ অতিমাত্রায় তরলীকরণ করে লঘু ঘনত্বের বা হালকা দ্রবণ তৈরি করা শুরু করেছিলেন| তার এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে তিনি দাবি করেন, 'যত বেশি হালকা ঘনত্বের তরল হবে বা দ্রবণে দ্রবীভূত সেই দ্রবটির (হোমিওপ্যাথদের ওষুধ) পরিমাণ যত কম হবে এতে নাকি ওষুধের কার্যকরী প্রভাব তত বেশি শক্তিশালী হবে|' এটি হ্যানিম্যানের আরেকটি প্রস্তাবনা, যা হোমিওপ্যাথির গুরত্বপূর্ণ আরেকটি মূলনীতি| প্রস্তাবনাটি 'Law of infintsimal' হিসাবে পরিচিত| বলা নিষ্প্রয়োজন, হোমিওপ্যাথির বিস্ময়কর এই সূত্রটি বা হ্যানিম্যানের এই প্রস্তাবনাটি এ যাবৎকালে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত আধুনিক বিজ্ঞান কিংবা ফার্মাকোলজি'র প্রতিষ্ঠিত 'ডোজ রেসপন্স' (ওষুধের মাত্রা ও এর প্রভাব) সম্পর্কের একেবারেই বিপরীত| এবং সঙ্গত কারণেই এই অবৈজ্ঞানিক নীতিটি হোমিওপ্যাথির সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় যা এখনও হোমিওপ্যাথরা ব্যাখ্যা করতে পারেন নি|

হোমিওপ্যাথির 'Law of infintsimal' সূত্রানুযায়ী 'প্রস্তাবিত হোমিও-ওষুধ হিসাবে চিহ্নিত কোন সক্রিয় উপাদান দ্রবণের সাথে যুক্ত করার পর দ্রবণটিকে ধারাবাহিকভাবে যতই লঘুকরণ বা হালকা করা হোক না কেন (সাধারণত ১ঃ১০ বা ১ঃ১০০ দ্রাব্য ও দ্রবের অনুপাত করা হয় ধারাবাহিকভাবে), দ্রবীভূত উপাদানটি তার কর্মক্ষমতা হারাবে না|' এই অদ্ভুত দাবির স্বপক্ষে হ্যানিম্যান অবশ্য কোনো প্রমাণ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি| তার নিজের 'বিশ্বাস'ই এক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করেছিলেন| সুস্পষ্টভাবে যদিও হ্যানিম্যান প্রথম এই কাজটি শুরু করেছিলেন প্রুভিং প্রক্রিয়ার সময় বিভিন্ন বস্তুর বিষাক্ততা বা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হ্রাস করার জন্য তবে পরে তিনি এর স্বপক্ষে দাবি করেন এটা আসলে একধরনের পোটেনাইজেশন (Potenization) প্রক্রিয়া যা উপাদানটির মূল সত্তা বা স্পিরিট বা প্রাণশক্তিকে বের করে আনে দ্রবণের মধ্যে| হ্যানিম্যানের এই ধারণা চরম অবৈজ্ঞানিক প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তার অনুরাগী-অনুসারীরা বিজ্ঞানের সব ধরনের মূলনীতিকে উপেক্ষা করে এখনো প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন| হ্যানিম্যানের জীবনের শেষের দিকে মলিকুলার ডাইলুশন বা আণবিক লঘুকরণের সীমা নির্দেশকারী অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা আবিষ্কার হয়| কিন্তু ততদিনে পৃথিবীব্যাপী হোমিওপ্যাথরা দাবি করে এসেছেন 'অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা অপেক্ষাও কম তরলীকরণে সৃষ্ট হোমিও-ওষুধ নাকি কর্মক্ষমতা হারায় না|' এই একটি অবাস্তব দাবির ফলেই হোমিওপ্যাথি ও

তার কার্যকারিতা নিয়ে যে কোনো বিজ্ঞানমনস্ক-যুক্তিবাদী মানুষের মনে মারাত্মক সন্দেহ-সংশয়ের জন্ম নিতে পারে| হোমিওপ্যাথিকে অলীক-বিভ্রান্তিকর হিসেবে প্রত্যাখান করার জন্য এই একটি বক্তব্যই যথেষ্ট|

হোমিওপ্যাথির রেমেডিগুলো সাধারণত তৈরি করা হয় খনিজ-ভেষজ বা অন্যান্য জৈব-অজৈব উপাদান দিয়ে| যদি প্রস্তাবিত মূল উপাদানটি দ্রাব্য হয় তবে তার এক (১) অংশ, (৯) অংশ বা নিরানব্বই (৯৯) অংশ ডিস্টিল্ড বা পাতিত পানি কিংবা অ্যালকোহলের সাথে মেশানো হয় এবং বেশ জোরে জোরে ঝাঁকানো হয়| যাকে বলা হয় Succussion করা| আর যদি দ্রাব্য না হয় তবে সেটি সমপরিমাণ পাউডার বা গুড়া ল্যাকটোজের (Lactose হচ্ছে দুধের শর্করা) সাথে মেশানো হয়| এরপর এই দ্রবণ/মিশ্রণটিকে ধারাবাহিকভাবে আরো লঘুকরণ বা হালকা করা হয় যতক্ষণ না পযন্ত এটি হোমিওপ্যাথদের তথাকথিত কাঙ্ক্ষিত ঘনত্বে না পৌঁছায়| ১ থেকে ১০ মাত্রার লঘুকরণকে সাংকেতিকভাবে রোমান হরফ ঢ দিয়ে প্রকাশ করা হয়| যেমন 1x = ১/১০, 3x = ১/১০০০, 6x = ১/১০০০০০০| আবার ১ থেকে ১০০ তরলীকরণকে সাংকেতিকভাবে প্রকাশ করা হয় C দিয়ে| যেমন 1C = ১/১০০, 2C= ১/১০,০০০, 3C= ১/১০০০০০০| হোমিওপ্যাথির বেশির ভাগ রেমেডি বা চিকিৎসা সাধারণত 6x থেকে 30X-এর মধ্যে থাকে| তবে হোমিওপ্যাথরা 'দাবি' করেন 30C বা তার থেকেও বেশি লঘুকৃত ওষুধ-ও নাকি বাজারে পাওয়া যায়!

হোমিওপ্যাথের ভাষ্যানুসারে 30X এর অর্থ হচ্ছে যে মূল উপাদানটিকে এমন মাত্রা লঘুকরণ বা হালকা করা হয়েছে যে সেটি ১০^{৩০} মাত্রায় রয়েছে| যদি ধরা যায় এক ঘন সেন্টিমিটারে ১৫ ফোঁটা পানি থাকে তবে এমন একটি বিশাল সংখ্যার পানির ফোঁটার জন্য জায়গা লাগবে পৃথিবীর চেয়ে আকারে ৫০ গুণ বড় একটি পাত্র| এবার চিন্তা করুন এক ফোঁটা লাল রঙ এমন কোনো বড় কোনো পানির পাত্রে ফেলা হলো এই আশায় যে এটি সমানভাবে মিশ্রিত হবে পুরো দ্রবণে| হোমিওপ্যাথির 'Law of infintsimal' দাবি করছে যা তা হলো অনেকটা এরকম : এই পাত্র থেকে যে কোনো এক ফোঁটা পানি সংগ্রহ করা হোক না কেন, সেই ফোঁটাটি ওই লাল রঙ এর মূল সত্তা বা এসেন্স ধারণ করে রাখবে| আমেরিকার ফিজিক্যাল সোসাইটির প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড এল পার্ক উল্লেখ করেছিলেন যেহেতু কোনো দ্রবণে সবচেয়ে কম পরিমাণটি হচ্ছে মূল সক্রিয় উপাদানের কমপক্ষে অন্তত একটি অণুর উপস্থিতি, অর্থাৎ হোমিওপ্যাথদের দাবি করা একটি ৩০C দ্রবণে কমপক্ষে ১০^{৬০} (১-এর পর ৬০টি শূন্য বসবে) পানির অণুতে এক অণু মূল উপাদানটি দ্রবীভূত থাকতে হবে, তাহলে এই দ্রবণ ধারণের জন্য পৃথিবীর চেয়ে ৩০ বিলিয়ন বড় আকারের পাত্র প্রয়োজন| আরেকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে এভাবে ১ মিলিলিটার দ্রবণ যাকে ৩০C মাত্রায়

লঘুকৃত করা হয়েছে তা গাণিতিকভাবে $১০^{৫৪}$ ঘনমিটার পানিতে ১ মিলিলিটার দ্রবর একটি দ্রবণ, যার আয়তন হবে $১০^{১৮}$ মিটার প্রতি পাশে, যা প্রায় ১০৬ আলোকবর্ষের সমান, যখন গোলাকার হয়, তাহলে এটির ব্যস হবে ১৩১.১ আলোকবর্ষ; আর সে কারণে হোমিওপ্যাথির ওষুধগুলো সাধারণ পোটেন্সি বা মাত্রায় কোন সন্দেহ নেই পানি বা অ্যালকোহল, বা সুগার এবং অন্যান্য ওষুধ নয় এমন উপাদান ছাড়া আর কিছুই থাকে না|

Occillococcinum হচ্ছে এক ধরনের তথাকথিত হোমিও-ওষুধ যা ইনফ্লুয়েনজা'র চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়| এতে নাকি রয়েছে ২০০ঈ উপাদান| এই ওষুধের জন্য যে 'লঘুকরণ' করা হয় বলে দাবি করা হয় তা আরো বিস্ময়কর| ওষুধটির তথাকথিত সক্রিয় উপাদানটি তৈরি করা হয় সদ্য জবাই করা হাঁসের কলিজা ও হৃৎপিণ্ড যা ৪০ দিন পর্যন্ত কৃত্রিম তাপে (ইনকিউবেট) রেখে দেয়া হয়| এখান থেকে যে তরলটি পাওয়া যায় তাকে পরিশুদ্ধ করে আবার হিমায়ন করা হয়| ঠাণ্ডায় ভালো করে জমে গেলে এরপর পানিতে মেশানো হয় এবং বারবার তরলীকৃত করে চিনির সাথে মেশানো হয়| যদি হাঁসের কলিজা ও হৃৎপিণ্ডের একটি অণুকে এই তরলীকরণ প্রক্রিয়ায় টিকে থাকতে হয় তবে এর ঘনত্ব হবে প্রতি $১০^{৪০০}$ (অর্থাৎ ১-এর পর ৪০০ শূন্য) অণুতে ১টি| এই সংখ্যাটি ($১০^{৪০০}$) যা সমস্ত মহাবিশ্বে যে পরিমাণ অণু (প্রায় ১ গুগল অর্থাৎ ১-এর পর ১০০টি শূন্য) আছে বলে ধারণা করা হয়, তারচেয়েও অনেক অনেক বেশি, সুতরাং অসম্ভব একটি ব্যাপার| যুক্তরাষ্ট্রের নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট অনুযায়ী বছরে *Occillococcinum* ওষুধ তৈরি করতে মাত্র ১টি হাঁস জবাই করলেই চলে| ১৯৯৬ সালে এই ওষুধটির মোট বিক্রির পরিমাণ ছিল প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলার| পত্রিকাটি সেই হতভাগা হাঁসটির নাম দিয়েছিল '২০ মিলিয়ন ডলার ডাক'|

রসায়নের সূত্র বলছে লঘুকরণের একটা সীমা আছে এরপর সেই দ্রবণে দ্রবের উপস্থিতি আর থাকবে না| এই সীমা অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা বলে পরিচিত| যা হোমিও তরলীকরণের ১২ঈ বা ২৪চ-এর সমতুল্য| রসায়নে দক্ষ হ্যানিম্যান কিন্তু ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন তার অতিমাত্রার এসব লঘুকৃত 'ওষুধে' সক্রিয় উপাদানের কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব না| তবু তিনি বিশ্বাস করতেন খুব ভালো করে ঝাঁকানোর (Succussion) সময় (রেমেডি যদি তরল না হয় তবে খুব দৃঢ়ভাবে একে গুড়া করতে হবে, যাকে বলে Trituration) সক্রিয় উপাদানটির স্পিরিট বা এসেন্স বা মূল সত্তাটি দ্রবণের সাথে মিশে যাবে| অর্থাৎ শেষ দ্রবণে যদি কোনো অণুও না থাকে সেক্ষেত্রে এর কাজ করতে কোনো অসুবিধা হবে না| দ্রাবক তরল ঠিকই মনে রাখবে সেই উপাদানটিকে, যাকে বলা হয় মেমোরি অব ওয়াটার বা পানির স্মৃতি| তাই যদি হতো তাহলে দ্রাবক তরলের (যেমন পানি) সংস্পর্শে আসা সব উপাদানকেই মনে রাখার কথা এবং নিশ্চয়ই সেটা অপ্রত্যাশিত প্রভাব ফেলবে সক্রিয় হোমিও উপাদানটির কাজে| পদার্থবিজ্ঞানী পার্কের মতে কেউ যদি হোমিওপ্যাথদের 30X কোন পিল বা বড়ি

থেকে এক অণু তথাকথিত সক্রিয় উপাদান গ্রহণ করতে চান তাহলে তাকে প্রায় ২ বিলিয়ন পিল খেতে হবে| যার জন্য প্রয়োজন প্রায় হাজার টন নানা অবিশুদ্ধ উপাদানসহ ল্যাকটোজ|

হোমিও-সমর্থকদের অনেকে এই চিকিৎসাগুলোর সাথে ভ্যাক্সিন বা টীকার তুলনা করেন কিন্তু তুলনাটি মোটেও ঠিক না| কারণ ভ্যাক্সিনে সক্রিয় উপাদানের পরিমাণ অনেক বেশি এবং সেখানে কী পরিমাণ সক্রিয় উপাদান রয়েছে তা পরিমাপযোগ্য| এছাড়া যে প্রতিষেধক রক্তে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে তার ঘনত্ব পরিমাপ করা যায়| কিন্তু অতিমাত্রার লঘুকৃত কোনো হোমিও-ওষুধগুলো কোন ধরনের পরিমাপযোগ্য প্রতিক্রিয়া তৈরি করে না|

হলিজম এবং উপসর্গগুলোর মোট বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ধারিত চিকিৎসা :

হোমিওপ্যাথির আরেকটি মূলনীতি হলো হোমিও-ওষুধ নাকি সবচেয়ে বেশি কাজ করে যখন কোনো রোগীর উপসর্গগুলোর সার্বিক বা মোট বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী (রোগের বৈশিষ্ট্যসূচক উপসর্গানুযায়ী না) তাদের চিকিৎসা করা হয়| যেমন কোনো রোগী যার প্রধান উপসর্গ হচ্ছে চোখ দিয়ে পানি পড়া, চোখ লাল হয়ে জ্বালাপোড়া করা, নাক দিয়ে পরিষ্কার পানির মত নিঃসরণ, এক্ষেত্রে রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয় পেঁয়াজের (*Allium cepa*) নির্যাস থেকে তৈরি নিরাময় দিয়ে| আবার যদি কোনো রোগী, এমন উপসর্গ নিয়ে আসে যেমন ঘন হলদে রঙের নাকের সর্দি দেখা দিয়েছে, যার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কমে গেছে এবং ঠাণ্ডা পরিষ্কার বাতাস যার কাম্য, সেই রোগীর চিকিৎসা করতে হবে পার্পল (Purple cone) কোনো ফুলের নির্যাস দিয়ে (Pulsatilla)| দুজন রোগীর রোগ কিন্তু একই, শুধু ভিন্ন উপসর্গের কারণে তাদের চিকিৎসা করা হয় ভিন্ন ভিন্ন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রক্রিয়ায়| বিষয়টি হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত যে কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সমস্যা তৈরি করে| কারণ প্রচলিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মত সুনির্দিষ্টভাবে নির্বাচিত বৈশিষ্ট্য সাধারণ হোমিও ট্রায়ালগুলোয় থাকে না| তাদের নিজেদের মতো করে ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারী রোগীদের বাছাই করা হয়| কোনো নির্দিষ্ট মাননিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বজায় না রেখেই গত দুই শতাব্দী ধরে অসংখ্য ম্যাচিং (উপসর্গ, অসুখ ও হোমিও-ওষুধ) প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেছেন হোমিওপ্যাথরা|

অতি মাত্রায় লঘুকৃত যুক্তি :

হোমিওপ্যাথি ওষুধকে 'কার্যকর' দাবি করতে হলে তাদের কাজ করার একটি বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া থাকতে হবে| কিন্তু এখনো পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলো কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়টি জানা যায় নি| যদি আমরা হোমিওপ্যাথদের দাবি অনুযায়ী মেনে নেই তাদের এই ওষুধগুলো কাজ করছে তাহলে তারা অবশ্যই পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, এবং ফার্মাকোলজির সকল প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সূত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কাজ করছে বা

তাদের কাজ করার উপায় এমন কোনো কিছু যা এখনও কারো পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি| হোমিওপ্যাথির একজন সমালোচকের ভাষায়-'যদি হ্যানিম্যান ঠিক হন তাহলে আমাদের বিজ্ঞান এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি সব ভুল, আর যদি তিনি ভুল হন তাহলে তার মতবাদ অর্থহীন|'

কোন সক্রিয় উপাদানকে ধারাবাহিকভাবে লঘুকরণ করা হলে খুব দ্রুত এটি অত্যধিক তরলীকৃত দ্রবণে তা পরিণত হতে পারে| আবার তরলীকরণ তার শেষ সীমায় যখন পৌঁছে যায় তখন দ্রবণে সেই দ্রাব্যটির আর কোনো অণুর থাকার সম্ভাবনা থাকে না| এই সীমাটা যদিও একটি বিশাল সংখ্যা তবে অসীম নয়| সুনির্দিষ্ট সংখ্যক অণু থাকে এক মৌল কোনো পদার্থে| মোল হচ্ছে কোনো পদার্থের আণবিক ওজন, যা গ্রামে প্রকাশ করা হয়| এক মোল কোনো পদার্থের মোট অণুর সংখ্যা ৬.০২২ X ১০^{২৩}| যা আভোগ্যাড্রোর সংখ্যা (Avogadro's number) হিসাবে পরিচিত|

পূর্বে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে, হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহার করা হয় এমন ওষুধগুলো যা সাধারণ লঘুকরণ করা হয় ১০ বা ১০০ গুণিতক হারে| X বা D মানের কোনো লঘু দ্রবণ তৈরি করা হয় ১:১০ এর ধারাবাহিক তরলীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং C লঘু মানের ওষুধগুলো তৈরি করা হয় ১:১০০ এর ধারাবাহিক তরলীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে| এভাবে কোনো ওষুধের গায়ে যদি লেখা থাকে C30 তাহলে বোঝায় এটি ১:১০০ হারে এটি তরলীকরণ করা হয়েছে ৩০ বার| সুতরাং সহজ গণিতই বলছে C১২ বা D২৪ তরলীকরণ পর্যায়ে বা এর উপরে কোনো তরলীকরণে প্রস্তুত ওষুধে সেই সক্রিয় উপাদানটি থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই| আর মূল উপাদানটিই হোমিও-ওষুধে যখন অনুপস্থিত থাকে তবে এটি কিভাবে কাজ করে তা কল্পনার উপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই|

এরপরও হোমিওপ্যাথরা নানা ধরনের 'প্রস্তাব' করেছেন সক্রিয় উপাদান না থাকলে কী হবে, তারা নাকি চিহ্ন রেখে যায় দ্রবণে! যেমন দাবি করা হয়, স্থায়ী আইস বা বরফের স্ফটিক তৈরি করে বা পানির চুম্বকীয় প্রকৃতি পরিবর্তন করে কিংবা পানিতে প্রোটিন খোলস তৈরি করার মাধ্যমে পানির স্মৃতিতে থেকে যায় সক্রিয় উপাদানের নির্যাস| পানির অণু অত্যন্ত পোলারাইজ, এ কারণে জীববিজ্ঞানে এর বিশেষ একটা ভূমিকা আছে| তবে হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরি করার সময় যে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দেয়া হয়, সেখানে কিভাবে কল্পিত জটিল বরফের স্ফটিকের ন্যায় কোনো কিছু অক্ষত থাকে সেটা সহজে অনুমেয়| এছাড়া এই কল্পিত গঠনটি যে কাজ করে বলে দাবি করা হয় তার কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় নি| এছাড়াও হোমিওপ্যাথ সমর্থক কিছু প্রস্তাবনা যা আরো অসমর্থনযোগ্য| যেমন দাবি করা হয় 'হোমিও-ওষুধের চিকিৎসা পদ্ধতি বায়োলজিক্যাল ম্যাগনেটাইটের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত|' কিন্তু ম্যাগনেটাইটের আবিষ্কারকই এই বক্তব্যের সমালেচনা করে বলেছিলেন, 'এ ধরনের প্রস্তাব ম্যাগনেটাইটের গঠন সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাকে

প্রকাশ করে| এবং পানি মোটেও ফেরোম্যাগনেটিক (ferromagnetic) নয়|

হোমিওবাদীরা (অদ্ভুতভাবে) দাবি করেন, লঘুকরণের ফলে পানি বা দ্রবণে কোনো সক্রিয় উপাদান না থাকলেও ওই দ্রবণের মধ্যে এর সক্রিয় উপাদানটি একটি স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়, অথবা 'পানি মনে রাখে' তার গঠনটি, যাকে 'Memory of Water' বা পানির স্মৃতি বলে| সত্য হচ্ছে পানির স্মৃতি ধরে রাখার মতো কোনো গঠনগত পরিবর্তন হলে পরীক্ষার মাধ্যমে তা দেখার প্রযুক্তি বহুদিন ধরেই বিদ্যমান রয়েছে| যেমন ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি, স্পেকট্রোস্কোপি, আল্ট্রাভায়োলেট ট্রান্সমিশন ক্যারেক্টারিস্টিকস, এক্সরে ও আল্ট্রাসাউন্ড ইত্যাদি| যদি আসলেই 'পানির স্মৃতি'র অস্তিত্ব থাকতো তবে অবশ্যই হোমিওপ্যাথির ওষুধে দ্রবণের গঠনগত পরিবর্তন শনাক্ত করা সম্ভব হত যে কোনো একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করেই| কিন্তু পানির স্মৃতির কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় নি| বরং কয়েকটি আল্ট্রাসনোগ্রাফিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে সাধারণ পানি ও হোমিও-ওষুধের মধ্যে আসলেই কোনো পার্থক্য নেই| এমন কী পরীক্ষামূলকভাবে খোদ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ও রোগীরা আলাদা করে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির বা প্রভাব ফেলে বলে দাবি করা এমন হোমিও-ওষুধও আলাদা করতে ব্যর্থ হয়েছে প্রায় ৯ বছর ধরে পরিচালিত একটি গবেষণায়|

পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিতে খুবই লঘকৃত পানিতে কোনো গঠনগত পরিবর্তন সাধন করা খুব অসম্ভব একটি ব্যাপার| পানি বা অ্যালকোহলের মিশ্রণের পরীক্ষায় দেখা গেছে এই ধরনের পরিবর্তনগুলো স্থানীয় ও ক্ষণস্থায়ী| এটা নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর এবং খুব সামান্য সময় তা কার্যকর থাকতে পারে| এছাড়া অনেক পদার্থের জন্য স্থানীয় গঠনের সন্নিবেশ বা অর্ডার তরলাবস্থায় থাকতে পারে না| কারণ হচ্ছে এনট্রপি| কিছু ব্যতিক্রম যদিও আছে, যেমন লিকুইড ক্রিস্টাল| এর বেশ দীর্ঘাকৃতির অণুগুলো একবার তৈরি হলেও তারা কিন্তু বেশি নাড়াচড়া করতে পারে না যখন তরলাবস্থা সৃষ্টি হয়| আবার এখন পর্যন্ত কোনো পরীক্ষায় বা তাত্ত্বিকভাবে দেখা সম্ভব হয় নি বা সামান্য আভাসও পাওয়া যায় নি যে, পানি আসলে লিকুইড ক্রিস্টাল তৈরি করতে পারে|

হোমিওপ্যাথরা অবশ্য এটাও বলেছেন, কোনো ভৌতিক বা পদার্থবিদ্যার সূত্র না মেনেই তাদের তৈরি 'দ্রবণ' কাজ করে| তাই স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, এ ধরনের কল্পিত ধারণার কোনো পরীক্ষামূলক প্রমাণ নেই এবং বিজ্ঞানীরাও এখন পর্যন্ত এমন কোনো পদার্থ পান নি যা এ ধরনের আচরণ করে থাকে| সুতরাং কোনো অপ্রমাণিত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যার জন্য অজানা সূত্রের দোহাই দেয়া বিজ্ঞানের আইনসিদ্ধ পন্থায় পড়ে না|

হোমিওপ্যাথির এই তরল দ্রবণ ক্রমান্বয়ে যুক্ত করার লঘুকরণ প্রক্রিয়ায় আরো একটি বিস্ময়কর সমস্যা, যা এর সমর্থকরা

ব্যাখ্যা দিতে পারবেন তা হলো তাদের বেশ কিছু ওষুধ-পিল বা কঠিন আকারে পাওয়া যায় 'ল্যাকটোজ ট্যাবলেট'; প্রস্তাবিত হোমিও ডাইলুশন বা লঘুকরণ প্রক্রিয়া হোমিও পিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় শুধু যারা বাহক (দ্রবণ,যেমন পানি) হিসেবে কাজ করে| তবে এর জন্য তরলীকৃত দ্রবণটিকে বাষ্পীভূত হতে হবে পাউডারের মত ওষুধটির একটি মিশ্রণ পাবার জন্য| এখানে তাহলে প্রশ্ন ওঠে, তরল দ্রবণটি যা কিনা বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যায় তাররপরও কিভাবে এর তথ্যটি পিলে স্থানান্তরিত করে|

হোমিওপ্যাথির অতি লঘুকৃত মিশ্রণ নিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, মিশ্রণটি কেন শুধু সক্রিয় উপাদানের 'নিরাময় ক্ষমতা'কে মনে রাখে, এর সম্ভাব্য অন্যান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো বাদ দিয়ে? অথবা কেনই বা পানি তার সংস্পর্শে আসা অন্য উপাদানসমূহকে বিশেষভাবে ভুলে যায়? আসল সত্য হচ্ছে এই অতিমাত্রায় তরলীকৃত হোমিও-ওষুধ কিভাবে কাজ করে তার কোনো বোধগম্য প্রক্রিয়া আজও বর্ণনা করা সম্ভব হয় নি, ফলে কোনো পরীক্ষিত উপায়েই হোমিও-ওষুধের কার্যকারিতা প্রমাণ করা সম্ভব না| সে কারণে দেখা যায়, হোমিও-ওষুধগুলো কিভাবে কাজ করে তার ব্যাখ্যা না দিয়ে বেশিরভাগ 'হোমিও-গবেষণা' শুধু তাদের ফলাফল আলোচনায় ব্যস্ত থাকে|

১৯৮৮ সালে হোমিওপ্যাথি আরো একবার মারাত্মক বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছিল এই লঘুকরণ দ্রবণের কার্যকারিতা নিয়ে| স্বনামধন্য বিজ্ঞান জার্নাল *নেচার*-এ একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়| ফরাসি হোমিও-গবেষক জ্যাক বেনভেনিস্টি ও জে. অ্যামারাসহ কয়েকজন গবেষকের লিখিত ওই নিবন্ধের শিরোনাম ছিলো 'Human Basophil Degranulation Triggered by Very Dilute Antiserum against IgE'| নিবন্ধে লেখকেরা দাবি করেন বিশুদ্ধ পানি কোনো না কোনোভাবে স্মৃতি ধরে রাখতে পারে, মানে ওই পানিতে পূর্বে কি ছিলো সেটা স্মরণ রাখতে পারে| জ্যাক বেনভেনিস্টি'র বক্তব্য অনুযায়ী, 'তিনি মানুষের শরীরে অ্যালার্জির সাথে জড়িত এক ধরনের অ্যান্টিবডি 'IgE'-কে বেসোফিলে দ্রবণে নিয়ে অতিমাত্রায় লঘু করতে থাকেন| এক সময় এই দ্রবণে শুধু বিশুদ্ধ পানি ছাড়া আর কিছু ছিল না| তখন বেনভেনিস্টি এই দ্রবণকে জীবিত কোষের সংস্পর্শে প্রবেশ করালে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া (এক্ষেত্রে বেসোফিল ডিগ্রানুলেশন) লক্ষ্য করেন|' এভাবে বেনভেনিস্টি দাবি করেন যে নিশ্চয়ই পানির স্মৃতি ধরে রাখা ক্ষমতা আছে! কিন্তু সমস্যা হলো এই গবেষণা যদি সত্যি হয় তবে আমাদের পদার্থবিজ্ঞান-রসায়নের সূত্রাবলী নতুন করে রচনা করতে হবে| *নেচার* জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রাথমিকভাবে এই ধরনের বক্তব্যের ঘাটতি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন, তবে নিবন্ধের নিচে একটি সম্পাদকীয় নোট যোগ করা হয়| নোটে বলা হয় স্বাধীন অনুসন্ধানী দল দ্বারা বেনভেনিস্টি'র পরীক্ষাটি পর্যবেক্ষণ করা হবে| অতঃপর *নেচার* একটি অনুসন্ধানী দল ফ্রান্সে প্রেরণ করে যেন বেনভেনিস্টি'র ল্যাবে গিয়ে সরাসরি তাদের সেই অদ্ভুত দাবিগুলো স্বচক্ষে যাচাই করা যায়| অনুসন্ধানী দলটিতে নেচারের

সম্পাদক জন ম্যাডক্স নিজেও ছিলেন| আরও ছিলেন খ্যাতিমান রসায়ন বিজ্ঞানী ওয়াল্টার স্টুয়ার্ট ও আমেকিার অপবিজ্ঞানবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা জেমস র‍্যান্ডি| পেশায় জাদুকর জেমস র‍্যান্ডি বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত দাবি'র রহস্য খণ্ডনের জন্য বেশ বিখ্যাত সমগ্র পশ্চিমাবিশ্বে|

যাহোক, অনুসন্ধানী দলটি খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেন বেনভেনিস্টি'র পরীক্ষা-কার্যক্রমটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য ছিল না| গোটা পরীক্ষায় বেশ কিছু ভুল তথ্যের সমাহার করা হয়েছে এবং পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত নেতিবাচক উপাত্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বারে বারে বর্জন করেছেন গবেষকরা-এমন প্রমাণও সংগ্রহ করেন অনুসন্ধানী দল| শেষে অনুসন্ধানী দলটি ওই ল্যাবে একই যন্ত্রপাতি ও একই উপাদান নিয়ে পুনরায় নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা চালিয়েও বেনভেনিস্টি'র দাবিকৃত সেই ফলাফলগুলো পুনরাবৃত্তি করতে ব্যর্থ হন| অনুসন্ধানী দলটি এবার নিশ্চিৎ হন হোমিও-গবেষকদের তথাকথিত পরীক্ষণ-কার্যক্রমে ভুল ছিল| এবং এ নিয়ে সদস্যরা একাধিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন| *নেচার* জার্নালের অনুসন্ধানী রিপোর্টের কারণে জ্যাক বেনভেনিস্টি ফ্রান্সের মূল ধারার বিজ্ঞান-অঙ্গন থেকে ছিটকে পড়তে বাধ্য হন| কিন্তু ধর্মগুরুর মতো বেনভেনিস্টি ২০০৪ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার দাবিকে 'সত্য' বলে বিশ্বাস ও প্রচার করে গেছেন|

পশ্চিমা দেশগুলোতে হোমিওপ্যাথির অনুরাগীরা শুরু থেকে জ্যাক বেনভেনিস্টির দাবির প্রতি গভীর আস্থা জানালেও পানির স্মৃতি ধরে রাখা নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে বেশকিছু দিন ধরে| একমাত্র জ্যাক বেনভেনিস্টির ল্যাব থেকেই এই বিতর্কিত ফলাফলটি এসেছে| অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও হোমিও-গবেষকের দাবি মতো পরীক্ষা চালিয়ে ফলাফল পেতে ব্যর্থ হন| তাই এই ধরনের দাবিকে প্রত্যাখান করেন মূলধারার বিজ্ঞানীরা| তীব্র সমালোচনার পরও ফরাসি হোমিও-গবেষকরা নিজেদের ভুল সংশোধনে উদ্যোগী হন না| জ্যাক বেনভেনিস্টি রণভঙ্গ না দিয়ে আবার ডিজিবায়ো (DigiBio) নামের একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন| ১৯৯৮ সালের দিকে এসে বেনভেনিস্টি পুনর্বার আরেক অভূতপূর্ব উদ্ভট দাবি করেন-'পানি শুধু স্মৃতি ধরে রাখতে পারে তাই না, এই স্মৃতিকে ডিজিটালাইজ করা সম্ভব এবং তা ইন্টারনেট, টেলিফোন ও ডিস্কের মাধ্যমে প্রেরণ করা সম্ভব|' আমেরিকার *ডিফেন্স অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্টস্ এজেন্সি* (সংক্ষেপে *DARPA*) আগ্রহী হয়ে 'ডিজিবায়ো'র দাবিগুলো পরীক্ষা করে দেখেছে-'ওগুলো ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়, পানির কোনো স্মৃতি ধরে রাখার ক্ষমতা নেই এবং এই ক্ষমতাকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করার প্রশ্নই উঠে না|' ডিজিবায়ো'র এই ধরনের চরম 'বিজ্ঞান-বিরোধী' দাবির বিরুদ্ধে মূলধারার বিজ্ঞান-অঙ্গনে আবারও তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়| ফরাসি গবেষণা কর্তৃপক্ষও বাধ্য হয় বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান-চর্চাকারী ওই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিতে| সাথে বিশ্বের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের হোমিওপ্যাথিকে 'অপবিজ্ঞান' চিহ্নিত করার জন্য জ্যাক বেনভেনিস্টি'র দায়ের

করা মানহানির মামলাও আদালত খারিজ করে দেয়| (এ বিষয়ে আগ্রহীরা *Skeptical Inquirer* জার্নালে (১৩:১৪২-৪৬) প্রকাশিত জেমস র‍্যান্ডির 'The Case of the Remembering Water' শিরোনামের লেখাটি পড়ে দেখতে পারেন) অথবা ২০০৮ সালের ২৫ জুলাই বিবিসি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশিত 'Could water really have a memory?' শিরোনামের সিমন সিং-এর লেখা নিবন্ধটি পড়ুন এখান থেকে : http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7505286.stm)|

হোমিওপ্যাথি কি প্ল্যাসিবো থেকে কার্যকর?

হোমিওপ্যাথি আসলেই কাজ করে কিনা তা পরীক্ষার জন্য সাধারণত তিনটি প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়া হয়| প্রথমত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বা ওষুধের কার্যকারিতার সাথে প্লাসিবো'র (যাদের ওষুধের বিকল্প হিসাবে দেয়া হয় কিন্তু মূলত কোনো ওষুধ নয়, যেমন চিনির ট্যাবলেট) তুলনামূলক গবেষণা, দ্বিতীয়ত, কোনো একটি নির্দিষ্ট অসুখ বা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কার্যকারিতা, তৃতীয়ত, নানা মাত্রায় বা পোটেন্সিতে এর কার্যকারিতা সংক্রান্ত ল্যাবরেটরি-নির্ভর গবেষণা বিশেষ করে অতিমাত্রায় কম ঘনত্বের দ্রবণ বা আল্ট্রাহাইডাইলুশনের ক্ষেত্রে| প্রথমটির ক্ষেত্রে আমরা তথ্য পাই বিভিন্ন ধরনের হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল থেকে| বিশেষ করে প্ল্যাসিবোসহ নিয়ন্ত্রিত (র‍্যানডমাইজইড) কন্ট্রোল ট্রায়ালগুলোর বিশ্লেষণ এবং মেটাঅ্যানালাইসিসের মাধ্যমে| এ ধরনের বিশ্লেষণে দেখা হয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা যারা পাচ্ছে এবং যারা চিকিৎসা হিসাবে প্ল্যাসিবো বা ওষুধকল্প পেয়েছে তাদের মধ্যে আসলেই তুলনামূলক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে কি না? এখানে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে নানা অসুখের চিকিৎসায় গৃহীত ট্রায়ালগুলো নির্বাচন করা হয় পর্যালোচনা করার জন্য| দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশেষ কোনো অসুখের ক্ষেত্রে সাধারণত একই ধরনের রোগীদের নিয়ে করা ট্রায়ালগুলোর ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়| আর তৃতীয় ক্ষেত্রে নানা মাত্রার বা পোটেন্সির হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষ পরিবেশে গবেষণাগুলো চালানো হয়|

ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে বা গবেষণাগুলোয় হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক হোমিওপ্যাথির জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে| সাম্প্রতিক দশকগুলোতে দেড়শ'র বেশি কন্ট্রোলড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়েছে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা নিয়ে যা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে| এইসব গবেষণার সব ফলাফল যেমন ইতিবাচক নয় আবার সব ফলাফলও নেতিবাচক নয়| এ কারণে এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই কোনো পর্যালোচনাকারী গবেষকের নিজস্ব প্রাকধারণা মোতাবেক পছন্দনীয় গবেষণাগুলো বাছাই করার সম্ভাবনা রয়ে যায়| এই পূর্বনির্ধারণের সমস্যাটা ভালোভাবে কাটানো যায় যদি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণগুলোকেই শুধু যথাযথ মূল্যায়ন করা যায়|

এখানেই সিস্টেম্যাটিক রিভিউর বা পদ্ধতিগত পর্যালোচনার আগমন| তারপরও দেখা যায় সিস্টেম্যাটিক রিভিউর পর্যায়েও হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে ফলাফল সবসময় এক হয় না| যেমন ১৯৯৭ সালে স্বনামধন্য মেডিকেল জার্নাল *ল্যাঙ্গেট*-এর একটি রিভিউতে বলা হয়েছিল হোমিওপ্যাথির ক্লিনিক্যাল সাফল্য পুরোপুরি প-্যাসিবো প্রভাবের জন্য নয়| ২০০৫ সালে অপর একটি রিভিউ থেকে দেখা যায় হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা প্ল্যাসিবো প্রভাবের জন্যই ঘটে| ২০০২ সালে ইডজার্ড আর্নস্ট এর একটি রিভিউতে (যা প্রায় ১৭টি প্রধান সিস্টেমিক রিভিউর একটি রিভিউ) বলা হয়েছে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা সংক্রান্ত এ যাবত পাওয়া সব প্রমাণ বলছে আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে হোমিওপ্যাথির ব্যবহার কোন ইতিবাচক গ্রহণযোগ্যতা দাবি করার যোগ্যতা রাখে না| কারণ হোমিও-ওষুধের কার্যকারিতা প্ল্যাসিবো থেকে ভিন্ন নয়|

হোমিওপ্যাথরা সবসময় তাদের বিরুদ্ধে উপসংহার টানা সিস্টেমেটিক রিভিউগুলোর প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন| সে কারণে ২০১০ সালে সবচেয়ে সেরা রিভিউ হিসাবে স্বীকৃত যা একদম সাম্প্রতিক তথ্যসম্বলিত, পক্ষপাতদুষ্ট নয় এমন নিয়মমাফিক স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বাছাই করা গবেষণা পেপারগুলো নিয়ে রিভিউ করা হয়েছে, যেগুলো সাধারণত '*কখরান*' (Cochran) রিভিউতে ঠাঁই পায়| সেই *কখরান* ডেটাবেস থেকে ইডজার্ড আর্নস্ট কতগুলো সিস্টেমেটিক রিভিউর একটি রিভিউ এবং মেটাঅ্যানালাইসিস করেন| আর্নস্টের রিভিউর বৈশিষ্ট্য ছিল পেপারগুলোর বেশিরভাগই ছিল খোদ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের করা| সুতরাং এই পেপারগুলোকে হোমিওপ্যাথির বিরোধীদলের করা-এমন ভাবনার তেমন কোনো সুযোগ নেই বরং উল্টোটাই বলা যেতে পারে| এই রিভিউর উপসংহারেও দেখা যায় হোমিওপ্যাথিতে প্ল্যাসিবোর অতিরিক্ত কোন প্রভাব নেই অর্থাৎ ওষুধ হিসাবে প্রদত্ত হোমিও চিকিৎসার সাথে ওষুধ নয় এমন চিনির ট্যাবলেটের কার্যকারিতার কোন পার্থক্য নেই| '*কখরান*' ডেটাবেসের বাইরে আরো অনেক রিভিউও আছে যেখানে গবেষকরা নেতিবাচক ফলাফলই পেয়েছেন| এবং সাম্প্রতিককালের রিভিউগুলোতে হোমিওপ্যাথির 'প্ল্যাসিবো'-অতিরিক্ত কোনো কার্যকারিতার বিপক্ষে প্রমাণ ক্রমশ বাড়ছে| বহু গবেষকই স্প ষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন হোমিওপ্যাথির মূল ধারণাটাই বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব| মানে বিজ্ঞানসম্মত নয়|

হোমিওপ্যাথির মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে করা গবেষণাগুলো যারা রিভিউ করেছেন তারাও দেখেছেন এ ধরনের তথ্য-উপাত্তের মান কত নিম্নমানের হতে পারে| এছাড়া কোনো গবেষণার ফলাফল পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব হয়েছে এমন উদহারণের অভাবও রয়েছে| কোনো ইতিবাচক ফলাফল স্থিতিশীল নয়| যা কিনা পরবর্তীতে আরো অন্য কোনো গবেষকের গবেষণায় প্রমাণিত

হয়েছে| এসব ফলাফল বলছে প্ল্যাসিবো'র অতিরিক্ত কোনো প্রভাব ফেলার কোন প্রমাণই হোমিওপ্যাথির স্বপক্ষে নেই| অবশ্য হোমিওপ্যাথরা এটি অস্বীকার করে এসেছেন বার বার| যদিও তারা এর পক্ষে দুর্বল প্রমাণ যুগিয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন| তাদের এই ইতিবাচক রিভিউগুলোর বিশ্লেষণ অ্যানালাইসিস করলেই দেখা যায় কী ধরনের পক্ষপাতিত্ব আছে সেখানে| যেমন কোনো রিভিউয়ার সচেতনভাবে বেছে সেইসব গবেষণা-নিবন্ধ যোগ করেছেন যাদের ফলাফল ইতিবাচক এবং বাদ দিয়েছেন সব নেতিবাচক গবেষণাগুলো|

এ ধরনের সিস্টেমেটিক রিভিউ সত্ত্বেও হোমিওপ্যাথরা দাবি করেন 'বেশ কিছু পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা আছে যা এর কার্যকারিতার প্রমাণ বহন করে|' এবং তাদের ভিত্তিহীন একটি প্রস্তাব হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত কোনো গবেষণা হোমিওপ্যাথির গবেষণার জন্য উপযুক্ত নয়| শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণাগুলোই পারে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতার প্রমাণ করতে| সম্ভবত এ ধরনের প্রস্তাবের যৌক্তিক কারণ হচ্ছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নয় এমন কিছু প্রভাবের ফলে সৃষ্ট ইতিবাচক ফলাফলগুলো| যেমন 'সহানুভূতিশীলতা', 'সুদীর্ঘ পরামর্শ দেয়ার সময়' ইত্যাদি হোমিওপ্যাথির বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় পর্যবেক্ষণ-নির্ভর গবেষণায়| তবে অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা যায় হোমিওপ্যাথি প্ল্যাসিবো ছাড়া আর কিছু না| *কখরান* রিভিউগুলোর মধ্যে একটি যেমন কাসাব ও তার সহযোগীরা (২০০৯) প্রাথমিক বিশ্লেষণে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা রয়েছে বলে দেখতে পান| এই ধরনের কারণ আসলে যে ওষুধটাকে দ্রবীভূত করা হয়েছে তার উপর নির্ভরশীল| যেহেতু দ্রবণ তৈরি করা হয় এবং সেটি হোমিও মতে করা হয় তাহলে কারিগরি দিক হতে এটি হোমিও-ওষুধ| এমন-কী যখন তা অতিরিক্ত লঘু করা হয়ও নি| এর অর্থ হচ্ছে যদিও অতি লঘুকরণের কারণে প্রচলিত হোমিও-ওষুধে কোন কার্যকরী বা ফার্মাকোলজিক্যালি সক্রিয় কোনো উপাদান থাকার কথা না তবে কিছু হোমিও-ওষুধে সক্রিয় উপাদান বিদ্যমান থাকতেও পারে| যেমন কেউ চাইলে অ্যাসপিরিনের একটি হোমিওপ্যাথিক দ্রবণ তৈরি করতে পারে| হোমিওপ্যাথির নিয়ম মেনেই লঘুকরণের মাত্রাটিকে পরিবর্তন করা যায়| সুতরাং বিস্ময়ের খুব বেশি কারণ নেই এ ধরনের ওষুধের অবশ্যই কিছু প্রভাব থাকতে পারে| কিন্তু এই ধরনের হোমিও-চিকিৎসার উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বলাটা ঠিক না যে প্রস্তাবিত হোমিও-ওষুধটি আসলেই 'কাজ' করছে|

নানা ধরনের চিকিৎসা-পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণায় পরস্পর বিরোধী ফলাফল পাওয়াটা নতুন কোনো বিষয় না| আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে এই ধরনের সমস্যার সমাধানের একটি উপায় হলো সঠিকভাবে নিয়ম মেনে করা গবেষণাগুলোর সিস্টেম্যাটিক রিভিউ ও মেটাঅ্যানালাইসিস করা| ১৯৯৭ সালে লিন্ড ও তার সহযোগীরা প্রথমত সেই কাজটি করেছিলেন| তাদের

মেটাঅ্যানালাইসিস ধারণা দেয় হোমিওপ্যাথি প-্যাসিবো থেকে কিছুটা বেশি| তবে লেখকরা এও বলেছিলেন এমন কোনো স্বাস্থ্যসমস্যা তারা চিহ্নিত করতে পারেন নি যেখানে এটি প্ল্যাসিবোর তুলনায় বেশি কার্যকর| এই গবেষণার খবর ছাড়াও সেখানে আরো কয়েকটি পদ্ধতিগত সমস্যা থাকা স্বত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী হোমিওপ্যাথরা বেশ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তাদের চিকিৎসা-পদ্ধতির 'বৈজ্ঞানিক প্রমাণ' মিলেছে এমন একটি আত্মপ্রসাদে| বেশ দ্রুত হোমিওপ্যাথি সমন্ধে আগ্রহ বেড়েছিল| আরো কিছু সিস্টেম্যাটিক রিভিউ নির্ভর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধও এরপর প্রকাশিত হয়েছিল| ১৯৯৭ সালের পর থেকে প্রকাশিত সেইসব গবেষণা নিবন্ধ নিয়ে পরবর্তীতে ইডজার্ড আর্নস্ট আবার একটি সার্বিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেন| উদ্দেশ্য হোমিও-ওষুধগুলোর ক্লিনিক্যাল কার্যকারিতা বিচার| এই নতুন বিশ্লেষণে দেখা যায় লিন্ড ও তার সহযোগীদের মূল মেটাঅ্যানালাইসিসে যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি নিয়মমাফিক ছিল সেখানে ইতিবাচক ফলাফলের পরিমাপ খুব সামান্য| যা সামগ্রিকভাবে কোনো ইতিবাচক ফলাফলকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় সব ধরনের প্রচলিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মানদণ্ডে| একটি বিশ্লেষণ প্রমাণ করে মেটাঅ্যানালাইসিসের প্রাথমিক ইতিবাচক ফলাফলের কারণ আসলে 'পাবলিকেশন্স বায়াস' অর্থাৎ যে গবেষণাগুলোর ফলাফল ইতিবাচক ফলাফল বা সফল দেখা যাচ্ছে সেগুলো প্রকাশ হয়েছে বেশি এবং তাদের অন্তর্ভুক্তি মোট মেটাঅ্যানালাইসিসে ভারসাম্যটিও বদলে দিয়েছে| এ বিষয়টি আগের গবেষকরা লক্ষ্য করলেও কোনো এক কারণে উপেক্ষা করে গেছেন| সুতরাং লিন্ড ও তার সহযোগী মূল উপাত্তের পুনর্বার বিশ্লেষণ আসলে প্রমাণ করে তাদের প্রাপ্ত ফলাফল সঠিক ছিল না|

এছাড়া আরো ১১টি স্বতন্ত্র সিস্টেমেটিক রিভিউ হয়েছিল যাদের উপাত্ত বিশ্লেষণ বলছে সামগ্রিকভাবে হোমিও-ওষুধ নির্দিষ্ট কোনো রোগের ক্ষেত্রেও কার্যকর নয়| এখানে অবশ্য দুটি ব্যতিক্রম পেয়েছিলেন গবেষকরা| প্যারালাইটিক ইলিয়াস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা| এছাড়া সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করা হয়েছে এমন একটি হোমিও-ওষুধ 'আর্নিকা', এটাও প্ল্যাসিবো থেকে বেশি কার্যকরী নয়| ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ আর চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধ '*ওসিলোকক্সিনাম*'-কে (ocillococcinum) কার্যকর হিসাবে লক্ষ্য করা হয়েছে যে স্টাডিতে সেখানে এই ইতিবাচক ফলাফলের পরিমাণ এত সামান্য যে বিষয়টির ওষুধ হিসাবে কার্যকারিতার বিতর্ক শেষ হয় নি| এছাড়া '*ocillococcinum*' এর স্বপক্ষে প্রমাণ খুব সামান্য সে কারণে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়াও সম্ভব না| অন্যদিকে পোস্ট অপারেটিভ ইলিয়াস (যা সাধারণ কিছু ধরনের অস্ত্রোপচারের একটি পাশ্বপ্রতিক্রিয়া যখন আমাদের অন্ত্রনালী তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না) সংক্রান্ত ট্রায়ালগুলোর রিভিউ ইতিবাচক ফলাফল পেয়েছে বিশ্লেষণের

সময় কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার কথা মাথায় রাখতে হবে তা হলো যে বিশেষ মাল্টিসেন্টার স্টাডি (একই সাথে একাধিক কেন্দ্রে এর কার্যকারিতা বোঝার চেষ্টা করেছে সেই স্টাডিটি কিন্তু কোনো ইতিবাচক ফলাফল দেখাতে পারে নি)| একটি স্বতন্ত্র রিভিউ যা বেশকিছু 'র‍্যানডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল'কে বিশ্লেষণ করেছে, তারা খানিকটা ইতিবাচক ফলাফল পেয়েছে, কিন্তু তাদের এই ফলাফলে পৌঁছানোর পরিসংখ্যান প্রক্রিয়াটি এখনও বিতর্কিত এবং গবেষকরা খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন তার ফলাফল খুব সামান্য ইতিবাচক যা দিয়ে ঢালাওভাবে হোমিও চিকিৎসাকে ব্যবহার করার প্রস্তাব করা যায় না| সামগ্রিকভাবে এই উপাত্তগুলো হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা প্ল্যাসিবো থেকে ভিন্ন এমন কোনো প্রমাণ দেয় না| যদি প্রিক্লিনিক্যাল উপাত্ত-ও পর্যালোচনা করা হয়, সেখানেও প্রকাশিত প্রায় ১২০টি গবেষণাপত্রের সিস্টেমেটিক রিভিউতে গবেষকরা দেখেছেন কোনো ইতিবাচক ফলাফল বিশিষ্ট পরীক্ষা স্বতন্ত্রভাবে পুনঃপরীক্ষা করে একই ফলাফল প্রমাণ করা যায় নি| এছাড়া পদ্ধতিগত ভুল ও পরস্পর বিরোধী ফলাফল কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষে প্রধান অন্তরায়| অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যারও বেশি দ্রবীভূত কোনো হোমিও-ওষুধ যে কাজ করার ক্ষমতা রাখে বা রাখতে পারে বিষয়টি এ ধরনের কোনো সিস্টেমেটিক রিভিউকে বেশ সন্দেহজনক করে তোলে| পরবর্তীতে আরও হোমিও-চিকিৎসার কার্যকারিতার পক্ষে-বিপক্ষে ফলাফল নিয়ে বেশ কয়েকটি ট্রায়াল হয়েছে| সুতরাং পরবর্তী সিস্টেমেটিক রিভিউতে এই দুই দিকের ট্রায়ালের ফলাফল কোনো পরিবর্তন না আনার সম্ভাবনা বেশি বলে প্রমাণিত হয়েছে|

হোমিওপ্যাথদের খানিকটা সাম্প্রতিক দাবি হচ্ছে 'সলিউট ক্লাস্টার' অনুকল্প| যা দাবি করছে কোনো দ্রবকে যখন ক্রমান্বয়ে লঘু করা হয়, সেই অতিমাত্রার লঘু দ্রবণে দ্রবটির এক গুচ্ছ খুবই স্থিতিশীল বৃহদাকারে দলা পাকিয়ে দ্রবণে অবস্থান করে| তাদের মতে সে কারণে লঘুকৃত হোমিও-দ্রবণে মূল হোমিও-উপাদানটি এভাবে আসলে রয়ে যায়| একইভাবে succussion (জোরে ঝাঁকুনি দেয়া) প্রক্রিয়াও খুব ক্ষুদ্র-বুদবুদ (Nanobubble) সৃষ্টির জন্য দায়ী| ফলে হয়তোবা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং সম্ভবত হোমিও উপাদানের কোনো গ্যাসীয় অস্তিত্ব নাকি রয়ে যায় যা হোমিও-ওষুধের দাবিকৃত কার্যকারিতার জন্য দায়ী| তবে কথা হচ্ছে এ বিষয়টি এখানো স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন কোনো গবেষণাগারে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব হয় নি| এমন কী এটি যদি প্রমাণিত হয় তা সত্ত্বেও এই 'সলিউট ক্লাস্টার' বা 'ন্যানোবাবল' কিভাবে শরীরে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করা এখনো সম্ভব হয় নি আর সম্ভব হবার কথাও না| এ-কারণে প্রিক্লিনিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল কোনো ক্ষেত্রেই হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিভাবে কাজ করে তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি|

এখন প্রশ্ন হতে পারে ভবিষ্যতে তাহলে এ বিষয় নিয়ে কি গবেষণা হতে পারে? হোমিওপ্যাথদের দুটো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কাজ

করছে এখানে| একদল বলছেন সুনির্দিষ্টভাবে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করা উচিৎ যা চিরকালের মত দ্বন্দ্বটির অবসান করবে এবং এর বিপরীত প্রস্তাবটি নতুন কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আর গবেষণায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ না, তাদের প্রস্তাব আউটকাম (বা চিকিৎসার ফলাফল) নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি চিকিৎসা-সিদ্ধান্তকে সাহায্য করবে এবং প্রচলিত চিকিৎসার সাথে সেই আউটকাম তুলনা করা| অবশ্য সে-ধরনের গবেষণাও হয়েছে| তবে পদ্ধতিগত ত্রুটি বিশেষ করে 'সিলেকশন বায়াস' দিয়ে এরা আক্রান্ত| সাধারণত এরা ইতিবাচক ফলাফলের ইঙ্গিত দেয়| এর অর্থ হচ্ছে এককভাবে সুনির্দিষ্ট রোগীনির্ভর চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথদের বিশেষভাবে দীর্ঘসময় নিয়ে চিকিৎসা করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা আসলে প-্যাসিবো প্রভাবের কারণেই ইতিবাচক ফলাফল দেয়| এ কারণেই গবেষণা আসলে থেরাপিউটিক নির্ভর হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা জানান দিচ্ছে| পরিশেষে যে অনুকল্পটি দাবি করছে কোনো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কার্যকারিতা প-্যাসিবো থেকে ভিন্ন তা নির্ভরযোগ্য কোনো সিস্টেমেটিক রিভিউ বা মেটাঅ্যানালাইসিস-ই সমর্থন করে না| সে কারণে হোমিওপ্যাথিকে কোনোভাবে প্রমাণনির্ভর চিকিৎসা-পদ্ধতি বলাও সম্ভব না|

তাহলে হোমিওপ্যাথি কি নিরাপদ নিরাময় ওষুধ?

যেকোনো চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ| হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত রিপোর্টগুলো প্রায় সবগুলোই হোমিওপ্যাথিকে নিরাপদ চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে| কিন্তু এ ধরনের ফলাফল অবশ্য অপ্রত্যাশিত বা আশ্চর্যজনক নয় যখন প্রায়শ পানি বা অ্যালকোহল দ্রাবক ছাড়া হোমিও-ওষুধে আর কিছুই থাকে না| (তথাকথিত মূল সক্রিয় উপাদানের কোনো উপস্থিতি থাকে না)| কিন্তু তা সত্ত্বেও হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঘটনা একেবারে বিরল নয়| চুলকানি বা প্রুরাইটিস থেকে শুরু করে হামের মত র‍্যাশ, অ্যানাফাইল্যাকটিক বা অ্যালার্জিক শকের ঘটনাও ঘটে| ১৯৯৬ সালের একটি নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে কম লঘুকৃত ওষুধগুলোই বেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণ হয়| সুতরাং হোমিও-ওষুধের কোনো কার্যকারিতা শুধু নেই, সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে|

আরেকটি নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে যখন অনেক দেশেই প্রতিষেধক বা টিকা নেবার বিপক্ষে হোমিওপ্যাথদের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়| বেশ কিছু জরিপ থেকে পাওয়া গেছে হোমিওপ্যাথরা প্রায়ই তাদের রোগীদের টিকা না নেবার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন| আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথদের বৈরী মনোভাবের কারণে সাধারণ রোগীদের কাছে সংক্রামক রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে

প্রমাণিত প্রতিষেধকের অবদানকে উপেক্ষা করা হয়| গবেষণা বলছে শুধু হোমিওপ্যাথি না, অন্যান্য বিকল্প চিকিৎসা প্রদানের সাথে জড়িত অনেকের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়| যা হোক টিকা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে বিপরীত কোনো পরামর্শ হ্যানিম্যানের লেখায় পাওয়া যায় না|

কোনো কোনো ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথরা তথাকথিত 'হোমিওপ্যাথিক ভ্যাক্সিন' বা নোসোডস (Nosodes) ব্যবহার করেন| এই তথাকথিত ভ্যাক্সিনে রোগজীবাণু রয়েছে এমন দ্রব্য ব্যবহার করা হয়| যেমন বমি, পুঁজ, কোনো ক্ষরণ, কোষ বা মল ইত্যাদির অতিমাত্রায় লঘু দ্রবণ| মজার ব্যপার হচ্ছে নোসোডসকে আবার হোমিওপ্যাথির লঘুকরণের মূলনীতি অনুযায়ী তৈরি করা হয় না| একে 'Homeopathy' না বলে 'Isopathy' বললেই ভালো হয়| এ ধরনের হোমিও-প্রতিষেধকের কোনো কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় নি, বরং বিপরীতটারই প্রমাণ আছে| সুতরাং কোনো সচেতন ও নীতিবান চিকিৎসকের পক্ষে তার রোগীকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরীক্ষিত ও সফলতম আবিষ্কার টিকা নেবার বিরুদ্ধে উপদেশ দেয়া সম্ভব না| কিন্তু হোমিওপ্যাথরা রোগীকে সুস্প ষ্ট ক্ষতির মুখোমুখি করার দায়ভার প্রায়শই নির্বিকারভাবেই নিয়ে থাকেন|

কোনো প্রমাণিত ওষুধ ছাড়া তাদের প্রস্তাবিত নানা রোগের গ্যারান্টিযুক্ত চিকিৎসা, ক্যান্সার থেকে শুরু করে এইডস সর্বক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম চাতুরি ও রোগীদের বিশ্বাসপ্রবণতার উপর নির্ভরশীল| বহু প্রমাণিত রিপোর্ট বলছে হোমিওপ্যাথরা রোগীদের অসুস্থতায় কার্যকরী ওষুধের তথ্য উপস্থাপন না করায় বা বিকৃত উপস্থাপন করার প্রবণতায় আসলেই ক্ষতি করছে রোগীদের| সুতরাং আর যাই হোক না কেন কোনোভাবেই হোমিওপ্যাথিকে নিরাপদ চিকিৎসা-পদ্ধতি বলা যায় না|

কোনো সন্দেহ নেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যান্য পদ্ধতির মতো হোমিওপ্যাথি প্রশ্নেও নৈতিকতার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে| হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে গোড়াতেই প্রশ্নবিদ্ধ সেখানে বিশ্বাসপ্রবণ অসুস্থ মানুষকে হোমিও-চিকিৎসার পরীক্ষামূলক প্রকৃতির বিষয়টি না জানিয়ে চিকিৎসা করাটা অবশ্যই নৈতিক কোনো কাজ নয়| এবং এটা আরও বেশি অনৈতিক কাজ হয়ে দাঁড়ায় যখন রোগীর সেই অবস্থার জন্য কার্যকরী ও প্রমাণিত চিকিৎসা পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে| কোনো চিকিৎসকই জ্ঞানত ও নৈতিকভাবে কোনো রোগীর দুর্ভোগ বাড়াতে পারেন না| এই অধিকার কোনো চিকিৎসকেরই নেই| আর হোমিওপ্যাথরা যদি নিজেদের 'চিকিৎসক' বলে দাবি করেন তাহলে নীতিগতভাবে তাদেরও দায়িত্ব প্রয়োজনীয় গবেষণার মাধ্যমে তারা তাদের চিকিৎসার কার্যকারিতার ব্যাপারটি প্রমাণ করবেন যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে| নয়তো কোনো রোগীকে প্রমাণিত বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কোনো নৈতিক অধিকার তাদের নেই|

পরিশেষ

হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাগুলোর একটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় প্রায়ই| সেটি হলো হোমিওপ্যাথি এই যুগে আসলে ঠিক কি, সেটা সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা| কারণ হোমিওপ্যাথির অপবৈজ্ঞানিক চরিত্রের কারণে কোনো সুনির্দিষ্ট সর্বস্বীকৃত রূপ নেই| এজন্য বলা হয়ে থাকে '*There are as many homeopathies as there are homeopaths*'| এছাড়া হোমিওপ্যাথরা খোদ হোমিওপ্যাথির জনক হ্যানিম্যানের একক ব্যক্তির উপসর্গনির্ভর চিকিৎসার মূলনীতিটাকে অবজ্ঞা করেন যখন হোমিও-ওষুধের গণউৎপাদনকে উৎসাহিত করেছেন| হোমিওপ্যাথরা নিজেদেরকে স্ববিরোধিতা করেন যখন তারা বলেন-'অ্যালোপ্যাথি যখন উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা দেয় রোগীকে, হোমিওপ্যাথি তখন পুরো রোগীর চিকিৎসা করে' (treat the whole patients)| অথচ তাদের চিকিৎসানীতির মূল দর্শন হচ্ছে রোগীর উপসর্গ শনাক্ত করে উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা দেবার কথা|

হোমিওপ্যাথির সাথে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ অ্যাসপিরিনের উৎপত্তি ও ধারাবাহিকতার একটি মজার তুলনা করা যেতে পারে| বহু বছর ধরে মানুষ জানতো উইলো গাছের বাকল চিবালে ব্যাথা ও প্রদাহ (Inflammation) দূর হয়| এই গাছের বাকল থেকে অ্যাসপিরিনের সক্রিয় উপদানটি (যার আদি নাম 'Salicin') পৃথকীকরণ করা হয়েছিল ১৮২৩ সালে| অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের খুব বেশি দিন পরের ঘটনা নয়| ১৮৯৯ সালে স্যালিসিনের কার্যকরী উপাদান 'Acetylsalicylic acid' আবিষ্কৃত হয় এবং প্রথমবারের মতো ব্যাপকভাবে এর উৎপাদন ও বিপনন শুরু হয়| এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান জানতে পারে অ্যাসপিরিন আসলে কিভাবে কাজ করে| এই মূল তথ্যটি পুঁজি করে বিজ্ঞানীরা বহু ধরনের ব্যাথা ও প্রদাহে উপযোগী-উপকারী non-steroidal anti-inflammatory ওষুধ আবিষ্কার করেছেন| সেই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক আবিষ্কার হলো Cox-2 inhibitors| এই যাত্রায় অবদান অসংখ্য গবেষক-বিজ্ঞানীর নিরলস পরিশ্রম আর অনুসন্ধান| যা এখনো অব্যাহত আছে|

এবার হোমিওপ্যাথির কথা ভাবুন এর সমান্তরালে| গত দুইশত বছরে এমন একটি অসুস্থতা নেই যেখানে হোমিওপ্যাথি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে| কিভাবে হোমিওপ্যাথি কাজ করে সেটি এখনো অজানা| চিকিৎসার মূলনীতি, এর উদ্ভাবকের সেই সময়কাল থেকে এখনও অপরিবর্তিত এবং এর ব্যবহারকারীরা এর মূল ধারণার সাথে ব্যাখ্যাযোগ্য যুক্তিসঙ্গত কোনো কিছুই আর যোগ করতে পারেন নি| যদিও হোমিওপ্যাথিকে 'বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপদ্ধতি' হিসাবে দাবি করা হয়, কিন্তু সত্য হচ্ছে এটি আদৌ সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না| একটি মাত্র সাধারণ ব্যাখ্যাই হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা সম্বন্ধে বলা সম্ভবপর হয়েছে, সেটি হলো, এটি হচ্ছে একটি প্ল্যাসিবো বা বিশ্বাসপ্রবণতার উপর ভিত্তিশীল কল্পিত ওষুধ| এছাড়া কোনো

ব্যাখ্যাই এর চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না| যদি এটা শুধুমাত্র 'প্ল্যাসিবো' প্রভাব হয়ে থাকে তাহলে এর 'ওষুধ' কিভাবে কাজ করে সে সংক্রান্ত কোনো ভৌতপ্রক্রিয়া খুঁজে পাওয়ার আশা করা বৃথা|

আরো একবার মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন হোমিওপ্যাথির ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালগুলো প্রায়শ বিভ্রান্তিকর, হতাশাজনক এবং পুনঃপ্রমাণ করা সম্ভব নয় এমন ফলাফল সৃষ্টি করে| কারণ এই ট্রায়ালগুলো মূলত একটি প্ল্যাসিবোর সাথে আরেকটি প্ল্যাসিবোরই তুলনা করে মাত্র| অতিমাত্রায় লঘুকৃত হোমিও-ওষুধ 'নিরাপদ' হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ তারা শুধু পানি বা পানি-অ্যালকোহলের মিশ্রণ বা ল্যাকটোজের ট্যাবলেট| হোমিওপ্যাথরা নিঃসন্দেহে এর প্রতিবাদ করবেন, 'ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব' খুঁজে বেড়াবে কিন্তু আপাতত গবেষণার যে ফলাফল আমাদের চারপাশে রয়েছে, সেখানে এর চেয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আর নেই| যদি হোমিওপ্যাথি আসলেই কার্যকরী চিকিৎসা হিসাবে প্রমাণিত হত তাহলে কোনো বৈধ মূলধারার চিকিৎসকের পক্ষে একে উপেক্ষা করাটা যুক্তিসঙ্গত হতো না এবং তারা সেটা করতেনও না| এবং অবশ্যই এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন অতি লঘুমাত্রার ওষুধগুলো খুব সহজে আধুনিক চিকিৎসকরা গ্রহণ করে নিতেন যদি তারা আদৌ কার্যকরী হত| খোলা মনে প্রমাণিত কোনো কিছুকে গ্রহণ করা বিজ্ঞানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য| বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন কার্যকরী চিকিৎসার দ্রুত আত্মীকরণ খুব নিয়মিত একটি ব্যাপার| প্রচুর গবেষণা ও প্রমাণ করেছে মূলধারার চিকিৎসা-পদ্ধতির চিকিৎসকরা বিকল্পধারার চিকিৎসা-পদ্ধতির চিকিৎসকদের চেয়ে অনেক কম গোঁড়ামির পরিচয় দেন| বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক কার্ল সাগানের ভাষায় : '*...বিজ্ঞানের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান করছে একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি-যত অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক হোক না কেন যে কোনো নতুন ধারণাকে গ্রহণ করার মতো উদারতা ও পুরোনো কিংবা নতুন সকল ধারণাকে নির্বিশেষে অত্যন্ত দৃঢ় সন্দেহের সাথে পরীক্ষা করে দেখার মানসিকতা| আর এভাবেই গভীর কোনো অর্থহীন ধারণা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সত্যিকে পৃথক করা সম্ভব|*

হোমিওপ্যাথি কোনো না কোনোভাবে কাজ করে- তাদের এই প্রস্তাবিত হাইপোথিসিস বা অনুকল্পে কোন সমস্যা নেই| সেটা যতই ব্যাখ্যাতীত হোক না কেন| তবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই অনুকল্পের পরিবর্তন হওয়াটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়| হোমিও-চিকিৎসার সঠিক ট্রায়াল কিন্তু সহজেই করা সম্ভব| সেগুলো যেভাবেই রিভিউ বা মেটাঅ্যানালাইসিস হোক না কেন বা কোনো ভৌতপ্রক্রিয়ার প্রস্তাবনা করুক না কেন হোমিও-ওষুধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কখনোই কার্যকরী প্রমাণিত হয় নি| না মানুষের চিকিৎসায়, না পশুদের চিকিৎসায়| বিদ্যমান প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত ওষুধ বা চিকিৎসা-পদ্ধতি থেকে হোমিপ্যাথি কোনো অংশে বেশি কার্যকরী তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি|

প্রত্যেক চিকিৎসকই আত্মবিশ্বাসের সাথে তার চিকিৎসাসেবা সেবা দিতে চান| এবং তা করতে হলে তাকে তার ব্যবহারকৃত চিকিৎসা-পদ্ধতির উপর অবশ্যই বিশ্বাস থাকতে হবে| কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতির ভিত্তি হিসাবে শুধু 'বিশ্বাস' কখনোই বৈধ কোনো ভিত্তি হতে পারে না| উপরন্তু কেউ যদি তার মন বদলাতে চান তিনি কোনো পদ্ধতি 'সঠিক' বলে মনে করেন, সেজন্যও যথেষ্ট কারণ থাকতে হবে| অবশ্যই শুধুমাত্র 'বিশ্বাস' এখানে যথেষ্ট না| যারা বৈজ্ঞানিক ও নৈতিকতার সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগের সাথে জড়িত তারা তাদের রোগীদের উপর প্রয়োগকৃত যে কোনো ওষুধ বা চিকিৎসা-পদ্ধতির কার্যকারিতা ও নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ অবশ্যই দাবি করে থাকেন| সে কারণে প্রশ্নটা অমীমাংসিত থেকেই যায়, যদি হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা নিরাপদ আর কার্যকরী হয়েই থাকে তাহলে এই পদ্ধতির প্রয়োগকারী হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক এবং একে বিজ্ঞানসম্মত দাবি করার প্রস্তাবকরা কেনইবা অনিচ্ছুক কিংবা অক্ষম এটিকে কার্যকরী প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক পদ্ধতিগত ট্রায়াল ও গবেষণা করার ক্ষেত্রে?

তথ্যসূত্র

- Edzard Ernst (wikipedia) http://en.wikipedia.org/wiki/Edzard_Ernst (weKí wPwKrmv wb‡q Av‡b©‡÷i GKwU mvBU : http://www.guardian.co.uk/profile/edzardernst)
- Syed Masud Ahmed, Md Awlad Hossain, Ahmed Mushtaque Raja Chowdhury, Abbas Uddin Bhuiya. The health workforce crisis in Bangladesh: shortage, inappropriate skill-mix and inequitable distribution., Human Resources for Health 2011, 9:3 (http://www.human-resources-health.com/content/9/1/)
- Syed Masud Ahmed, Department of Public Health Science, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. *Explorong the health seeking behaviour of disadvantaged populations in Rural Bangladesh,*
- Wayne B. Jonas, Ted J. Kaptchuk, and Klaus Linde, A Critical Overview of Homeopathy. Ann Intern Med. 4 March 2003;138(5):393-399
- Barrett S. Homeopathy: Much Ado about little or nothing. Nutrition forum (1997);15.3 (May-June 1998):p17
- Edzard Ernst, Ted J. Kaptchuk, Homeopathy Revisited. Arch Intern Med. 1996;156(19):2162-2164.
- Barrett S. Homeopathy: the ultimate fake, Quackwatch, Quackwatch, retrieved 2007-07-25
- David W. Ramey, Mahlon Wagner, Robert H. Imrie, Victor Stenger. Homeopathy and Science: A closer look. (*To be published in The Technology Journal of the Franklin Institute)* http://www.colorado.edu/philosophy/vst enger/Medicine/Homeop.html)
- Irvine Loudon. A Brief History of Homeopathy. J R Soc Med. 2006 December; 99(12): 607–610.
- Maddox J, Randi J, Stewart WW. "High-dilution" experiments a delusion. Nature. 1988; 334; 287-91
- Ernst E. Homeopathy: what does the "best" evidence tell us? Med J Aust. 2010 Apr 19;192(8):458-60.
- Ernst E. Homeopathy, past present future. Br J Clin Pharmacol.1997; 44: 435–437.
- Linde, K., et al. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controled trials. The Lancet 1997; 350: 834-843
- Ernst E, Pittler MH. Re-analysis of previous meta-analysis of clinical trials of homeopathy. J Clin Epidemiol 2000; 53: 1188 (letter).
- E. Ernst.A systematic review of systematic reviews of homeopathy; Br J Clin Pharmacol 54, 577–582
- Barnes J, Resch KL, Ernst E. Homeopathy for postoperative ileus? A meta-analysis. J Clin Gastroenterol. 1997; 256; 28-33
- Barnes J, Resch KL, Ernst E. Homeopathy for Postoperative Ileus. J Clin Gastroenterol 1997; 25: 628–633.
- Vickers AJ, Smith C. Homeopathic oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenza–like syndromes. Cochrane Library 2001; 1: 1–10.
- Baum M, Ernst E (November 2009). Should we maintain an open mind about homeopathy. Am. J. Med. 122 (11): 973–4.
- Homeopathy (Homeowatch) (http://www.homeowatch.org/index.html)
- Homeopathy (Wikiperdia) (en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy)
- Homeopathy (Rational Wiki) (rationalwiki.org/wiki/Homeopathy)

কাজী মাহবুব হাসান : পেশায় চিকিৎসক ও গবেষক| প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন জনস্বাস্থ্য ও ভাইরোলজি বিষয়ে| অণুজীববিজ্ঞানে শিক্ষকতা করার মাধ্যমে তার কর্মজীবনের শুরু| ২০০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রবাসে আসার আগে জড়িত ছিলেন বাংলাদেশের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের 'অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ' কর্মসূচির সাথে| বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন কানাডার টরোন্টো শহরে অবস্থিত মাউন্ট সাইনাই হাসপাতাল কেন্দ্রিক টরোন্টো ইনভেসিভ ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ নেটওয়ার্কের বৃহত্তর টরোন্টো এলাকায় ইনফ্লুয়েঞ্জা সারভেইলেন্স-এ| লেখকের নিজস্ব ব্লগ সাইট হচ্ছে 'জীবনের বিজ্ঞান' : http://kmhb.wordpress.com|

জীবনের সূত্রপাত হলো কিভাবে?

ফ্রান্সিসকো আয়ালা
অনুবাদ : সিদ্ধার্থ কুমার ধর

অধিকাংশ জীববিজ্ঞানীই এই বিষয়ে এখন একমত যে আমাদের পৃথিবীতে কোটি কোটি বছর আগে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনের সূত্রপাত ঘটেছে| আর এটি হয়েছে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের মতো সেই একই রাসায়নিক পদার্থগুলো দ্বারা যেগুলো আজকের যুগের জীবেরাও বহন করে আসছে| বিজ্ঞানীরা আরো একমত পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল জীবই জীবনের একই উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে| বিজ্ঞানীরা এই বিষয়গুলো নিয়ে জানেন, তার মানে কী পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে এর আমরা সবকিছুই জেনে ফেলেছি? আসলে পুরোপুরি তা নয়| যদিও প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে বেশ কিছু ভাল ধারণা এবং পরীক্ষণযোগ্য ব্যাখ্যা রয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে, তবু আজ অবধি এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছানো যায় নি| বিজ্ঞানীরা বিপুল পরিমাণ প্রমাণ সংগ্রহ করে জানতে পেরেছেন পৃথিবীর প্রতিটি জীবই একই সাধারণ উৎস থেকে ক্রমবিকশিত হয়েছে| আমরা এই প্রশ্ন নিয়ে পরবর্তীতে কিছুটা আলোকপাত করবো| এখন দেখা যাক, প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানের পথে প্রধান বাধাগুলো কী কী|

প্রথমে আমরা যে প্রশ্নটি দিয়ে শুরু করতে পারি তা হল জীবন কি? সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চাইতে একটু অন্যভাবেই এই বিষয়ে আলোকপাত করি| আমরা জীবন বলতে যা বুঝি, দেখা যায় তার আসলে দুটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে| একটি হলো বংশগতি এবং অন্যটি বিপাকক্রিয়া| আমরা তো এটাও জানি কোষেরা নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করবার মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটায়| নতুন উৎপন্ন কোষগুলো তার মাতৃকোষের গঠনকারী অভিন্ন উপাদানগুলো বহন করে থাকে, তাই জীবনের ধারাবাহিকতাও বজায় থাকে| এই অভিন্ন উপাদানগুলো আসলে কী| এগুলো হচ্ছে কোষের মধ্যেকার উপাদান যাকে বলা যায় রাসায়নিক 'যন্ত্রপাতি', এদেরকে পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনাসমূহ, এবং কোষে নতুন কোনো রাসায়নিক উপাদান তৈরি হবে এবং সেটা কিভাবে কাজ করবে-এ জাতীয় তথ্যাবলী আবার এদের নিজেদের রাসায়নিক পদার্থগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে|

এই নির্দেশক রাসায়নিক উপাদানগুলোর সংশ্লেষণের জন্য কোষের মধ্যে রাসায়নিক 'যন্ত্রের' প্রয়োজন| এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এরকম, জীবকোষের মধ্যে রাসায়নিক 'যন্ত্রের' আগে উদ্ভব ঘটেছে নাকি নির্দেশনাগুলোর উদ্ভব আগে ঘটেছে?

এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে আমরা 'ডিম আগে না মুরগি আগে' নামক একটি বহুল প্রচারিত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি| আমরা তো জানি নির্দেশনাগুলো রাসায়নিক যন্ত্রাদি কিভাবে কাজ করবে তা বলে দেয়, কিন্তু রাসায়নিক যন্ত্রাদিগুলো ছাড়া নির্দেশনাগুলোর সংশ্লেষণও সম্ভব নয়| ধরা যাক একটি নথির অনুলিপি তৈরি করতে হবে| এ জন্য আমাদের একটি ফটোকপি মেশিনের প্রয়োজন| অথবা একটা কম্পিউটারের কথা ভাবি| কম্পি উটারের পরিচালনাসংক্রান্ত নির্দেশনাগুলো বহন করার জন্য হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন আর সফটওয়ারের প্রয়োজন রয়েছে নির্দেশনাগুলো পরিচালিত হবার জন্য| কিন্তু বাস্তব জীবনে কম্পিউটার তৈরির নির্দেশনাগুলো সফটওয়ার বহন করে থাকে|

জীবকোষে ডিএনএ (ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক এসিড) এবং আরএনএ (রাইবোনিউক্লিয়িক এসিড) অণু হলো তথ্যবহনকারী গাঠনিক-উপাদান| ডিএনএ আর আরএনএ'র তন্তুগুলো চার ধরনের রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত হয়েছে| যেমন ডিএনএ'তে রয়েছে A, T, C, G আর আরএনএ-তে A, C, G, U| মানে আরএনতে শুধু T'র বদলে রয়েছে U, আর বাকি সব উপাদান একই| আমাদের বংশগতির তথ্যগুলো এই চারটি উপাদানের ক্রমগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে| ঠিক যেভাবে ইংরেজি বর্ণমালা থেকে একাধিক বর্ণের নির্দিষ্ট ক্রম সাজিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট 'অর্থবোধক শব্দ' পাওয়া যায়| কোষের মধ্যেকার যে যন্ত্রগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া (বিপাকক্রিয়া) ঘটায় তাদের মধ্যে 'এনজাইম' (বাংলায় যাকে বলে 'উৎসেচক') রয়েছে| এনজাইমগুলো মূলত এক ধরনের প্রোটিন| এরা প্রায় নিখুঁতভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে পারে| এবং সত্যি বলতে মনুষ্য-সৃষ্ট যে কোন যন্ত্রের চেয়েও দ্রুত গতিতে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফেলতে পারে| আবার প্রোটিন হচ্ছে বিশটি বিভিন্ন রকমের উপাদানের লম্বা তন্তু দিয়ে তৈরি যাদেরকে 'অ্যামাইনো অ্যাসিড' বলা হয়|

একটি জীবকোষে অনেক ধরনের উপাদান আছে যেমন রয়েছে বিভিন্ন ধরনের হাজারো এনজাইম| এগুলো অত্যন্ত 'দক্ষতা' ও 'নৈপুণ্যের' সাথে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া পরিচালনা করে| এই এনজাইমগুলোর অনেকে আবার রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধাপগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করে দেয়| কোষের অভ্যন্তরীণ এই রাসায়নিক কার্যক্রমকে চিত্রের সাথে তুলে ধরতে চাইলে তা অত্যন্ত জটিল এবং বৃহৎ জালের মতোই দেখায়| যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্রকে যেভাবে দেখা যাবে| আমেরিকাতে রয়েছে আন্তঃপ্রদেশীয় এবং প্রাদেশিক সড়ক-মহাসড়ক, সব ধরনের আনুষাঙ্গিক সড়ক, বিকল্প সড়ক, ড্রাইভওয়ে ও সংযোগ সড়ক| এদের সাথে আরও যোগ হবে তেলের খনি, তেল শোধনাগার ও গ্যাস-স্টেশন, মোটরগাড়ি, ট্রাক, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন এবং কারখানাগুলো যেখানে এগুলো তৈরি করা হয়| আরও রয়েছে নদী, জলপথ, সমুদ্রবন্দর এবং সব ধরনের নৌকা ও বিমানবন্দর, আকাশপথ, উড়োজাহাজ এবং এদের নির্মাণকারী

কারখানা| আমেরিকার অত্যন্ত জটিল এই যোগাযোগব্যবস্থা নিঃসন্দেহে কোষের অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক উপাদান ও প্রক্রিয়াগুলোর বিস্তীর্ণ জালিকা থেকে বেশি জটিল নয়|

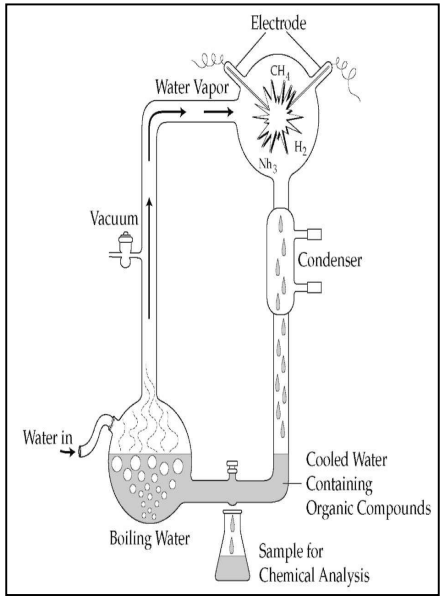

প্রাণের উৎস নিয়ে স্ট্যানলি মিলারের

এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগব্যবস্থার সূত্রপাত কিভাবে ঘটলো, এই প্রশ্নটির উত্তর চিন্তা করুন| সম্ভবত আমরা প্রথমে চিন্তা করবো গ্রামের সাধারণ মেঠোপথের কথা, যেগুলো পরবর্তীতে পশু ও মালবাহী গাড়ি চলাচলে উপযোগী কাঁচাপাকা রাস্তায় পরিণত হয়েছে| কিন্তু আজকের যুগে এটা হয়তো নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন হবে সর্বপ্রথম মেঠোপথগুলো কোথায় তৈরি হয়েছিল, কোন কোন গ্রাম বা শহরগুলোকে এগুলো সংযুক্ত করেছিল এবং এদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো কি ছিল? আমরা এটা জানি উত্তর আমেরিকার প্রথমদিকের মেঠোপথগুলো তৈরি হয়েছিল কয়েক হাজার বছর পূর্বে| অপরদিকে পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল হাজার মিলিয়ন বছর পূর্বে| সুতরাং কিভাবে জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল তা নির্ধারণ করা আরো অনেক বেশি কঠিন কাজ|

জীবনের উদ্ভব কিভাবে হলো তা বুঝতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে সরল প্রাণের গঠনকারী আদিম উপাদানগুলোকে শনাক্ত করতে হবে| আগে যেমনটা বলা হয়েছে এক্ষেত্রে আমাদের 'ডিম আগে না মুরগি আগে' নামক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়| আমাদের প্রয়োজন ডিএনএ-আরএনএ'র মতো তথ্যবহনকারী অণু, যেগুলো কোন এনজাইমকে সংশ্লেষ করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে সে 'তথ্য' মাতৃকোষ থেকে ভূমিষ্টকোষে বহন করে নিয়ে যায়| কিন্তু এই ডিএনএ বা আরএনএ অণুগুলোকে সংশ্লেষণের প্রয়োজন| যার জন্য আমাদের প্রয়োজন বিপাকক্রিয়া এবং জীবন্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া|

কম্পিউটারের উপমায় আবার ফিরে যাওয়া যাক| বাস্তবে একটি কম্পিউটার তৈরির নির্দেশনা সফটওয়্যারের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু এই সফটওয়্যার (ধরে নিলাম 'বংশগতির উপাদান') আবার কম্পিউটার (ধরে নিলাম 'বিপাকক্রিয়া পরিচালনকারী যন্ত্র') ছাড়া পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়| তাই একবার কম্পিউটার অস্তিত্বশীল হয়ে গেলে আর কোনো সমস্যা থাকে না| সমস্যাটা হলো প্রথম কম্পিউটারটিকে কিভাবে পাওয়া যাবে|

১৯৫৩ সালে শিকাগো ইউনিভার্সিটির রসায়ন বিভাগের স্নাতকবর্ষীয় ছাত্র স্ট্যানলি মিলার একটি বায়ুনিরোধক কাঁচের

পাত্রে পৃথিবীর জন্মলগ্নের পরবর্তী সময়কার অনুরূপ একটি কৃত্রিম পরিস্থিতির অবতারণা করেন| তিনি এতে কিছু অজৈব যৌগ যেমন, অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন গ্যাস ও জলীয়বাষ্প যোগ করেন এবং বিদ্যুৎ ক্ষরণের মাধ্যমে বজ্রবিদ্যুতের সৃষ্টি করেন| এক সপ্তাহ পর প্রাকৃতিকভাবে একমাত্র জীবদেহে প্রাপ্ত অ্যামাইনো এসিড এবং ইউরিয়ার মতো উপাদান এই পরীক্ষাসম্পন্নকারী ৫ লিটারের কাঁচপাত্রে পাওয়া গেল| এ থেকে মিলার দাবি করলেন এনজাইমের প্রভাব ছাড়াই জৈব-যৌগ তৈরি হতে পারে| আদিম পৃথিবীর সাথে আরো সাদৃশ্যপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করে চালানো পরবর্তী পরীক্ষাগুলো নিশ্চিত করেছে যে, সাধারণ জৈব-যৌগসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হতে পারে| অসংখ্য পরীক্ষার পর এই সম্ভাবনাটি বর্তমানে স্বীকৃত হয়েছে| এর পিছনে আরও কারণ হলো পৃথিবীতে আঘাতকারী উল্কাপিণ্ড, ধূমকেতু এবং মহাজাগতিক ধূলিমেঘেও এই সাধারণ জৈব-যৌগগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে|

যে প্রশ্নটি রয়ে গেল তা হল, এই গঠনকারী উপাদানগুলো কিভাবে একত্রিত হয়ে এনজাইম, ডিএনএ, সজীবকোষের মতো আরো জটিলতর অণুতে পরিণত হলো| একটি সুবিধাজনক চিত্রকল্প হলো যে, পৃথিবী যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়ে মহাসাগর সৃষ্টি হবার উপযোগী হয়ে উঠে| মিলার এবং অন্যান্যদের পরীক্ষায় জৈব-অণুর এক ধরনের স্যুপ (আদিম স্যুপ) তৈরি হয়| একে যদি যথেষ্ট সময় প্রদান করা হয় (মিলিয়ন বছর সময় হাতে ছিল), তাহলে অণুদের কিছু নির্দিষ্ট সংযোগ সৃষ্টি হবে| এদের অনেকগুলো আবার অন্যদের তুলনায় বেশিদিন টিকে থাকতে সফল হবে| এর ফলে স্বীয় প্রতিলিপিকরণে সক্ষম কিছু গঠনের সৃষ্টি হবে যাদের থেকে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল বলে আজ আমরা জানি|

ডিম এবং মুরগির সমস্যাটি এখনও রয়ে গেল| জীবনের ধারাবাহিকতা অর্থাৎ বংশগতির উপাদানসমূহ যেগুলো এনজাইমের সংশ্লেষণ নির্দেশনার মাধ্যমে প্রাণ ধারণের প্রক্রিয়াগুলোকে পরিচালনা করে, এনজাইম সৃষ্টির পূর্বে এদেরকে আমরা কিভাবে পেলাম| ১৯৮০ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটলো যখন থমাস আর. চেক এবং সিডনি আল্টম্যান পৃথকভাবে আবিষ্কার করলেন যে, কিছু আরএনএ-অণুর রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুঘটনের সক্ষমতা রয়েছে যারা আবার নিজেদের সংশ্লেষণ ঘটাতেও সক্ষম| এ আবিষ্কারের জন্য তারা ১৯৮৯ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন| এই আবিষ্কারটি 'ডিম ও মুরগি'র সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল| এখান থেকে জানা গেছে, আরএনএ অণুগুলো রাইবোসোমে পরিবর্তিত হয়ে বংশগতি এবং বিপাকক্রিয়া উভয়ই সম্পন্ন করতে পারে যেগুলো কিনা মূলত দুটি ভিন্ন অণু ডিএনএ ও প্রোটিন দ্বারা বর্তমানকালের জীবগুলিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে| অনেক বিজ্ঞানীই এখন বিশ্বাস করেন যে, প্রাণ একটি আরএনএ-প্রভাবাধীন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে যাকে 'আরএনএ-বিশ্ব' বলা

হয়ে থাকে| এটি বর্তমান ডিএনএ জগতের পূর্বসুরি, যেখানে জৈবিক বংশগতি ডিএনএ অণুগুলোর মধ্যেই সর্বদা সংরক্ষিত থাকে|

আদিম পৃথিবীতে রাইবোসোমের ভূমিকা পালনকারী আরএনএ অণুগুলো কিভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হয়ে আরএনএ জগতের জন্ম দিয়েছে তা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে জোর গবেষণা চলছে| অন্যান্য আরএনএ-অণুগুলোর মতোই রাইবোসোমের A, C, G, U দ্বারা নির্দেশিত চার ধরনের নিউক্লিওটাইড রয়েছে যাদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে| রাইবোসোমের খুব সীমিত সংখ্যক নিউক্লিওটাইড রয়েছে, দুই ডজনের মতো| কিন্তু নিউক্লিওটাইডগুলোর নিজেদের গঠন আবার সরল নয়| এরা তিনটি আণুবীক্ষণিক উপাদান দ্বারা তৈরি| একটি রাইবোস সুগার, ফসফেট এবং অন্যটি নাইট্রোজেন বেস| এই নাইট্রোজেন বেসই একমাত্র উপাদান যেটি নিউক্লিওটাইড ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে| চার ধরনের নাইট্রোজেন বেস রয়েছে যেগুলো A, C, G, U নিউক্লিওটাইডগুলোকে নির্দেশ করে থাকে| বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিকসময়ে দেখিয়েছেন যে, রাইবোস সুগার কিভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে C এবং U নাইট্রোজেন বেসের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, যেটি সবচেয়ে 'কঠিন ধাপ' বলে বিবেচিত হয়|

আরএনএ অণুগুলো যেগুলো নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করে বংশবিস্তার করতে পারে, নতুন আরএন অণুগুলোর সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে এরা কিছু ক্ষেত্রে 'ভুল' করে থাকে, যাকে আমরা মিউটেশন বলে থাকি| এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে যা আরও ব্যাপক আণবিক জটিলতা তৈরির মাধ্যমে কোষের জন্ম দেয়, প্রথমে ব্যাকটেরিয়ায় প্রাপ্ত সরল কোষ এবং পরবর্তীতে প্রাণী, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রকৃতকোষী জীবের অপেক্ষাকৃত উন্নত কোষ| প্রাকৃতিক নির্বাচন হলো বংশগতির বিকল্প প্রকরণগুলোর (variant) পৃথক বংশবৃদ্ধি| আদিম কোষগুলো যখন বংশবৃদ্ধির সক্ষমতা অর্জন করলো, তাদের মধ্যে কিছু কোষ অন্যদের তুলনায় আরও নিখুঁতভাবে প্রজনন করতে লাগলো| অপেক্ষাকৃত কম নিখুঁতভাবে প্রজননকারী কোষদের বিলুপ্তির বিপরীতে এই নিখুঁতভাবে প্রজননকারী কোষগুলোর বৈশিষ্ট্যের বৃদ্ধি পাবে| এর পেছনের যুক্তি হল যে, সেসব কোষ বেশি নিখুঁতভাবে প্রজনন করতে পারবে যাদের সঠিক বংশগতি রয়েছে এবং যারা আরো দক্ষভাবে বিপাকক্রিয়া ঘটায়|

সুতরাং আমরা কি জানি, কিভাবে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল? না, আমরা জানি না| আমরা যা জানি তা হলো প্রাণের অনুপস্থিতিতে আদিম পৃথিবীর সম্ভাব্য পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জৈব-পদার্থের উদ্ভব ঘটতে পারে যাদের অনেকগুলো জীবনের মৌলিক গঠনকারী উপাদান| এদের মধ্যে রয়েছে নিউক্লিয়িক এসিড যারা বংশগতি ধারণ করে এবং বিপাকক্রিয়ার জন্য দায়ী এনজাইমসমূহ| উদাহরণস্বরূপ প্রোটিনগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে সকল জীবন্ত প্রক্রিয়াগুলোকে সচল রাখে| প্রাণের উদ্ভব

পেছনে কোন 'অলৌকিক সত্তা' প্রয়োজন হয়েছিল, এটি ভাবার কোন কারণ নেই|

যোগাযোগ ব্যবস্থার উদাহরণে আবার ফিরে যাওয়া যাক| আমরা এখন জানি, প্রথমদিকের মেঠোপথগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছিল এবং উন্নত রাস্তাগুলো এদের থেকে কিভাবে বিকশিত হয়েছে| কিন্তু আমরা জানি না প্রথমদিকের মেঠোপথগুলো কোথায় তৈরি হয়েছিল কিংবা তারা ঠিক কিভাবে তৈরি হয়েছিল| আমরা আরো জানি পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব একবারই ঘটেছিল, অথবা যদি একের অধিকবার উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে একটি বাদে বাকি সবগুলোই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে|

আমরা জানি সকল জীবিত প্রাণীই একই সাধারণ উৎস থেকে বিকশিত হয়েছে| কারণ পৃথিবীতে বর্তমানে বসবাসকারী প্রতিটি জীব কতগুলো অভিন্ন সাধারণ মৌলিক প্রক্রিয়াগুলোতে জীবন ধারণ করে, যেগুলো শুধুমাত্র একটি উৎস থেকেই উদ্ভব হতে পারে| ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য আণুবীক্ষণিক জীব থেকে শুরু করে প্রাণী, উদ্ভিদ এবং ছত্রাক তথা সকল জীব কতগুলো অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী| এই বৈশিষ্ট্যগুলোর তালিকা বিশাল এবং ভিন্ন আকৃতিগঠন লাভের পরও সকল জীবেই এদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান|

আমরা এই তালিকাটি শুরু করতে পারি সকল জীবেই বিদ্যমান বংশগতির উপাদান ডিএনএ দিয়ে| অন্যান্য নিউক্লিওটাইডের রাসায়নিক সম্ভাব্যতা থাকা সত্ত্বেও এরা সর্বদাই অভিন্ন চারটি নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত হয়| প্রতিটির জীবদেহের হাজারো সংখ্যক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রোটিনগুলো বিশটি অ্যামাইনো এসিডের দৈর্ঘ্যের প্রকরণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে সংশে-ষিত হয়েছে| সকল প্রোটিন এবং সকল জীবে এই অ্যামাইনো এসিডগুলো অভিন্ন| যদিও প্রকৃতিতে আরো শতাধিক অ্যামাইনো এসিডের অস্তিত্ব রয়েছে| যে জটিল যন্ত্রাদির মাধ্যমে বংশগতির তথ্যগুলো নিউক্লিয়াস থেকে কোষের মূল দেহে পৌঁছায়, তা সকল জীবের ক্ষেত্রে একই| ডিএনএতে অবস্থিত নিউক্লিওটাইডের ক্রমগুলো পূরকের ভূমিকা পালনকারী আরএনএর প্রতিলিপি ক্রমে পরিণত হয় (messenger RNA), যা অ্যামাইনো এসিডের নির্দিষ্ট কিছু ক্রমে 'অনুবাদিত' হয়, যে-গুলো জীবনের প্রক্রিয়ায় পরিচালনকারী প্রোটিন এবং এনজাইমগুলো তৈরি করে| এই অনুবাদে নির্দিষ্ট সংখ্যক আরএনএ-অণু (transfer RNA) এবং আরএন প্রোটিন যৌগসমূহ (ৎরনড়ংড়সব) ব্যবহৃত হয়, যেগুলো বিশ্বজনীনভাবে অভিন্ন| জেনেটিক যে শব্দভাণ্ডার ডিএনএ ক্রম থেকে অ্যামাইনো এসিড ক্রমকে অনুবাদ করে দেয়, সেটিও বিশ্বজনীনভাবে অভিন্ন| জীবনের বিশ্বজনীনভাবে অভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে| জীবনের ঐক্য থেকে সকল জীবের বংশগতির ক্রমান্বয়িকতা ও একই সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভবের প্রমাণ মেলে|

সৌরজগতে সম্ভবত পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে বর্তমানে প্রাণের অস্তিত্ব বিরাজমান| আমাদের ছায়াপথে প্রায় ১০০ বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে, যাদের অনেকগুলোর নিজস্ব সৌরজগত রয়েছে| এছাড়া সমগ্র মহাবিশ্বে প্রায় ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে| ফলে খুব সম্ভবত মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে| যদি তাপমাত্রা, রাসায়নিক মিশ্রণ এবং জীবনের জন্য উপযোগী অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে তবে সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে কিছু গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে, হয়তো তারা সংখ্যায় অসংখ্য| গ্যালাক্সি, নক্ষত্র এবং গ্রহের অপরিমেয় সংখ্যা থেকে বিচার করলে তা সম্ভব বলেই মনে হয়| পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটে কারণ আমাদের গ্রহে প্রাণের উপযোগী পরিবেশ রয়েছে| অনুরূপ পরিবেশে এবং অনেক যুগ পরে, অন্যান্য গ্রহেও সম্ভবত প্রাণের উদ্ভব ঘটবে|

অন্য কোথাও যদি প্রাণের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে তা উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হবে না, যা থেকে বোঝা যায় পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব স্বতন্ত্র ও অদ্বিতীয়| এমনও হতে পারে যে মৌলিক উপাদানগুলোও ভিন্ন| কার্বন ছাড়াও সিলিকন মৌলটিও হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং অন্যান্য উপাদানের সাথে যুক্ত হয়ে জীবনের প্রাথমিক উপাদানগুলো গড়ে তুলতে পারে| এমনও ঘটতে পারে যে, কয়েক দশক কিংবা কয়েক শতাব্দী পরে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করবে| নিশ্চিতভাবে তারা তখন পৃথিবীতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী প্রাণের উদ্ভব কিভাবে ঘটল সে সম্পর্কে আমাদের থেকে আরো বেশি জানতে পারবে|

ফ্রান্সিসকো জে. আয়ালা : আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেশ ও বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক| পিএইচ.ডি করেছেন প্রসিদ্ধ জীববিজ্ঞানী থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কির অধীনে| বিজ্ঞানী মহলে অধ্যাপক আয়ালা 'ডারউনীয় বিবর্তনের রেনেসাঁস মানুষ' বলে পরিচিত| বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসূচির জন্য লেখালেখি ছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে বিবর্তনকে সহজবোধ্য ভাষায় বোঝানোর জন্য প্রচুর সংখ্যক বই লিখেছেন নিরলসভাবে| আলোচ্য প্রবন্ধটি অ্যাপক আয়ালা'র বই '*Am I a Monkey?: Six Big Questions about Evolution*'-এর (২০১০) পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ| [প্রবন্ধটি অনুবাদে অধ্যাপক আয়ালা ও প্রকাশক দ্যা জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদান করায় বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি|]

সিদ্ধার্থ কুমার ধর : শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়| সদস্য, *বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল*|

হারুন ইয়াহিয়া : চকচক করলেই সোনা হয় না!

অনন্ত বিজয় দাশ

১.

ডারউইন যখন (১৮৫৯ সালে) জীববিবর্তনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন, তখন হয়তো তিনি নিজেও কল্পনা করতে পারেন নি কালের পরিক্রমায় তার এই তত্ত্বটি এতোটা বিকৃতি আর নিন্দার মুখে পড়তে পারে| যদিও রক্ষণশীলদের আক্রমণের মুখে '*অরিজিন অব স্পিসিজ*' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে লিখেছিলেন :

> "*এ বইয়ে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি কেন একজন ব্যক্তির ধর্মানুভূতিতে আঘাত করবে তার কোনো উপযুক্ত কারণ আমি খুঁজে পাই না| কিন্তু এটাও জানি মানবসভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম (নিউটনের) 'অভিকর্ষ সূত্রে'র বিরোধিতা করেছিলেন ফরাসি দার্শনিক লাইবনিজ| তাঁর ভাষ্যে এটি নাকি 'ঐশীবাদী ধর্মের বিরুদ্ধে নাশকতা'| ...*"

অরিজিন অব স্পিসিজ বই প্রকাশের দেড়শ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে| ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বটি ইতোমধ্যে বহুভাবে প্রমাণিত|* বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে জীববিজ্ঞান বোঝার ক্ষেত্রে 'বিবর্তন' একটি আবশ্যিক বিষয় হয়ে উঠেছে| তথাপি বিভিন্ন দেশে 'বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান'কে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে উঠে নি সাধারণ মানুষের মধ্যে| এর একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাসবোধের প্রতি কূপমুণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গি আর জীববিবর্তন নিয়ে দুনিয়া জুড়ে বিজ্ঞানবিরোধীদের মিথ্যা প্রচারণা| বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, জৈবপ্রযুক্তি, প্রতিরক্ষাখাতের বিজ্ঞান ও এর বাস্তবতা ইত্যাদি বিষয় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তেমন একটা আপত্তি দেখা যায় না, কিন্তু বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের আবিষ্কার ও এর বাস্তবতা মেনে নিতে অনেকের মধ্যে আপত্তি ফুটে উঠে|

ডারউইনীয় জীববিবর্তন সম্পর্কে যারা অবগত আছেন তারা জানেন বিজ্ঞানের আর কোনো শাখা বা বিষয়ের প্রতি ধর্মবাদীদের

---

* ডারউইনের জন্মদ্বিশত বার্ষিকী এবং *অরিজিন অব স্পিসিজ* বইয়ের দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে অবসর প্রকাশন থেকে অনন্ত বিজয় দাশ সম্পাদিত *ডারউইন : একুশ শতকে প্রাসঙ্গিকতা এবং ভাবনা* (২০১১) বইটি দ্রষ্টব্য|

এতোটা বিদ্বেষ-ঘৃণা-কুৎসা রটনা লক্ষ্য করা যায় না| যদিও সত্য হচ্ছে বিবর্তনের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই| দ্বন্দ্বও নেই সরাসরি| এটি নিউটনীয় ফিজিক্স কিংবা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মতো বিজ্ঞানের একটি বিষয়| কিন্তু আমাদের জীবন-জগতের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ এই বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করে তুলতে চীনের প্রাচীরের মত দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞানবিরোধী কতিপয় গোষ্ঠী| ডারউইনের সময়কাল থেকে এই প্রবণতা কিছু রক্ষণশীল খ্রিস্টানের মধ্যে থাকলেও বিগত কয়েক দশক ধরে হিন্দু-মুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীর রক্ষণশীল ধর্মবাদীদের মধ্যেও তা ফুটে উঠেছে|

২.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যেমন উত্তরোত্তর উন্নয়ন আর প্রসার ঘটছে ঠিক একই সময়ে আমরা লক্ষ্য করি বিজ্ঞান-বিরোধী প্রচারণা আর ছদ্মবিজ্ঞানের কারসাজি বিভিন্ন রূপে হাজির করা হচ্ছে| এ যেন প্রদীপের নিচে অন্ধকার! শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে আমেরিকাতে বিবর্তনের বিরুদ্ধে জোর প্রোপাগান্ডা চালায় খ্রিস্টান মৌলবাদীরা| ইউরোপে এরা এতোটা শক্তিশালী নয়| গত শতাব্দীর ৮০-এর দশক থেকে মুসলিম বিশ্বেও এই ধরনের তৎপরতা শুরু হয়েছে| প্রজাতির উৎপত্তি বা বিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চর্চা তেমন একটা ছিল না মুসলিম-প্রধান দেশগুলিতে| এসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বা জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণায় বিষয় হিসেবে 'ডারউইনীয় বিবর্তন' উহ্যই ছিল বলা যায়| এবং শত বছর ধরে পাঠ্যক্রমে সৃষ্টিবাদী ধারণার প্রাধান্য ছিল বেশি|

ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিসিজ* বইয়ের পাঁচটি অধ্যায় প্রথমবারের মতো আরবিতে অনুবাদ করেন মিশরের (কায়রো) ইসমাইল মাজহার (সহযোগিতায় ইয়াকুব সেরুউফ) ১৯১৮ সালে| পরের চারটি অধ্যায় অনুবাদ করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে; এবং ১৯৬৪ সালে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে আরবিতে '*অরিজিন অব স্পিসিজ*' বইটি প্রকাশিত হয় কায়রো থেকে|

আমরা যদি একটু পেছনের দিকে তাকাই তাহলে দেখি বহু পূর্বে তিউনেশীয় বংশোদ্ভূত মনীষী ইবনে খালেদুন (১৩৩২-১৪০৬) জীবজগৎ উদ্ভবের পেছনে বিবর্তনীয় ধারণার কথা কিছুটা ভাসা ভাসা হলেও ইঙ্গিত করেছেন| তিনি সৃষ্টিকর্তার অবদানের কথা স্বীকার করেও বলেছেন জীবনের উৎপত্তি হয়েছে খনিজ উপাদান থেকে| এরপর বিবর্তিত হয়েছে উদ্ভিদরাজি এবং সেখানে থেকে প্রাণীকুল|

খালেদুনের ভাষায় :

> " It should be known that we— May God guide you and us— notice that this world with all the created things in it has a certain order and a solid construction. It shows nexuses between causes and things caused, combinations of some parts of creation with others, and transformations of some existent things into others, in a pattern that is both remarkable and endless. ...Each one of the elements is prepared. It started out from minerals and progressed,

in an ingenious, gradual manner, to plants and animals. The last stage of minerals is connected with the first stage of plants...The last stage of plants is connected with the first stage of animals. ... The word "connection" with regard to these created things means that the last stage of each group is fully prepared to become the first stage of the next group..." [দ্রষ্টব্য : Ibn Khaldun AR. *The Muqaddimah. An introduction to history*, vol 1. Rosenthal F, translator. London: Routledge & Kegan Paul, 1967, pp 194-5]

মধ্যযুগের গুটিকয়েক দার্শনিকের মধ্যে ইবনে খালেদুন একজন, যিনি মানুষের উৎপত্তি 'এপ' (নরবানর) থেকে হয়েছে বলে মতপ্রকাশ করেছিলেন :

The animal world then widens, its species become numerous, and in a gradual process of creation, it finally leads to man, who is able to think and to reflect. The higher stage of man is reached from the world of monkeys, in which both sagacity and perception are found, but has not reached the stage of actual reflection and thinking. At this point we come to the first stage of man after the world of monkeys. This is as far as our physical observation extends. [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৫]|

ডারউইন যুগে ইসলামি চিন্তাবিদ আল-আফগানি (১৮৩৯-১৮৯৭) প্রথমে বিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতা করলেও পরবর্তীতে '*Khatirat Jamal ad-Din al-Afghani*' বইয়ে প্রাণের উৎপত্তি, জীবজগতে বিবর্তনের গুরুত্ব মেনে নিয়েছিলেন| মুসলমানদের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছিলেন তারাও যেন এই তত্ত্বটি বুঝে নেয়| তবে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর মধ্যে আপত্তি ছিল| তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের আত্মা আছে অন্য পশুপাখিদের সেটা নেই| তাই পশুপাখিরা বিবর্তিত হলেও মানুষ বিবর্তনের ফসল নয়|

যাহোক, আল-আফগানির মতো সকলের সৌভাগ্য ছিল না| ১৮৭৩ সালের দিকে তুর্কি সাংবাদিক ও লেখক আহমেদ মিতহাত ইফেনদি তাঁর লেখায় ডারউইনের বিবর্তন নিয়ে আলোকপাত করেছিলেন| এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মুসলিম ধর্মীয় নেতারা ইফেনদির বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন| 'নাস্তিক' হিসেবে অভিহিত করেন|

বিংশ শতাব্দীতে এসে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর থেকে ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব ও সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা অনেকাংশে কমে গেছে| তার বদলে জায়গা নিয়েছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পশ্চিমা রাষ্ট্রনীতির ধারণা| তথাপি অনেক ইসলামি নেতা বিশ্বাস করেছেন জীবজগতে 'বিবর্তন' প্রক্রিয়ার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই| একমাত্র ঐশী নির্দেশ ব্যতীত জীবনের কোনো বিকাশ ঘটে না| কোরান শরিফে 'বিশেষ সৃষ্টিবাদে'র কথা বলা হয়েছে| সুনির্দিষ্ট করে মানুষের সৃষ্টি নিয়ে বলা হয়েছে| প্রজাতির উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে তারা পুরোপুরি ভুল মনে করেন| অনেক মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে-'ডারউইনীয় বিবর্তন একটা ভুল থিওরি| এটা ধর্ম ও নৈতিকতা ধ্বংসের পশ্চিমা ষড়যন্ত্র|'

৩.

খোদ আমেরিকাতে রক্ষণশীল খ্রিস্টানেরা ডারউইনীয় বিবর্তনকে

'ধর্মবিরোধী' বলে মনে করেন| আশ্চর্যজনক হলেও সত্য অনেকগুলো জরিপ থেকে দেখা গেছে অর্ধেকের চেয়ে বেশি আমেরিকান

বিশ্বাস করেন 'মানুষ বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয় নি| মাত্র দশ হাজার বছর আগে মানুষ তার বর্তমান কাঠামোতেই সৃষ্টি হয়েছে|' জীববিজ্ঞান সম্পর্কে আমেরিকার গণচেতনায় বিশাল ঘাটতির সুযোগে রক্ষণশীল খ্রিস্টানেরা বাইবেলীয় সৃষ্টিবাদী ধারণাকে বিজ্ঞানের উপর চাপিয়ে দিতে চান, এবং ডারউইনীয় বিবর্তনকে তথাকথিত 'নৈতিকতা-বিধ্বংসী' বলে প্রচারণা চালান| সাম্প্রতিককালে এ রকম অবস্থা মুসলিম দেশগুলিতেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে| বিশেষ করে তুরস্কে| বিশ্বের হাতে গুনা কয়েকটি সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক হচ্ছে অন্যতম| মুসলিম দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক, শিল্পোন্নত ও ইউরোপঘেঁষা বলে যার পরিচিতি আছে| তুরস্কের ৯৯ ভাগ যদিও মুসলমান কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর মত 'অর্থোডক্স' ইসলামের চর্চা তুরস্কে দেখা যায় না| মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে যেমন শরিয়া আইন বলবৎ রয়েছে কিংবা রাষ্ট্র ও ধর্মকে এক করে ফেলা হয়েছে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে| কিন্তু তুরস্কে বরং সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ রয়েছে কোনো ধরনের ধর্মীয় আইন সরকার ও সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না| ইউরোপের অন্যান্য সেক্যুলার দেশগুলোর মত তুরস্কেও রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক রাখা হয়েছে তাদের সংবিধানের আর্টিকেল-২ ধারা অনুসারে [সংশোধিত ১৯৮২]|

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তুর্কির ধর্মতান্ত্রিক উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে| মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হয় ১৯২৩ সালে| নতুন প্রজাতন্ত্রী সরকার পুরানো ধর্মতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হটিয়ে দিয়ে সংস্কার কাজ শুরু করে| রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা থেকে ধর্মীয়-প্রভাব দূর করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে| যেমন নারীর সমান অধিকার রক্ষায় আইন করা হয়| শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের জন্য পূর্বের বাধ্যতামূলক ধর্মীয়শিক্ষাকে বাতিল করা হয়| পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলামি সৃষ্টিবাদের বর্ণনা বাদ দেয়া হয়| জীববিজ্ঞানে 'বিবর্তন' অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়| আতাতুর্ক নিজে মাধ্যমিক স্কুলের জনপ্রিয় পাঠ্যবই *ইতিহাস এবং সভ্যতার জ্ঞান*'র (*Tarih ve Medeni Bilgiler*) জন্য কয়েকটি অধ্যায় লিখে দিয়েছিলেন| ১৯২৮-১৯৪৮ সালের মধ্যে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমসাময়িক যত প্রসিদ্ধ বই রয়েছে যেমন কোয়ান্টাম থিওরি, আপেক্ষিকতা তত্ত্ব, বিবর্তন, বিশ্বসাহিত্য, আধুনিক ও চিরায়ত শিল্পের বইগুলোকে তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করা হয়| উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য তুরস্কের বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদদের ইউরোপে (বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মানিতে) প্রেরণ করা হয়| প্রশিক্ষণ শেষে তারা ফেরত এলে দেশের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের কাজে নিয়োগ দেয়া হয়| প্রার্থনার সময় কোরান পাঠের জন্য আরবি ভাষা ব্যবহারের প্রচলন উঠিয়ে নিজস্ব ভাষায় (তুর্কি ভাষায়) পড়ার নিয়ম চালু করা হয় যাতে সাধারণ জনগণ বুঝতে পারে তারা কি পাঠ করছে| কট্টরপন্থী কিছু ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এ সময় নিষিদ্ধ করা হয়| পূর্বের ধর্মভিত্তিক আইনগুলোর পরিবর্তন করে

ইউরোপীয় সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক আর্দশের ভিত্তিতে নতুন আইন প্রচলন করা হয়| মাত্র ১০ বছরের মাথায় দেশটির অভিনব পরিবর্তন ঘটে| বিশ্বজুড়ে নতুন পরিচিতি, নতুন আদর্শ| ১৯৩৮ সালে কামাল আতাতুর্ক যখন মৃত্যুবরণ করেন ইতোমধ্যে তুরস্কের সরকারি, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিশাল পরিবর্তনে অনেক দূর এগিয়ে যায়| বলতে গেলে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এ যাত্রা অব্যাহত থাকে| পরবর্তী সময়ে ডানপন্থী রক্ষণশীল রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় নেতারা জোট বাধেন| ধর্মতান্ত্রিক উসমানীয় সাম্রাজ্যের কথিত 'স্বর্ণযুগে' ফিরে যাবার আশায় তারা শক্তি সঞ্চয় শুরু করেন| ১৯৮০-এর দিকে ক্ষমতায় আসেন রক্ষণশীল সামরিক জান্তা কেনান ইভরেন| রাষ্ট্রপতি পদ অধিগ্রহণ করেন তিনি| তুরস্কের রাজনৈতিক অঙ্গনে মৌলবাদী এবং ইসলামপন্থীদের জন্য এই সময়টা একটা মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হয়| ১৯৮৩ সালে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী হন হালিল তুরগুত ওজাল| ওজাল নিজে কট্টরপন্থী ইসলামি সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন একসময়| (১৯৮৯ সালে প্রেসিডেন্ট ইভরেন পদত্যাগ করলে নতুন রাষ্ট্রপতি হন ওজাল| ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন তিনি|) এ সময়কালে তুরস্কের ধর্মভিত্তিক দলগুলোর পোয়াবারো অবস্থা তৈরি হয়| দীর্ঘদিন পরে রাষ্ট্রক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় তারা| সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংঘর্ষ বাধে মৌলবাদী দলগুলোর| এ সময় ভিন্নমতাবলম্বী হাজার-হাজার সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, পেশাজীবী, সাধারণ জনতা নিপীড়িত হয় মৌলবাদী ইসলামি দলগুলোর হাতে|

বিগক কয়েক দশক ধরে তুরস্কে বিজ্ঞানের জগতে ধর্মীয় হস্ত ক্ষেপের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য মুসলিম দেশ যেমন লেবানন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, মিশরের ধর্মবাতিকগ্রস্ত লোকদেরও আলোড়িত করছে| উৎসাহিত করেছে একই ধরনের কায়দাকানুন অনুসরণের| পশ্চিমের যেসব দেশে অধিকসংখ্যক অভিবাসী মুসলমান বাস করেন (যেমন যুক্তরাজ্য), তারাও অনেকে এখন জীববিজ্ঞানের ক্লাসে 'তুর্কি ধাঁচের' ইসলামি সৃষ্টিবাদ পড়ানোর দাবি তুলছেন|

উল্লেখ্য মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়া ইসলামি সৃষ্টিবাদ আসলে ইহুদি-খ্রিস্টানদের বাইবেলীয় সৃষ্টিবাদেরই 'মুসলিম ভার্সন'| কোরান নিজে ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থের ঐশীবাদিতা স্বীকার করে নিয়েছে| যদিও বাইবেলের জেনেসিসের মতো আদম-হাওয়ার বিস্তৃত বর্ণনা কোরানে নেই| বাইবেলের মত কোরানে ৬ দিনে আকাশ, পৃথিবী, প্রাণ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে| (দ্রষ্টব্য : সুরা আ'রাফ (৭), আয়াত ৫৫, সুরা ইউনুস (১০), আয়াত ৩)| কেরানের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ প্রথমে মাটি তৈরি করেন, তারপর পাহাড়-পর্বত, আলো, পশুপাখি এবং শেষে আদম| (দ্রষ্টব্য : সুরা হিজর (১৫), আয়াত ২৬-২৯, সুরা জুমার

(৩৯), আয়াত ৬, সুরা তাহা (২০), আয়াত ১১৬-১১৯, সুরা বাকারা (২), আয়াত ৩১-৩৬, সুরা আরাফ (৭), আয়াত ১৯)|

কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী আদমকে মাটি দিয়ে আল্লাহ তৈরি করেছেন| একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য অবশ্য রয়েছে| ইহুদি-খ্রিস্টানদের কোনো কোনো দল 'নবীন পৃথিবী'র (বাইবেল অনুসারে পৃথিবীর বয়স মাত্র ছয় হাজার বছর) ধারণায় বিশ্বাস করে| মুসলিম সৃষ্টিবাদীদের মধ্যে এই বিশ্বাস কিছুটা কম দেখা যায়| তারা 'প্রাচীন পৃথিবী'র সৃষ্টিবাদে বিশ্বাসী| কোরান শরিফে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কিত পরিপূর্ণ কোনো ধারণা তেমন পাওয়া যায় না| মুসলিম সৃষ্টিবাদীদের কেউ কেউ বলেন '*ভূতাত্ত্বিকরা পৃথিবীর বয়স সাড়ে চারশো কোটি বছর বের করেছেন| কোরান শরিফে যদিও ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে কিন্তু ঐ দিনগুলির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি|*

৪.

বিশ্বব্যাপী পরিচিত আমেরিকাভিত্তিক জরিপকারী সংস্থা হচ্ছে পিউ রিসার্চ সেন্টার| প্রতি বছর বিভিন্ন ইস্যুতে তারা আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জনমত যাচাই করে থাকে| কিছুদিন আগে (৩০ এপ্রিল, ২০১৩) পিউ রিসার্চ সেন্টার এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের ৩৯টি দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গণজরিপের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশ করেছে| গণজরিপের বিষয়ের মধ্যে ছিল শরিয়া আইন, নারীর অধিকার, পর্দা প্রথা, ধর্ম ও রাজনীতি, গণতন্ত্র, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক, ধর্ম ও বিজ্ঞান, আধুনিক সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে সম্পর্কে সাধারণ মুসলিম জনতার মতামত| জরিপের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে| পিউ রিসার্চ সেন্টারের প্রকাশিত এই রিপোর্টের নাম 'দ্যা ওয়ার্ল্ডস্ মুসলিমস্ : রিলিজিয়ন, পলিটিক্স এন্ড সোসাইটি'| রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনটি মহাদেশের প্রায় ৩৮ হাজার ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে| (আমাদের বাংলাদেশও এই জরিপের তালিকায় আছে|) পূর্বে এই গণজরিপের ফলাফল খণ্ডাংশ আকারে প্রকাশ পেয়েছে নানা সময়ে| তবে এবারই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে| আমাদের এই নিবন্ধের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপের কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা যেতে পারে|

জরিপে একটা বিষয় হচ্ছে ধর্ম ও আধুনিকতা| মালয়েশিয়া (২৩%) ও ইন্দোনেশিয়ার (২১%) জনতা ধর্ম ও আধুনিকতা পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মনে করেন| আরব বসন্তের সূচনা ঘটল যে দেশ থেকে, সেই তিউনিশিয়া ৫০ শতাংশ লোক দ্বন্দ্বের বিষয়টি স্বীকার করেছেন আর না বলেছেন ৪৬%| একই প্রশ্নের উত্তরে তুরস্কের ৩৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন আধুনিকতা ও ধর্মগ্রন্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, আর ৪৯ শতাংশ পূর্বের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন| আশ্চর্যজনক হলেও সত্য আমাদের

বাংলাদেশের ৫৯% শতাংশ লোক ধর্ম ও আধুনিকতার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন আর অস্বীকার করেছেন ৩৯%| মধ্য এশিয়ার দেশ তুরস্কে ৪০% লোক মত দিয়েছেন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে আর ৪৪% লোক তেমনটা মনে করেন না| দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের ফলাফলটি বেশ আকর্ষণীয়| দু'পক্ষেই সমান লোকের অবস্থান : ৪৫ বনাম ৪৫| পাকিস্তানের ২৭ ভাগ লোক মনে করেন ধর্ম ও বিজ্ঞানের বৈরিতা রয়েছে আর নেই বলে মত দিয়েছেন ৩৩ ভাগ| অথচ ৪১ ভাগ লোক কোনো মন্তব্য করেন নি বা তারা বিষয়টি সম্পর্কে জানেন না| মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকার মধ্যে লেবাননে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক ধর্ম ও বিজ্ঞানে বৈরিতা রয়েছে বলে জরিপে মতপ্রকাশ করেছেন| সংখ্যাটা হচ্ছে ৫৩ ভাগ| বিপক্ষে মত দিয়েছেন ৪৬ ভাগ| অথচ এই সংখ্যাটা সবচেয়ে কম ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে| মাত্র ১৪ ভাগ লোক ধর্ম ও বিজ্ঞানকে পরস্পরের বিরোধী বলে মনে করেন| বিপরীতে অবস্থান বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর| শতকরা ৭৮ ভাগ এমনটা মনে করেন না|

জীববিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ২২টি দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে| ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে ১৩টি দেশের শতকরা অর্ধেক সংখ্যক লোক জানিয়েছেন মানুষসহ অন্যান্য জীব সময়ের সাথে বিবর্তিত হয়| কিন্তু মধ্য এশিয়ার মধ্যে তুরস্কের অবস্থান সবচেয়ে নিচে| শতকরা ৩৫ ভাগ জনতা জীববিবর্তনকে (মানুষসহ সকল প্রাণীর) স্বীকার করেছেন| অস্বীকার করেছেন, মানে পৃথিবীর শুরু থেকে জীবেরা সবাই বর্তমান কাঠামোতেই ছিল বলে জানিয়েছেন ৪৯ শতাংশ| তুরস্কের উপরেই হচ্ছে তাজিখিস্তান| সে দেশের ৩৭% লোক জীববিবর্তনের প্রতি আস্থাশীল| আর না বলেছেন (অর্থাৎ জীবজগতের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া বিশ্বাস করেন না) ৫৫% জনগণ| অথচ পাশের আরেকটি দেশ কাজাখাস্তানের ৭৯% জনতা বিবর্তনকে স্বীকার করেছেন| সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে জীববিবর্তন মানেন না এমন সংখ্যা মোটে ১৬ শতাংশ| মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে লেবাননের জনগোষ্ঠীর মধ্যে জীববিবর্তন স্বীকার করেন এমন লোকের সংখ্যা সর্বাধিক| কমপক্ষে প্রতি দশজনের ছয় জন (৭৮%) লেবানিজ মানুষ ও অন্যান্য জীবের বিবর্তন স্বীকার করেন| এছাড়া ফিলিস্তিন (৬৭%), মরোক্কোর (৬৩%) জনগণ বিবর্তনকে স্বীকার করেন বলে পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপ থেকে জানা গেছে| প্রকৃতিতে বিবর্তন ঘটে না বলে জরিপে মত দিয়েছেন ওইসব দেশের এমন ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হচ্ছে ২১%, ২৮% ও ২৯%| অন্যদিকে জরিপকৃত দেশগুলোর মধ্যে ইরাকে সর্বোচ্চসংখ্যক ব্যক্তি বিবর্তনকে অস্বীকার করেছেন| ৬৭% ভাগ লোক বিবর্তনকে স্বীকার করেন না বলে মত দিয়েছেন| ফলে পিউ রিসার্চ সেন্টারের করা মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলোর তালিকায় ইরাকের অবস্থান সর্বনিম্নে| প্রসঙ্গত জীববিবর্তন স্বীকার করেন এমন ইরাকির সংখ্যা হচ্ছে শতকরা মাত্র ২৭ ভাগ| জীববিবর্তন প্রশ্নে জর্ডান ও তিউনিশিয়ার

নাগরিকদের মধ্যে বিভক্তি বেশ স্পষ্ট| প্রায় অর্ধেক সংখ্যক (৫২%) জর্ডানি জীববিবর্তন মানলেও অস্বীকার করেন এমন নাগরিকের সংখ্যা হচ্ছে ৪৭%| আর তিউনিশিয়ার শতকরা ৪৫ ভাগ লোক জীববিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করলেও ৩৬% লোক জানিয়েছেন মানুষসহ কোনো প্রাণীর বিবর্তন ঘটে নি| সব প্রাণী সর্বদা বর্তমান কাঠামোতেই রয়েছে| দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের জনগোষ্ঠীর ৫৪, ৩০ ও ২৬ শতাংশ জনতা জীববিবর্তন মানেন বলে মতপ্রকাশ করেছেন আর ক্রমান্বয়ে ৩৭, ৩৮ ও ৬২ শতাংশ জনতা জানাচ্ছেন তারা বিশ্বাস করেন জীবজগতে বিবর্তনের কোনো অস্তিত্ব নেই| জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকা আজকের ধর্মতন্ত্রে আচ্ছন্ন আফগানিস্তানের এই অবস্থান বিজ্ঞান-সচেতন লোকদের জন্য অবশ্যই আশাহতের এবং একই সাথে আশঙ্কাজনক|

৫.

ইদানীংকালে তুরস্ক যেন তার দীর্ঘদিনের বিজ্ঞানমনস্কতার ঐতিহ্য বাদ দিয়ে ইসলামি সৃষ্টিবাদীদের তীর্থস্থানে পরিণত হচ্ছে| এই নিবন্ধে বর্ণিত বিভিন্ন রিপোর্টের ফলাফলে তা খুব ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে| তুরস্কের উচ্চশিক্ষা কাউন্সিল এবং জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় উভয় সরকারি প্রতিষ্ঠানই শিক্ষাক্রমে জীববিবর্তনকে বাদ দিয়ে ইসলামি সৃষ্টিবাদ সংযুক্ত করেছে| অথচ কয়েক দশক আগেও এই দেশে বিজ্ঞান ও মানবিক উভয় শাখার পাঠ্যপুস্তকে জীববিবর্তন বিজ্ঞানের আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল| তুরস্কের জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ করে থাকে| মাধ্যমিক শ্রেণীর জীববিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের ১৯৮৩ সালের সংস্করণেও দেখা যাচ্ছে জীববিবর্তন বিষয়টি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল| আর একই বইয়ের ২০১১ সালের সংস্করণে দেখা যাচ্ছে বিবর্তন অধ্যায়টি বাদ পড়ে গেছে| যদিও মাধ্যমিকের জীববিজ্ঞান বইয়ের একটি অধ্যায়ের নাম হচ্ছে 'জীবনের শুরু এবং বিবর্তন', কিন্তু এই অংশে বিবর্তনের কোনো বর্ণনা নেই| তার বদলে রয়েছে ইসলামি সৃষ্টিবাদী বর্ণনা| উল্লেখ্য গত শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ধর্মীয় শিক্ষাকে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে|

২০১১ সালে তুরস্কের ৭৫ জন জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের উপর পরিচালিত এক জরিপ থেকে জানা যায় ৪৪% শিক্ষার্থী বিবর্তন সম্পর্কে নিশ্চিৎ নয়| ৬৮% শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, তারা বিবর্তনকে বিজ্ঞানের প্রমাণিত বিষয় বলে মনে করেন না| অবশ্য জরিপ থেকে এটাও প্রতীয়মান হয়েছে বিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে যাদের ধারণা কম তাদের মধ্যে বিবর্তনকে বাদ দেবার প্রবণতা বেশি| এর আগের বছর (২০১০) অন্য আরেকটি জরিপ পরিচালিত হয়েছে ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯৮ জন স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীর উপর| জরিপের ফলাফল হচ্ছে ২৭.৮% শিক্ষার্থী জীববিবর্তনকে বিজ্ঞানসম্মত ও প্রমাণিত বলে

মানেন| ২০.৭% শিক্ষার্থী বিবর্তনকে অস্বীকার করেছেন| তবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ৫১.৪% শিক্ষার্থী বিবর্তন সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখেন না, তাই তারা বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিৎ নন| (দ্রষ্টব্য : Zehra Sayers and Zuhal Özcan, Attitudes towards teaching evolution in Turkey, '*APS*' (American Physical Society), June 2013, Volume 22, Number 6. www.aps.org/publications/apsnews/201306/international.cfm)|

তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে জীববিবর্তনের প্রতি বিরোধিতার অবস্থান হুট করে তৈরি হয় নি| বিগত কয়েক দশক ধরে সরকারি উদ্যোগ আর প্রপাগান্ডার ফল এটি| হিসেব করে বলতে গেলে আজকের তুরস্কের উল্টোপথের যাত্রা শুরু ১৯৮৫ সালে| তখনই প্রথম জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় জীববিবর্তনকে পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে| জানা যায় সেই সময় ক্ষমতাসীন (দক্ষিণপন্থী) রাজনৈতিক সংগঠন 'মাতৃভূমি দলে'র (*Anavatan Partisi*) নেতা এবং তুরগুত ওজাল সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ভিহবি দিনসারলার (Vehbi Dinçerler) আমেরিকা ভ্রমণে যান| ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক খ্রিস্টান মৌলবাদী ও বাইবেলীয় সৃষ্টিবাদীদের সংগঠন *ইনস্টিটিউট ফর ক্রিয়েশন রিসার্চ*'র (সংক্ষেপে *আইসিআর*) সাথে সাক্ষাতে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর দেশে সৃষ্টিবাদী পাঠ্যপুস্তক রচনায় সহায়তা কামনা করেন| *আইসিআর*'র সহযোগিতায় তুরস্কের মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের জীববিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে বাধ্যতামূলক কোর্স হিসেবে 'সৃষ্টিবাদ' অন্তর্ভুক্ত হয়| (পূর্বে সৃষ্টিবাদ পড়ানো হতো একমাত্র ধর্ম ও নৈতিকতা'র ক্লাসে|) নতুন সংস্করণে সংযুক্ত ইসলামি সৃষ্টিবাদের অধ্যায়টি আমেরিকান খ্রিস্টান ইয়ং আর্থ সৃষ্টিবাদী নেতা এবং প্রকৌশলী হেনরি মরিসের (*আইসিআর*'র প্রতিষ্ঠাতা) *সায়েন্টিফিক ক্রিয়েশনিজম* (১৯৭৪) বইয়ের অনুবাদ| খ্রিস্টান মৌলবাদীর লেখা বইটির ইসলামি ভার্সনের অনুবাদকার্য পরিচালিত হয় তুরস্কের শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে| যেমন অনুবাদের এক জায়গায় বলা হয়েছে, '*প্রতিটি জীবিত স্বত্তা এবং প্রজাতিকে আল্লাহ আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন| যদিও সময়ের প্রয়োজনে কোথাও কোথাও কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তবে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে কোনো বিবর্তন ঘটে নি|* (এটা বোধগম্য যে হেনরি মরিসের লেখায় 'গড' শব্দের পরিবর্তে তুর্কি অনুবাদে 'আল্লাহ' শব্দটি সংযোজিত হয়েছে|) পাশাপাশি স্কুলের পাঠ্যবইয়ের অর্ন্তভুক্ত 'বিবর্তন' অধ্যায়ে ইচ্ছেকৃত বিকৃতি ঘটানো হয়েছে| যেমন জীববিজ্ঞানের বইয়ের পরিবর্তিত সংস্করণে সংযুক্ত হয়েছে : '*ডারউইনের মতানুসারে পৃথিবীতে শুধু শক্তিশালীরা টিকে থাকবে আর দুর্বলেরা পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যাবে| অথচ আমরা দেখি বৃহৎ বৃহৎ জীব যেমন ডায়নোসর, ম্যামথের মত প্রাণীরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর কেঁচোর প্রাণীরা এখনও টিকে রয়েছে|*

এটা ডারউইনীয় বিবর্তনের বক্তব্য নয়| ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের 'সামাজিক ডারউইনবাদের' বক্তব্যকে চার্লস ডারউইনের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে| স্পেন্সারের

'*Survival of the fittest*' (যোগ্যতমরাই টিকে থাকে) পরিভাষাটির অপব্যবহার ঘটেছে ডারউইনীয় জীববিজ্ঞানে| বৈচিত্র্যময় এই জীবজগতে বিবর্তনের জন্য 'শক্তিশালী' বলতে পেশিশক্তির জোর কখনো মুখ্য নয়| ডারউইনীয় বিবর্তন অনুযায়ী 'শারীরিক শক্তিমত্তা' বা পেশিশক্তি বিবর্তনের জন্য একক কোনো ফ্যাক্টর নয়| জীবজগতে প্রজাতির বিবর্তনের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ একাধিক ফ্যাক্টর রয়েছে| যেমন কোনো প্রজাতির বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য সংস্থান, বাসস্থানের যোগান, শত্রুর মোকাবেলা করা, যৌনসঙ্গী নির্বাচন, সন্তান জন্মদান, উত্তরাধিকার হিসেবে টিকে থাকা, জনসংখ্যার আধিক্য, পরিবেশের পরিবর্তন ইত্যাদি| জীববিজ্ঞানের ভাষায় এদের সিলেক্টিভ প্রেসার বলে| সিলেক্টিভ প্রেসারগুলো সকল প্রজাতিতে আলাদা আলাদাভাবে ক্রিয়াশীল| শুধু শক্তিমান প্রাণীরাই বিবর্তিত হবে আর তুলনামূলকভাবে শারীরিক শক্তিমত্তায় দুর্বল প্রাণীরা বিবর্তিত হবে না-এমনটা কখনো বিবর্তনবিদ্যায় বলা হয় নি| যারা আসলে এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করায় তাদের আদতে হয় বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান নেই, নয়তো ইচ্ছেকৃতভাবে সাধারণ মানুষকে জীববিবর্তন সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে ভুল বক্তব্য হাজির করেন| একটা হাতির শারীরিক শক্তি অনেক বেশি কিন্তু এর দ্রুত গতি বা ক্ষিপ্রতা নেই| আবার তুলনামূলকভাবে একটা চিতা বাঘের শক্তি কম থাকলেও তার দ্রুতগামিতা ও ক্ষিপ্রতা রয়েছে| ঘোড়ার শারীরিক শক্তি ও দ্রুতগামিতা থাকলেও এর মধ্যে হিংস্রতা নেই| চিতাবাঘ বা অন্যান্য শিকারী প্রাণীর মতো ঘোড়া শিকার করে বেড়ায় না| (ঘোড়া তৃণভোজী প্রাণী|) আবার শকুন, চিল, বাজপাখি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী প্রাণী| প্রজাপতি, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় পরিবেশের সাথে ক্যামোফ্লেজ তৈরি করে শিকারী প্রাণীর চোখ এড়িয়ে বেঁচে থাকে| হাতির তুলনায় এসব প্রাণীর যেমন শারীরিক শক্তি নেই তেমনি চিতাবাঘের মতো এরা ক্ষিপ্রও নয়| তাই বলে কি এসব প্রাণীর বিবর্তন আটকে আছে? না| বরং উপরের উদাহরণ থেকে সহজে বোঝা যায়, কোনো প্রাণীর একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে আলাদা আলাদা প্রজাতির জীবন ধারণের ফ্যাক্টরগুলো বুঝা যায় না| স্বতন্ত্র প্রজাতির জীবনধারণের উপায় স্বতন্ত্র| তাদের বাস্তুসংস্থান ভিন্ন| কোনো প্রজাতিতে একটি সিলেক্টিভ প্রেসার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়তো প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে পারে| কিন্তু পরবর্তীতে সেটা আবার দুর্বলও হয়ে পড়তে পারে|

পরিবেশ যেখানে সর্বদা পরিবর্তনশীল সেখানে কোন প্রজাতি নিশ্চিৎ হতে পারে না, আগামীতে কোন কোন সিলেক্টভ প্রেসারের সাথে তাকে খাপ খাওয়াতে হতে পারে| বা মোকাবেলা করতে হবে| যদি জীবজগতে 'শারীরিক শক্তিমত্তা' বিবর্তনের জন্য একমাত্র সিলেক্টিভ প্রেসার হিসেবে থাকতো তাহলে হয়তো মানুষ নয়, অন্য কোনো প্রজাতির প্রাণীই পৃথিবীতে রাজত্ব করতো! বিশাল আকৃতির ডায়নোসর বা ম্যামথের কথা বাদ দিলাম| প্রায় নয় লক্ষ বছর আগে দক্ষিণ এশিয়ার বাঁশের বনাঞ্চলে (আজকের যুগে

চীন, ভারত, ভিয়েতনাম) বিশাল আকৃতির জায়গানটোপিথেকাস নামের এপরা বসবাস করতো| বিলুপ্ত এই এপদের উদ্ধারকৃত ফসিল থেকে তিনটি প্রজাতি চিহ্নিত করা গেছে| একটি হচ্ছে *Gigantopithecus blacki* এবং অন্য দুটি *G. bilaspurensis* ও *G. giganteus*| তিনটি প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বৃহদাকৃতির ছিল *G. blacki*| উচ্চতায় এরা ছিল প্রায় সাড়ে নয় ফুটের উপরে এবং শরীরের ওজন ছিল ৫৪০ কেজির মতো| এদের চোয়ালের আকার আজকের যুগের একেকটা চিঠির বাক্সের সমান| অথচ এই *G. blacki* এপরাও একসময় পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে| ফসিল হিসেবে তাদের কয়েকটা দাঁত আর চোয়াল ইতোমধ্যে উদ্ধার হয়েছে ভারত, চীনের বিভিন্ন জায়গা থেকে| যেগুলো সংরক্ষিত আছে জাদুঘরে| দৈত্যাকৃতি এই জায়গানটোপিথেকাস কি একসময় ভাবতে পেরেছিল তারাও পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে? তাদের শারীরিক শক্তিমত্তা তো বিবর্তনের জগতে টিকে থাকতে শেষপর্যন্ত অধিক কোনো সুবিধা প্রদান করে নি| মূল কথা হচ্ছে, যে প্রজাতি বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ায় একাধিক সিলেক্টিভ প্রেসারের সাথে যত সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সেই প্রজাতি সফলভাবে বংশরক্ষা করতে পারে, বিবর্তিত হতে পারে| কোনো একটা মাত্র সিলেক্টিভ প্রেসারকে মোকাবেলা করে বিবর্তনের জটিল জগতে প্রজাতির টিকে থাকা সম্ভব নয়|

৬.

তুর্কি শিক্ষামন্ত্রী দিনসারলার আমেরিকা থেকে ফিরে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে এক বার্তায় জানিয়েছিলেন, যেসব শিক্ষক স্কুলে বিবর্তন পড়াবেন তাদেরকে 'কমিউনিস্ট' হিসেবে ছাপ্পা মারা হবে| সোভিয়েত রাশিয়ায় তখন কমিউনিস্ট শাসন ভেঙে পড়ার উপক্রম| বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো একে একে ভেঙে যাচ্ছে| এই অবস্থায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে 'কমিউনিস্ট' শব্দটি নিন্দার্থে ব্যবহৃত হত|

বিশ্বের সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তুরস্কই একমাত্র দেশ যার বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে 'ধর্মীয় সৃষ্টিবাদ' পড়ানো হয় তিন দশক ধরে| ২০০৩-০৪ সালের দিকে মাধ্যমিকের বিজ্ঞানের পাঠ্যবই থেকে জীববিবর্তন বিষয়টি সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে| এর বদলে স্থান পেয়েছে বিবর্তন বিষয়ে বিভিন্ন ইসলামি ধর্মীয় নেতাদের বক্তব্য|

২০০৬ সালে বিশ্বের ৩৪টি শিল্পায়িত দেশে এক গণজরিপ চালায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফি| জরিপে দেখা যায় শতকরা ৮০ ভাগ জনগণের জীববিবর্তন তত্ত্বে আস্থা রয়েছে এমন দেশের তালিকায় ক্রমানুসারে শীর্ষে রয়েছে আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স, জাপান, ব্রিটেন| আমেরিকার অবস্থান নীচের দিক থেকে দ্বিতীয়, মানে ৩৩তম| তালিকায় অন্তর্ভুক্ত একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র তুরস্কের অবস্থান একদম নীচে|

তুরস্কের রাষ্ট্রপরিচালিত সর্বোচ্চ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সংস্থা হচ্ছে '*তুর্কিস সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল রিসার্চ*

কাউন্সিল| সংক্ষেপে *TÜBİTAK*| এই সায়েন্স কাউন্সিল থেকে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি অর্থায়নে *বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি* (*Bilim ve Teknik*) নামের একটি বিজ্ঞান প্রকাশনা বের করা হয়| ২০০৯ সালে ডারউইনের জন্মদ্বিশত বার্ষিকী পালিত হয়েছে গোটা বিশ্বজুড়ে| দেশে দেশে সরকারি-বেসরকারি বিজ্ঞান সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান প্রকাশনাগুলোর উদ্যোগে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়| তুর্কি রিসার্চ কাউন্সিলের '*বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি* পত্রিকাটি তাদের মার্চ মাসের সংখ্যার প্রচ্ছদে ডারউইনের একটি ছবি ব্যবহার করতে যাচ্ছিল| কিন্তু প্রেসে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে পত্রিকাটির উপরে সরকারি সেন্সরশিপ আরোপিত হয়| আটকে দেয়া হয় মার্চ মাসের সংখ্যার ছাপানোর কাজ| সরিয়ে দেয়া হয় পত্রিকাটির সম্পাদক সিগদেম আতাকুম্যান'কে (Çiğdem Atakuman)| দেশে-বিদেশের প্রচুর বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান তুর্কি সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেন| তখন সরকারের বিজ্ঞানমন্ত্রী মেহমেত আয়দিন সম্পাদককে সরিয়ে দেয়া নিয়ে কিছু না বললেও পত্রিকা সম্পর্কে বলেন, '*বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি* পত্রিকাটির প্রচ্ছদ মানানসই ছিল না| তাই এই ছবি বাদ দেয়া হয়েছে|' জীববিবর্তন নিয়ে ধর্মীয় বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করেন '*ডারউইনের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই| কারণ এই ব্যক্তি তো অনেক আগেই মারা গেছেন|* সাথে শিক্ষামন্ত্রী হোসেইন সেলিক বলেন তিনি জীববিবর্তনকে 'সত্য' বলে মানেন না, বরং ক্রিয়েশনিজমের নব্যরূপ 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন'কেই বিশ্বাস করেন|

উপরের এ ঘটনাটি সামান্য নমুনা মাত্র| বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের উপর ধর্মীয় মতাদর্শগত ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দেবার এরকম প্রচুর ঘটনাবলী প্রত্যহই ঘটে চলছে তুরস্কে| এই বছরের (২০১৩ সালের) প্রথম দিককার ঘটনা| তুর্কি গণমাধ্যমে প্রকাশিত (১৪ জানুয়ারি, ২০১৩) খবর থেকে জানা গেল 'সায়েন্স কাউন্সিল (*TÜBİTAK*) সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা আর জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত কোনো বিজ্ঞানের বই ছাপানো বা বিক্রি করবে না| রিচার্ড ডকিন্স, স্টিফেন জে. গোল্ড, রিচার্ড লিভন্টিন, জেমস ওয়াটসন, অ্যালান মোরহেডের মত বিবর্তন-বিজ্ঞানীদের বইগুলো তাদের সংগ্রহশালা থেকেও সরিয়ে নেবে|' প্রকাশিত সংবাদের প্রতিক্রিয়া যতটা ভাবা হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি তীব্র হয়ে দেখা দেয় সাথে সাথে| ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত বিজ্ঞান সংস্থাগুলো কড়া ভাষায় সমালোচনা করে এ পদক্ষেপের| কারণ ইইউভুক্ত দেশগুলোর বিজ্ঞাননীতিমালা ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমে এ ধরনের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শগত হস্তক্ষেপকে ভালো চোখে দেখা হয় না| বিজ্ঞানের আদর্শ মূল্যবোধ হিসেবে 'অবজেকটিভিটি' (নৈর্ব্যক্তিকতা) নীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়| আর তুরস্কও দীর্ঘদিন ধরে ইইউ'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে| ফলে সায়েন্স কাউন্সিল পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে প্রকাশিত সংবাদকে 'মিথ্যা প্রপাগান্ডা' হিসেবে

আখ্যায়িত করে| দাবি করে তুরস্কের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (চীনা সহযোগিতায় নির্মিত Göktürk-2) প্রেরণের প্রাক্কালে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ অবশ্যই দুরভিসন্ধিমূলক!

বিজ্ঞানের জগতে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থিওরি জীববিবর্তনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিরোধ খাঁড়া করানোর খুব জোর চেষ্টা চলছে তুরস্কে| আর এ কাজটি করে যাচ্ছে ইসলামপন্থী মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলো| ক্রিয়েশনিজম নাম দিয়ে ধর্ম আর বিজ্ঞানকে একটি সাংঘর্ষিক অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইছে এরা| ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং প্রভাবশালী বিজ্ঞান জার্নাল '*নেচার*' তুরস্কের ২০০৯ সালের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছিল| '*নেচার*' (Vol 458 | Issue no. 7236 | 19 March 2009) *সায়েন্স কাউন্সিলের*-এর কাছে আহ্বান জানিয়েছে '*তারা যেন এ ঘটনার একটি স্বচ্ছ তদন্ত করে এবং তুর্কি সরকারও যেন বিজ্ঞান নীতিমালায় ধর্মীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করে*|' কারণ গত শতাব্দীতেই আমরা দেখেছি, বিজ্ঞানের জগতে ধর্ম কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শগত হস্তক্ষেপ কখনোই ভালো ফল বয়ে আনতে পারে না|

1

সোভিয়েত ইউনিয়নে লিসেঙ্কোর ঘটনাবলী এক্ষেত্রে সবচেয়ে জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ|* এছাড়া ধর্মবিরোধিতার অভিযোগ দিয়ে গ্যালিলিও কিংবা ব্রুনোর মতো বিজ্ঞানীদের আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনাবলী তো ইতিহাস থেকে মুছে যায় নি এখনো|

৭.

বর্তমান সময়ে তুরস্কভিত্তিক ইসলামি ক্রিয়েশনিজম আন্দোলনের মূল হোতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন হারুন ইয়াহিয়া| হারুন ইয়াহিয়া নিজেকে বিজ্ঞানবিরোধিতার জগতে (বিশেষ করে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানবিরোধিতার ক্ষেত্রে) অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা (*কাল্ট ফিগার*) হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন| মুসলিম দেশগুলোতে তিনি এখন জনপ্রিয় 'সৃষ্টিবাদী' নেতা| বিজ্ঞানকে ধর্মের মোড়কে উপস্থাপনে সিদ্ধহস্ত| এ বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন বলেও দাবি করেন| সাথে প্রচুর বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছেন বিভিন্ন সময়| বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে হারুন ইয়াহিয়ার বেশ কয়েকটা বই যেমন অনূদিত হয়েছে তেমনি তাঁর কয়েকটি ভিডিও বাংলায় ডাবিং করে সম্প্রচার করাও হয়েছে কয়েকটি টিভি-চ্যানেলে (যেমন ইসলামিক টিভি, দিগন্ত টিভি)| ইন্দোনেশিয়ার সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে জীববিজ্ঞানের ক্লাসে জীববিবর্তনের বদলে হারুন ইয়াহিয়ার বই

---

* আগ্রহীরা এই বিষয়ে শুদ্ধস্বর থেকে প্রকাশিত '*সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও বিপ- ব: লিসেঙ্কো অধ্যায়*' বইটি পাঠ করতে পারেন|

পড়ানো হয়| লেবাননে ১৯৯০ সালের মধ্যভাগে মাধ্যমিক স্কুলের বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম থেকে জীববিবর্তনকে বাদ দেয়া হয়েছে| পাকিস্তানের সরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে যদিও বিবর্তন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিন্তু একই সাথে এইসব বইয়ের পৃষ্ঠায় কোরান শরিফের বিভিন্ন আয়াত লেখা রয়েছে| শিক্ষকরা ক্লাসে জীববিবর্তন পড়াতে স্বস্তিবোধ করেন না| ২০০৯ সালে প্রকাশিত মুসলিম দেশগুলোতে জীববিবর্তনের অবস্থান নিয়ে আমেরিকার হার্ভার্ড ও কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ প্রকল্প 'ইভোলুশন এডুকেশন রিসার্চ সেন্টারের' পরিচালিত তিন বছর মেয়াদী গবেষণা থেকে দেখা গেছে পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষকই জীববিবর্তনকে 'সত্য' বলে মানেন না| ছাত্রদেরও এ বিষয়টি মানতে নিরুৎসাহিত করেন| কিন্তু পাকিস্তানের মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ইসলামি সৃষ্টিবাদের উপরে সভা-সেমিনার, কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়| মিশরের অবস্থাও প্রায় একই রকম|

হারুন ইয়াহিয়ার মূল নাম আদনান অকতার| জন্ম ১৯৫৬ সালে, তুরস্কের আংকারা শহরে| মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন সেখানে| কিশোর বয়সে এসে অকতার ইসলামি পণ্ডিত বেদিউজ্জামান সৈয়দ নুরসি'র মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন| বলা যায় নুরসিই হচ্ছেন অকতারের তরুণ বয়সের আদর্শিক গুরু| নুরসি (১৮৭৮-১৯৬০) কোরানের শানে নুজুলের উপর একটি বইও লিখেছিলেন| বইটির বহুল প্রচারের কারণে তিনি একদা বেশ প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন তুরস্কে| বিজ্ঞানকে 'ইসলামি' আদলে উপস্থাপনে নুরসি বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন| তুরস্কের সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় 'ইসলামি বিজ্ঞান' চালু করার জন্য জোর প্রচারণাও চালিয়েছেন| যার জন্য জীবন সায়াহ্নে এসে নুরসি ভাববাদী আন্দোলনও শুরু করেন| নুরসি'র দৃষ্টিতে কমিউনিজম এবং বস্তুবাদ উভয়ই মানুষের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মতবাদ| উভয়ের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান-মুসলিমরা যাতে সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে পারে সে-জন্য পোপ ও অন্যান্য খ্রিস্টান ধর্মীয় শাখার নেতাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন|

১৯৭৯ সালে বয়স যখন তেইশ, অকতার রাজধানী ইস্তাম্বুলে এসে পা রাখেন| ভর্তি হন মিমার সিনান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগে| কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্নাতক ডিগ্রি সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন কিনা তা জানা যায় না|

৮.

তুরস্ক জুড়ে চলছিল তখন চরম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিতিশীলতা| স্নায়ুযুদ্ধের করাল থাবা উদ্ধত তুরস্কের মাথার উপর|

আবার রক্ষণশীল মুসলিম মৌলবাদী দলগুলোর সাথে তুরস্কের সেক্যুলার দলগুলোর অসন্তোষ-সংঘর্ষ চলছিল জোরেশোরে| তরুণ বয়সী অকতার স্থানীয় মসজিদে গিয়ে ওয়াজ-মাহফিল করতেন| বয়ান দিতেন| তরুণ-যুবা কয়েকজন মুরিদও জুটে গিয়েছিল তার| এই সময়টার কথা স্মরণ করে অকতারের কৈশোরের বন্ধু ইরিপ জুকশেল পরবর্তীতে একবার বলেছেন, অকতার তখন থেকেই একজন পাক্কা 'সুন্নি মোল্লা' হয়ে ওঠেন| ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪, এই দুই বছরের মধ্যে অকতার বিশ-ত্রিশ জনের মুরিদ নিয়ে মৌলবাদী-আদলে একটা 'ধর্মীয়' সংগঠন গড়ে তুলেন| দলটির লক্ষ্য ছিলো তুরস্কের ঐতিহ্যবাহী সেক্যুলার-আদর্শের বিরোধিতা করা এবং ইহজাগতিক, ধর্মনিরপেক্ষ জীবনবোধের বাইরে গিয়ে ইসলামি জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে মানুষকে ধর্মাবিষ্ট করা| এ জন্য তারা সংগঠন থেকে মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, বস্তুবাদ-বিরোধী প্রচার-প্রচারণা চালাতেন| বিজ্ঞানের জগতে তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল ডারউইনের জীববিবর্তন| অকতার ও তার সংগঠনের দৃষ্টিতে ডারউইনের জীববিবর্তন তত্ত্ব বিজ্ঞানের জগতে ধর্মের হস্তক্ষেপকে 'খর্ব' করে দিয়েছে| তাই এটা 'কুফরি মতবাদ'|

১৯৯১ সালে অকতার '*বিজ্ঞান গবেষণা ফাউন্ডেশন*' (*Bilim Araştırma Vakfı*, সংক্ষেপে *BAV*) গঠন করে 'সভাপতি' পদ ধারণ করে আছেন| এই ফাউন্ডেশনকে মূলত বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান না বলে রেডিকেল ধর্মবাদী সংগঠন হিসেবে বললেও ভুল হয় না| অকতারের ফাউন্ডেশনের কাজ হচ্ছে বিজ্ঞানের জগতে যত উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার, উদ্ভাবন, থিওরি রয়েছে সবকিছুকে কোরানের আলোকে মূল্যায়ন করা এবং এগুলোকে লোকসম্মুখে 'কোরানীয় বিজ্ঞান' বলে প্রচার করা| ফাউন্ডেশনটি অকতারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে| এখান থেকে তার যাবতীয় লেখালেখি, চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারি, অডিও রেকর্ড প্রকাশ করা হয়| তুর্কি, আর্মেনীয়, ইংরেজি, আরবি, রুশসহ প্রায় ১৫টি ভাষায় এগুলো অনুবাদ করা হয়| একই সাথে অকতারের বিভিন্ন বক্তব্য, লেখালেখি নিয়ে ষাটটিরও অধিক ওয়েব সাইট পরিচালনা করা হয় এই ফাউন্ডেশন থেকে| অকতারকে এজন্য তুরস্কের 'মিডিয়া মোঘল'ও বলা যায়| কিংবা বলা যায় 'ওয়ান ম্যান ইন্ডাস্ট্রি'| তুরস্কের বহুল প্রচারিত পত্রিকা *হুরিয়েত*'র ভাষ্য অনুযায়ী অকতার ও তাঁর ফাউন্ডেশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ হয় মৌলবাদী রাজনৈতিক দল কল্যাণ (*Refah*) পার্টির নেতা অধ্যাপক নেকমেতিন এরবাকানের (১৯২৬-২০১১)| কল্যাণ পার্টির নেতা অধ্যাপক নেকমেতিন এরবাকান ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল 'সঠিক পন্থা'র (*Doğru Yol Partisi*) সাথে কোয়ালিশন গঠন করে স্বল্প সময়ের জন্য (জুন ২৮, ১৯৯৬- জুন ৩০, ১৯৯৭) তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন| ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন ধরনের স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়ে নেকমেতিনের সরকার| বিশেষ করে 'Susurluk scandal' ঘটনাটি তার সরকারের পতনের জন্য নিয়ামক হিসেবে ধরা হয়| এছাড়া

সরকারের ভেতরের দুর্নীতি, রক্ষণশীল ইসলামপন্থীদের উত্থান, ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের ইসলামিকরণের প্রচেষ্টা, মাদক চোরাচালান, কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন বিভিন্ন ইস্যুতে সেনাবাহিনীর সাথে বিরোধ বাঁধে নেকমেতিন সরকারের| শেষে তুরস্কের সাংবিধানিক আদালত শাসক দল কল্যাণ পার্টিকে রাষ্ট্রের সেক্যুলার সংবিধানের ভিত্তিমূলে আঘাত হানার জন্য ও ধর্মীয় মৌলবাদ প্রচারণার জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে| (কল্যাণ পার্টি তাদের ভাষণে বহুবার ঘোষণা দিয়েছে 'তারা ইরান-আফগানিস্তানের মতো ইসলামি শরিয়াভিত্তিক ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র তুরস্কে প্রতিষ্ঠা করতে চায়| এজন্য জিহাদ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পথ|) লেখালেখির কাজে '*হারুন ইয়াহিয়া*' ছদ্মনামটি আসলে নেকমেতিন এরবাকান ও আদনান অকতার উভয়ে মিলে পরিচালনা করেন-এমন গুরুতর অভিযোগ এনেছে দৈনিক *হুরিয়েত*| (দ্রষ্টব্য : *হুরিয়েত*, সেপ্টেম্বর ১৩-১৫, ১৯৯৯)| 'হারুন ইয়াহিয়া'র নামে লিখিত '*Evolution and Molecular Biology*', '*The Qur'an-Islam*', '*Free Masonry and Anti-Semitism*' বইগুলো থেকে সন্দেহ করা হয় 'হারুন ইয়াহিয়া' আসলে একজন ব্যক্তি নন| একাধিক ব্যক্তি এই নামের সাথে জড়িত আছেন যাদের জীববিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান খুব নগণ্য| *কামহুরিয়েত* পত্রিকার বক্তব্য অনুযায়ী (২৯ জুন, ১৯৯৯) কট্টরপন্থী ধর্মীয় নেতা ফেতুল্লাহ গুলেনের (জন্ম ১৯৪১) (তিনিও অকতারের মত 'বিবর্তন'কে শয়তানি কাজকারবার বলে প্রচারণা চালান) সাথে আদর্শগত গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে অকতারের| ফেতুল্লাহ গুলেনও অকতারের একসময়কার আর্দশিক গুরু সৈয়দ নুরসি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন| তাঁর ভাববাদী আন্দোলনের তিনিও সাথী ছিলেন| পরবর্তীতে নুরসি'র মতো তিনিও নিজের নামের সাথে মিল রেখে তুরস্কে ইসলামিপন্থী আরেকটি সামাজিক আন্দোলন (গুলেন আন্দোলন) শুরু করেন| তবে ১৯৯৯ সালে গুলেন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্য গেলে আর দেশে ফিরে আসেন নি| স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে বর্তমানে পেনসিলভানিয়া রাজ্যে বসবাস করছেন|

শুরু থেকেই আমেরিকান খ্রিস্টান ক্রিয়েশনিস্টদের সাথে দহরম-মহরম ছিল অকতারের '*বিজ্ঞান গবেষণা ফাউন্ডেশন*'র| প্রতিষ্ঠার এক বছরের মাথাতে (১৯৯২) ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে তুরস্কে আসেন আমেরিকান ইয়ং আর্থ (নবীন পৃথিবী) ক্রিয়েশনিস্ট দলের নেতা হেনরি ম্যাডিসন মরিস (১৯১৮-২০০৬) এবং ডুয়ান টলবার্ট গিস (১৯২১-২০১৩)| ইস্তাম্বুলে আয়োজিত সৃষ্টিবাদী কনফারেন্সে তারা বক্তব্য রাখেন| *আইসিআর*'র সাবেক প্রেসিডেন্ট হেনরি মরিস এরপর আরও কয়েকবার তুরস্ক ভ্রমণ করে যান এবং তাদের 'নুহের নৌকা' খোঁজাখুঁজির কাজে প্রত্যক্ষ সহায়তা করে ফাউন্ডেশনটি| ১৯৯৮-এর এপ্রিল ও জুনে বেশ কয়েকটি ইসলামি সৃষ্টিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয় ইস্তাম্বুলে ও আংকারায়| দাওয়াত পেয়ে অনেক আমেরিকান সৃষ্টিবাদী উপস্থিত হন সভায়| ফাউন্ডেশনটি তুরস্কের

প্রায় প্রত্যেকটি ছোটবড় শহরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে| এসব সভা থেকে *আইসিআর* এবং অকতারের বিভিন্ন ছদ্মবিজ্ঞানসম্পর্কিত বক্তব্য প্রচার করা হয়| মাঝে মাঝে এমনও প্রচার চালানো হয়-'*আধুনিক বিজ্ঞান নাকি বিবর্তনকে বাতিল করে দিয়েছে এবং সৃষ্টিবাদকে দুই হাত খুলে গ্রহণ করে নিয়েছে!* এ জন্য তারা প্রায় সময় উদাহরণ টেনে বলতো *ডিসকোভার, সায়েন্টিফিক আমেরিকান, সায়েন্স, নেচার* প্রভৃতির মত প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান জার্নালে সৃষ্টিবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং বিবর্তনকে 'অবাস্তব' বলে দাবি করেছে! এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার তুরস্কের সাধারণ জনগণের এইসব বিজ্ঞান জার্নাল পড়ার সুযোগ খুব সীমিত| তাই অকতারের বক্তব্যের সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরুপণে তারা ছিল আসলেই অপারগ| *আইসিআর* যে অকতারের প্রতিষ্ঠানকে জন্মলগ্ন থেকে বই-পুস্তক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দিয়ে এসেছে এটা ওপেন সিক্রেট| অকতারের প্রতিষ্ঠান থেকে হেনরি মরিসের '*সায়েন্টিফিক ক্রিয়েশনিজম*', ডুয়ান গিসের লেখা '*Evolution: The Fossils Still Say No!*' (১৯৯৫) ইত্যাদি জীববিবর্তনবিরোধী বইসহ *আইসিআর*'র বিভিন্ন প্রকাশনা নানা সময়ে অনূদিত হয়েছে|

৯.

অকতারের রচনা এবং তার সংগঠনের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনো বক্তব্যের শুরুতেই বিবর্তনকে 'মিথ্যা'-'ভুল' দাবি করে তারপর দাবির পক্ষে একে একে অজুহাত তুলে ধরা হয়| ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে বিবর্তনের বিরুদ্ধে যে-সব মিথ্যা প্রচারণা চালাতো হতো তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে :

(১)জীবজগতে বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া বলতে কিছু নেই| কোনো প্রজাতিই বিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয় না| আল্লাহ পৃথিবী এবং প্রাণ এক সাথেই সৃষ্টি করেছেন|

(২) শতাব্দীর সবচেয়ে বড় গুজব হচ্ছে বিবর্তন| গত ১৫০ বছরে যত বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে তার সবকিছুই বিবর্তনকে খণ্ডন করেছে| ডিএনএ থেকে জীবজগৎ সম্পর্কিত যত বৈজ্ঞানিক উপাত্ত অর্জিত হয়েছে তার সবকিছু থেকে পরিষ্কার হয়েছে সবকিছুর পেছনে ডিজাইন আছে, উদ্দেশ্য আছে| এবং এরা প্রত্যেকেই একসাথে সৃষ্টি হয়েছে| বিজ্ঞান ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছে আল্লাহ আছেন তিনি আমাদের পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি করেছেন|

(৩) আল্লাহ তার নিজের মত করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন| তাই আমরা কখনো এপ থেকে বিবর্তিত হয় নি| এপ হচ্ছে পশুস্তরের অন্তর্ভুক্ত| বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত একটাও সূত্র উদ্ধার করতে পারে নি, যেখান থেকে প্রমাণিত হয়

হোমো সেপিয়েন্সদের সাথে এপের কোনো আত্মীয়তার সম্প র্ক রয়েছে|

(৪) ডারউইনীয় বিবর্তন (প্রাকৃতিক নির্বাচন) যতটা না বৈজ্ঞানিক তার থেকে বেশি আদর্শগত| ডারউইনবাদীরা এগুলোকে রক্ষা করে চলেন কারণ তারা হয়তো প্রত্যেকে কমিউনিস্ট মতাদর্শ ধারণ করেন, কিংবা তারা বস্তুবাদী, শয়তানের উপাসনা করেন অথবা বর্ণবাদী চিন্ত াভাবনা লালন করেন| যারা বিবর্তনকে সমর্থন করেন তারা আসলে মানসিকভাবে দুর্বল| কারণ তারা সকল বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বাইরে গিয়ে এমন দাবি করছেন|

(৫) জীবজগতে বিবর্তনের কোনো বাস্তবতা নেই| কারণ কোরানে এ সম্প র্কিত কোনো কিছু বলা হয় নি| কোরান হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ| কোরানেই রয়েছে বিশ্বের সর্বশেষ বিজ্ঞান| তাই কোনো কিছুই এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে টিকে থাকতে পারে না|

(৬) বর্তমান যুগে আধুনিক সেক্যুলার ব্যবস্থা হচ্ছে শয়তানের প্ররোচনা এবং ফাঁদ| সেক্যুলার আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা করা মানে শয়তানকে সহযোগিতা করা| এক্ষেত্রে কোরান ও শরিয়াই একমাত্র খাঁটি ও আদর্শ পথ| বিজ্ঞান চর্চা করতে হলে এই খাঁটি ও আদর্শ পথে থাকতে হবে|

অকতারের বিবর্তনবিরোধী এইসব প্রচারণা আসলে খ্রিস্টান সৃষ্টিবাদী সংগঠন *আইসিআর*র ইসলামি ভার্সন মাত্র| *আইসিআর*র বক্তব্যে 'গডে'র জায়গায় আল্লাহ, আর বাইবেলের জায়গায় কোরানের বসিয়ে ভাষণ তৈরি করা হয়েছে| তবে এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এই দুইটা গ্রুপের কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্য কিছু লক্ষণীয়| আমেরিকার মত শিল্পোন্নত দেশে শক্তিশালী বিজ্ঞান-কমিউনিটি থাকায় *আইসিআর*কে বিবর্তনের বিরোধিতায় প্রায় সময় মার্জিত ভাষা ব্যবহার করতে হয়| যতটা সম্ভব জনবোধ্য 'বিজ্ঞানের পরিভাষাগুলো' ব্যবহার করে বক্তব্য তৈরি করতে হয়| কিন্তু তুরস্কে *বিজ্ঞান গবেষণা ফাউন্ডেশন* কখনো এ রকম শক্তিশালী সমালোচকদের হাতে পড়ে নি| তাই তাদের বক্তব্যে ভাষার প্রয়োগে অপরিণামদর্শিতা লক্ষণীয়|

গত শতাব্দীর ৯০ দশকের গোড়ার দিকে অকতার তার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেন, বিনামূল্যে বিভিন্ন জায়গায় বই বিতরণ করে| সত্যি কথা বলতে গেলে তুরস্কের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী-গবেষকদের অধিকাংশই এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেন নি| তারা এই বিষয়টিকে প্রথমে পাত্তা দিতে চান নি| বরঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক কিংবা মেডিকেল সায়েন্সের গবেষকরা ভেবেছেন অকতারের এইসব 'ছেলেমানুষি' বিবর্তনবিরোধী সৃষ্টিবাদী বক্তব্যের জবাব দিলে লাই পেয়ে যেতে পারেন| ইতিহাসের কী নির্মম পুনরাবৃত্তি, ৮০-এর দশকের পূর্বে ইসলামি মৌলবাদীরা যখন দলবদ্ধ হতে শুরু করলো, শক্তি সঞ্চয়

করে প্রকাশ্যে বাহুবল প্রদর্শন শুরু করেছিল তখনও তুরস্কের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বুদ্ধিজীবী মৌলবাদীদের উত্থানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চান নি| তারা হয়তো ভেবেছিলেন তুরস্কের মত সেক্যুলার দেশে এই ধরনের মৌলবাদী আস্ফালন বেশিদিন টিকবে না| কিন্তু সহস্রাব্দের শেষ লগ্নে এসে বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানীরা যখন বুঝতে পারলেন পায়ের তলায় এবার আর মাটি নেই ততদিনে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে ইসলামি মৌলবাদীরা| আর হারুন ইয়াহিয়ার লাগামহীন অপপ্রচারে সাধারণ জনগণের একটা বিরাট অংশও বিশ্বাস করে নিয়েছে-'*বিজ্ঞানের জগৎ থেকে বিবর্তনবিদ্যার পতন ঘটে গেছে*' এমন কি অনেক বিজ্ঞান সংগঠনও আদনান অকতার ও তার ফাউন্ডেশনের বিজ্ঞানবিরোধিতার ধরন দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান|

১০.

তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী, যেমন ফরেনসিক বিভাগের (ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাক্তন অধ্যাপক উমিত সায়িন এবং জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক (মিডিল ইস্ট টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, আংকারা) আয়কুত কেনসি একদম শুরু থেকে অকতারের বিজ্ঞানবিরোধিতার সমালোচনা করেছেন| জনতাকে বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলি সহজ ভাষায় তুলে ধরার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন|

১৯৯৮ সালে আয়োজিত '*বিজ্ঞান গবেষণা ফাউন্ডেশন*'র কনফারেন্সের পর তুর্কি বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলো গা ঝাঁড়া দিয়ে উঠার চেষ্টা করে| ইসলামি ক্রিয়েশনিস্টদের ধারাবাহিক সমালোচনার জবাবে অধ্যাপক উমিত সায়িন ও আয়কুত কেনসি'র উদ্যোগে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে পাল্টা প্রচারণা শুরু করেন| প্রথমবারের মতো *তুর্কিস একাডেমি অব সায়েন্সেস* (*TUBA*) এবং *তুর্কিস সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল* (*TÜBİTAK*)-এর উদ্যোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ হাজার শিক্ষক, বিজ্ঞানী, গবেষক এক যুক্ত বিবৃতিতে অকতারের সংগঠনগুলোর বিজ্ঞানবিরোধিতা (বিশেষ করে বিবর্তনতত্ত্বের বিরোধিতা) আর ইসলামি সৃষ্টিবাদ নামের ছদ্মবিজ্ঞানের উত্থানে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন| বিজ্ঞানীদের এই সম্মিলিত অবস্থানে অকতারের ফাউন্ডেশনটি তখন কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়ে| ক্রিয়েশনিজম নামের ছদ্মবিজ্ঞানের জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তারা তখন বেছে বেছে জীববিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে| মৌলবাদীদের তরফ থেকে অনেক অধ্যাপককে তখন হুমকি দেয়া হয়, নাজেহাল করা হয়| জীববিবর্তন পড়ানোর জন্য অনেক অধ্যাপককে 'কমিউনিস্ট', 'মাওবাদী, 'নাস্তিক' ইত্যাদি বলে উপহাস করে| ক্যারিকেচার ধরনের ছবি সংযুক্ত করে বুলেটিন ছাপায় ফাউন্ডেশনটি| এগুলো আবার হাজার হাজার কপি সুপ্রিম কোর্ট, অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস, সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর, পুলিশ সদর দপ্তর, সরকারি

অফিসগুলোতে প্রেরণ করতে থাকে| অকতারের ফাউন্ডেশনের লাগাতার অপ্রচারে অতিষ্ঠ হয়ে অধ্যাপক আয়কুত কেনসি, অধ্যাপক ইয়ামান ওরস, অধ্যাপক ইসিক বকেসো, অধ্যাপক দিনসার গুলেন, অধ্যাপক উমিত সায়িন, অধ্যাপক সারহাত ওজিয়ার তুর্কির সিভিল আদালতে মানহানির মামলা করে| ১৯৯৯ সালের মে মাসে আদালত ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে রায় দেয় এবং প্রত্যেকে বাদীকে ৬ হাজার ডলার করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেন| আদালতে হেরে গিয়ে ফাউন্ডেশনটি কয়েকটা দিন নিশ্চুপ থাকলেও মৌলবাদী পত্রপত্রিকাগুলো একযোগে বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে 'নাস্তিকতা'র অভিযোগ তুলে প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে| তুরস্কের মৌলবাদীদের মুখপত্র দৈনিক *তশরঃ* অকতারের পক্ষ নিয়ে জীববিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নেয়া অধ্যাপকদের নাম-ঠিকানা ছবি প্রকাশ করে (৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)| পত্রিকাটি অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে ইসলামি আদর্শ ও নৈতিকতাবিরোধী প্রপাগান্ডা চালানো এবং নাস্তিক্যবাদ প্রচারের অভিযোগ আনে|

২০০২ সাল থেকে ক্ষমতায় আছে কট্টরপন্থী রক্ষণশীল দল 'জাস্টিস এন্ড ডেভলাপমেন্ট পার্টি' (একেপি)| ফাউন্ডেশনটি এখন আরো বেশি আক্রমণাত্মক| একেপি'র প্রশ্রয়ে তারা আরো বেশি বেপোরয়া| ফলে পূর্বে যেটুকু ছিটেফোঁটা প্রতিবাদ হয়েছে এখন কোনো বিবর্তনবিদই *ফাউন্ডেশনের* বিজ্ঞানবিরোধিতার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস করেন না| কারণ মৌলবাদী মুসলিমদের থেকে যেমন প্রত্যক্ষ আক্রমণের ভয় আছে তেমনি *বিজ্ঞান গবেষণা ফাউন্ডেশন* থেকেও অপমানিত ও নাজেহাল হতে পারেন| এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে অধ্যাপক আয়কুত কেনসির কথা| বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবর্তন পড়ানোর জন্য যাকে দুইবার 'ধর্মদ্রোহিতা'র অভিযোগ এনে আদালতের মুখোমুখি করেছে অকতারের *ফাউন্ডেশন*| সাথে মৌলবাদীদের হুমকি-ধামকি তো আছেই| একই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক উমিত সায়িনও| কিন্তু তিনি অবশ্য দেশ ত্যাগ করে আমেরিকার উইসকনসিন মেডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজি বিভাগে যোগদান করতে সক্ষম হয়েছেন| সায়িন বলেন, 'অকতারের প্রতিষ্ঠানটি বিবর্তনকে ইহুদি-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, এর মাধ্যমে নাকি নতুন বিশ্বব্যবস্থায় ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম রাখতে চায় সাম্রাজ্যবাদীরা| বহুল প্রচারের কারণে তুরস্কের বিরাট সংখ্যক মানুষ এই ধরনের আজগুবি বক্তব্য বিশ্বাসও করে|' ২০০১ সালে স্বনামধন্য *সায়েন্স* জার্নাল (অকতারের) *বিজ্ঞান গবেষণা ফাউন্ডেশনকে* উত্তর আমেরিকার বাইরে সবচেয়ে শক্তিশালী জীববিবর্তনবিরোধী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে|

অকতারের 'কোরানীয় সৃষ্টিবাদ' প্রচারণার বাইরে আর একটা

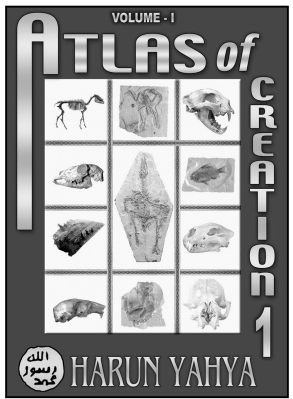

উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে, অদ্ভূতুড়ে কিছু 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' তিনি আমদানি করেছেন| সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তৃতীয় বিশ্বের 'ক্ষুব্দ'

মুসলিম জনতার কাছে| যেমন অকতারের একটা 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' হচ্ছে বিশ্বজুড়ে শাসন-শোষণ আর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য জায়নবাদীরা বিবর্তন তত্ত্ব, বস্তুবাদ, নাস্তিক্যবাদ, অনৈতিক জীবনব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়েছে! কোথায় বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান, কোথায় নাস্তিক্যবাদ আর কোথায় জায়নবাদ-সবগুলোকে এক করে খিচুড়ি বানানোর মতো অবস্থা| অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে এই ধরনের হযবরল মার্কা 'ষড়যন্ত্র তত্ত্বে'র উপর ভিত্তি করে তিনি একটা বইও লিখে ফেলেছেন *Global Freemasonry* শিরোনামে| সাম্প্রতিক সময়ে অকতারের আরো কিছু ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হচ্ছে, বস্তুবাদ এবং ডারউনীয় জীববিবর্তনই বিশ্বসন্ত্রাসবাদকে উস্কে দিচ্ছে! উল্লেখ্য বিশ্বের অন্যান্য সৃষ্টিবাদী সংগঠন (যেমন *ইনস্টিটিউট অব ক্রিয়েশন রিসার্চ*, *ডিসকোভারি ইনস্টিটিউট* ইত্যাদি) অবশ্য এই ধরনের 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' প্রচারে এতোটা খোলামেলাভাবে লিপ্ত নয়|

প্রায় সময় গণমাধ্যমে 'খবর' হওয়ার জন্য এবং আলোচনার বিষয় হয়ে থাকার জন্য দেদারসে টাকা খরচ করে থাকেন আদনান অকতার| যেমন জীববিবর্তন তত্ত্বকে অস্বীকার করে লেখা অকতার তার '*The Evolution Deceit*' বইটির ১০ হাজারের অধিক কপি নিজ দেশে বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন বলে শোনা যায়|

১১.

অকতারের বহুল সমালোচিত '*The Atlas of Creation*' বইটির প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে| প্রকাশক গে-াবাল পাবলিশিং, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক| এই প্রকাশনার কর্ণধারও অকতার নিজে| দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ২০০৭ সালে| ১১×১৭ ইঞ্চির এবং ৬ কেজি ওজনের সম্পূর্ণ গে-াসি কাগজে ছাপানো চকচকে রঙিন ছবিতে ভরপুর আটশ'র অধিক পৃষ্ঠার বই '*অ্যাটলাস অব ক্রিয়েশন*'| বিশ্বের খ্যাতনামা ডজন খানেক বিশ্ববিদ্যালয়সহ আমেরিকা-ইউরোপের প্রায় সবগুলো মেডিকেল স্কুল, বিভিন্ন পাবলিক লাইব্রেরি, বুকস্টল, পত্রপত্রিকা, নামকরা বিজ্ঞানী-গবেষকদের বিনামূল্যে বইটি পাঠিয়েছেন কথিত 'লেখক' অকতার| ফলে কয়েক হাজার কপি বিতরণ করতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়| পার্লামেন্টারি অ্যাসেম্বলি অব ইউরোপের 'সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং শিক্ষা' বিষয়ক কমিটি তাদের 'The dangers of creationism in education' শীর্ষক এক রিপোর্টে (প্রকাশিত ৮ জুন, ২০০৭) উল্লেখ করেছে, 'এই বইয়ের কোনো বক্তব্যই বৈজ্ঞানিক প্রমাণভিত্তিক নয় বরঞ্চ জীববিবর্তনকে অস্বীকার করতে গিয়ে লেখক একদম আদিম সৃষ্টিবাদী বর্ণনাই তুলে ধরেছেন শুধু|' (দ্রষ্টব্য : http://bit.ly/1701wbj)|

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী কেভিন প্যাডিয়ান '*অ্যাটলাস অব ক্রিয়েশন*' সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'যাদের কাছে এই বইয়ের কপি পৌঁছেছে তারা

প্রত্যেকেই খুব বিস্মিত হয়েছেন বইটির আকার এবং উৎপাদন খরচের কথা চিন্তা করে| সাথে সাথে এই বইয়ের ভিতরের মালমশলা দেখেও তারা যারপরনাই অবাক হয়েছেন| অকতারের আসলে জীববিবর্তন সম্পর্কে কোনো ধারণাই নাই| বিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কিভাবে নিশ্চিতভাবে জানতে পারছেন তাও তিনি জানেন না| অকতার যদি একটি কাঁকড়ার ফসিল দেখেন, তাহলে বলবেন, এটা তো দেখতে সাধারণ কাঁকড়ার মতোই লাগছে, এখানে কোনো বিবর্তন হয় নি|' আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী কেনেথ আর মিলার নিজেও বইটি পেয়েছেন| এমন কী তার বিভাগের সকল শিক্ষকও এই বইটি পেয়েছেন| *নিউইয়র্ক টাইমস্*-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলার বলেন, 'খুব সম্ভবত আমেরিকার বুকস্টলগুলি এরকম একটি বইয়ের মূল্য ১০০ ডলারের নীচে কখনো হবে না| সেই হিসাবে বইটির উৎপাদন খরচ নিশ্চয়ই আকাশছোঁয়া| মিলিয়ন ডলার বাজেট অবশ্যই এর পিছনে খরচ হয়েছে|' (দ্রষ্টব্য : কর্নেলিয়া ডিনের 'Islamic Creationist and a Book Sent Round the World' লেখাটি *নিউইয়র্ক টাইমস্* পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে ২০০৭ সালের ১৭ জুলাই| http://nyti.ms/10LD85a)|

অক্সফোর্ডের জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের ঠিকানায়ও *অ্যাটলাস অব ক্রিয়েশনের* কপি পৌঁছেছে| ২০০৮ সালে ডকিন্স একবার তার বক্তৃতায় অপবৈজ্ঞানিক গ্রন্থ '*অ্যাটলাস অব ক্রিয়েশন*'-এর অজস্র ভুলে ভরা তথ্যগুলোর কয়েকটি দেখিয়ে দিলে অকতার চরম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন| এরপর থেকে তিনি ডকিন্সের ওয়েব সাইটের (richarddawkins.net) বিরুদ্ধে 'ব্যক্তিগত আক্রমণ' ও 'ধর্মদ্রোহিতার' অভিযোগ তুলে তরস্কে নিষিদ্ধ করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালান| ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আদালত ডকিন্সের সাইটটি ব্যান করে| (সূত্র : http://bit.ly/vPFJih)| উল্লেখ করা যেতে পারে, পূর্বেও তিনি ডকিন্সের বিরুদ্ধে কোর্টে গিয়ে নালিশ জানিয়েছিলেন| ডকিন্সের জনপ্রিয় বই 'The *God Delusion*'-এ (২০০৬) 'ধর্মের প্রতি অবমাননাকর' বক্তব্য রয়েছে অভিযোগ তুলে একে তুরস্কে নিষিদ্ধের জন্য আদালত গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন তখন|

অকতার তার নিজের লেখা তথাকথিত 'বিজ্ঞানের বই' বিনামূল্যে হাজার-হাজার কপি বিতরণ করে ক্ষান্ত হন নি, আরো 'চমক' দেখানোর জন্য আকাশচুম্বী বাজিও ধরেছেন| ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরে ব্রিটেনের বহুল প্রচারিত দৈনিক '*The Independent*'-এ প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় অকতার ঘোষণা দিয়েছেন কেউ যদি তাকে 'মধ্যবর্তী ফসিলের' কোনো প্রমাণ দিতে পারে তবে পুরস্কার হিসেবে ১০ ট্রিলিয়ন তুর্কি লিরা প্রদান করবেন| (সূত্র : http://bit.ly/10LCULf)| ১০ ট্রিলিয়ন তুর্কি লিরায় ৭.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার! ডলারের হিসাবটা নিয়ে তুলনা করলে দেখা যায়, তুরস্কের গ্রোস ন্যাশনাল প্রোডাক্টের (Gross National Product) চেয়ে অকতারের পুরস্কারটি ৩৬ গুণ বেশি| চীন,

জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, ব্রিটেনের মোট জিএনপি'র যোগফলের চেয়েও বেশি| বিশ্বের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি বিল গেটসের সমস্ত সম্প ত্তির মূল্যের থেকেও ১৩ গুণ বেশি| বিজ্ঞজনের অভিমত মিডিয়ার সামনে 'তুঘলকি কারবার' দেখিয়ে হাইলাইট হবার জন্য অকতারের এই পুরস্কার ঘোষণার নাটকীয়তা| বহু দেশের বিজ্ঞান জাদুঘর, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে হাজারও মধ্যবর্তী ফসিলের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে তা নিশ্চয়ই অকতারের স্মরণে আছে|

অকতারের শুভঙ্করের ফাঁকিযুক্ত 'ফাঁপা বুলি' শুনে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি জে মায়ারস কৌতুকের সুরে বলেন, '*মার্কিন সরকারের উচিৎ একটা পে-ন পাঠিয়ে অকতারকে এক্ষুণি আমেরিকায় নিয়ে আসা| আমেরিকার ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম এবং স্মিথসোনিয়ান-এ নিয়ে গিয়ে নীল এলরেজ, কেভিন প্যাডিয়ান, জেরি কোয়েন, সন ক্যারলসহ এই প্রতিষ্ঠান দুটির অন্যান্য বিজ্ঞানী-গবেষকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া| তারা তাকে শয়ে শয়ে মধ্যবর্তী ফসিলের নমুনা, বৈশিষ্ট্য হাতে হাতে দেখিয়ে দিবেন| এরপর অকতারের কাছ থেকে পুরস্কারের চেকটি নিয়ে দ্রুত ভাঙিয়ে নেয়া উচিৎ| পুরস্কারের টাকা থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলার আমেরিকার বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা কাটাতে ব্যয় করা যেতে পারে| এবং সাত ট্রিলিয়ন ডলার আমেরিকার গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজাতে ব্যয় করা যেতে পারে| পরিশেষে এমন সুন্দর পরামর্শ দেয়ার জন্য আমাকেও কিছু সম্মানী দেয়া যেতে পারে|*'

অকতার দাবি করেন তিনি নাকি ইতোমধ্যে ২ শতাধিক বই লিখে ফেলেছেন! আমরা জানি অকতারের প্রথম বইটি প্রকাশ পেয়েছে ১৯৮৬ সালে| ওই সময় থেকে আজকের ২০১৩ সাল পর্যন্ত গণনায় ধরেও যদি হিসাব করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে গত ২৭ বছরের মধ্যে তিনি প্রতি বছরে গড়ে ৭টি করে বই লিখে ফেলেছেন! বিষয়টি অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক| তবে এই কৌতূহলের উত্তর আমরা ইতোমধ্যে পেয়ে গেছি| একসময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু বার্ক অকতারের লেখক-জীবনের 'গোপন কাহিনি' পশ্চিমা গণমাধ্যমের কাছে অকপটে প্রকাশ করে দিয়েছেন| ব্রিটিশ জার্নাল '*New Humanist*'-এর প্রতিনিধি হালিল আরদের (Halil Arda) সাথে এক কথোপকথনে বার্ক বলেন, '*অকতারের একটা অনুগত দল আছে যারা টাকার বিনিময়ে তাঁকে বই লিখে দেয়| এবং প্রত্যেক বইয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয় পশ্চিমা খ্রিস্টান সৃষ্টিবাদীদের বই কিংবা রচনা থেকে| বিশেষ করে অনুকরণ করা হয় আমেরিকার খ্রিস্টান সৃষ্টিবাদীদের বইগুলো| এইসব বইয়ের যেসব অধ্যায়, প্যারাগ্রাফ অকতারের ইসলামি-সৃষ্টিবাদের সাথে খাপ খায় তা কিছুটা ভাষাগত দিক এদিক-সেদিক করে বসিয়ে দেয়া হয়| এরপর এইসব লেখায় ছবি সংযুক্ত করা হয়| কোরানের আয়াতও বসানো হয় সুবিধামতো| মাঝেমাঝে হয়তো কোথাও কোথাও টীকাভাষ্য সংযুক্ত করা হয়| কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে*

অকতারের কোনো অংশগ্রহণ নেই' (দ্রষ্টব্য : *New Humanist,* Volume 124, Issue 5, September/October 2009)| বার্ক নিজেও একসময় অকতারের এই লেখক-গ্রুপে জড়িত ছিলেন|

১২.

we‡`wk mvsevw`K‡`i mv¶vrKvi w`‡”Qb nvi“b Bqvww.

অকতারের 'অ্যাটেনশন সিকিং' আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ নমুনা আপনাদের সামনে হাজির করছি| ২০০৯ সালের প্রথম দিকে বিশ্বজুড়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের জন্মদ্বিশতবার্ষিকীর পালনের সাজসাজ প্রস্তুতি চলছিল, 'বিবর্তনীয় বিজ্ঞানের প্রতি জিহাদ ঘোষণাকারী' অকতার আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না! ঘোষণা দিলেন পশ্চিমা কোনো গণমাধ্যম যদি তার সাক্ষাৎকার নিতে চায় তবে সেই সাংবাদিকের ইস্তাম্বুলে আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন| শুধু ঘোষণা নয়, স্বনামধন্য বিজ্ঞান জার্নাল *নেচার*, ব্রিটিশ দৈনিক *গার্ডিয়ান*সহ আরো পশ্চিমা অনেক পত্রিকা-সাময়িকীতে দাওয়াতপত্রও পাঠিয়েছেন| (সূত্র : http://bit.ly/3FQKe2)| বিজ্ঞান বিষয়ে অকতারের অনেক বক্তব্য 'প্রলাপের' মতো শোনালেও আমরা দেখতে পাই '*আইরিশ টাইমস্*', '*আমেরিকান ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও*', '*রেডিও আমেরিকা*'সহ আরও কিছু পশ্চিমা মিডিয়ায় অকতারের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে|

পশ্চিমা মিডিয়ায় অকতারের উপস্থিতি দেখে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেও অকতারকে এখন বড়মাপের বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করা শুরু করেছে| যেমন কাতারের *আল জাজিরার* মতো টিভি চ্যানেলে জায়নবাদীদের অপতৎপরতা, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে অকতারকে প্রায়ই ডাকা হয়| এছাড়া মিশরের অনেকগুলো জাতীয় দৈনিক, ইরানের *প্রেস টিভি*, *রেডিও উম্মাহ*, *রেডিও রামাদান*-এ নিয়মিত হাজির হন অকতার|

অকতারের বিপুল পরিমাণ বিত্তবৈভবের উৎস কোথায় তা নিয়ে জোর সন্দেহ রয়েছে| যদিও তিনি দাবি করেন তার সব কার্যক্রম নাকি অনুদানের টাকায় চলে| কিন্তু কারা দিচ্ছে এতো বড় অংকের অনুদান আর কেনইবা দিচ্ছে এ বিষয়ে অকতার এবং তাঁর ফাউন্ডেশন নিশ্চুপ| যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে অর্থাভাবে বিজ্ঞান

মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাকালীন সময়ে হারুন ইয়াহিয়া

গবেষণায় বিনিয়োগ করতে পারছে না, সেখানে এইসব অপবিজ্ঞান আর ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচারের জন্য কোটি কোটি টাকা অবলীলায় খরচ করা হচ্ছে দেখে স্বাভাবিকভাবে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে| লক্ষ্য কী তাহলে অকতারের স্বপ্নপূরণ? ২০০১ সালে ৯/১১-এ টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে অকতার তার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর জায়নবাদবিরোধী কট্টর অবস্থান কিছুদিনের জন্য চাপা দেন| আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানান| এ জন্য বাহবাও পেয়েছেন কয়েক জায়গা থেকে| আমেরিকান কংগ্রেসের অবসরপ্রাপ্ত সিনেটর স্টিভ সিমস অকতার সম্পর্কে 'তুরস্কের তরুণ জনগণের উপর বিরাট প্রভাববিস্তারকারী' বলে উল্লেখ করে প্রশংসাবাণী প্রেরণ করেছেন| তিনি এখন তুরস্কের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রধান নেতা| তবে তার দীর্ঘদিনের একটি লালিত স্বপ্ন এটা এখন ওপেন সিক্রেট-তুরস্কের উসমানীয় যুগের আদলে নতুন সাম্রাজ্য কায়েম করা| ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত তুরস্কের নেতৃত্বে গঠিত হবে 'ইসলামিক *ইউনিয়ন*'| যার বিস্তৃতি হবে পূর্ব রাশিয়া থেকে পশ্চিম নাইজেরিয়া পর্যন্ত|

১৯৯৬ সালে ফাউন্ডেশন থেকে '*গণহত্যার মিথ্যাচার* (*Soykırım Yalanı*) প্রকাশ করা হয়| এই বইয়ে দাবি করা হয় : '*জায়নবাদীরা আমাদেরকে যে ইতিহাস শেখায় আসলে তা ঘটে নি| দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নাৎসি বাহিনী ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করে নি| ওই সময় কিছু ইহুদি নাগরিক মারা গিয়েছিল প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে আর যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হবার পর যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার কারণে|*' বইটি প্রকাশের পর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তুর্কি বুদ্ধিজীবী মহলে| খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী ও বুদ্ধিজীবী বেদ্রি বেক্যাম (Bedri Baykam) সংক্ষুব্ধ হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন| ইতিহাস বিকৃতিকরণের অভিযোগে আদালত বইটির লেখক অকতারকে সতর্ক করে দেয়| অবশ্য মামলাটি পরের বছর খারিজ করে দেয়া হয়| কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য ২০০৭ সালে ২০ আগস্ট অকতার ব্রিটেনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে একদম ভোল পাল্টে ফেলেন| দাবি করেন '*গণহত্যার মিথ্যাচার*' বইটি আসলে তার লেখা নয়| *Der Spiegel* পত্রিকায় (২৬ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে প্রকাশিত) তিনি নিজেই নিজের গুমোর ফাঁস করে বলেন ফাউন্ডেশনের অন্য একজন সদস্য নিজের নাম গোপন রেখে *গণহত্যার মিথ্যাচার* বইটি লিখেছে| তিনি শুধু উদ্যোগ নিয়ে লেখক হিসেবে 'হারুন ইয়াহিয়া' নামটি বসিয়ে বই প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন| এর বেশি কিছু করেন নি|

১৩.

অকতার শুধু যে ইসলামি ক্রিয়েশনিজম নিয়েই পড়ে আছেন তা নয়| তার জীবনের উত্থানের শুরু থেকে সক্রিয় মস্তিষ্ক ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন জায়গায়| এ রকম কয়েকটি ঘটনার কথা এক ঝলক দেখে নেয়া যাক| ১৯৮৬ সালের গ্রীষ্মে অকতারকে

গ্রেফতার করা হয়েছিল ধর্মীয় জিগির তুলে মৌলবাদী আন্দোলন চাঙ্গা করার অভিযোগে| এসময় তিনি প্রায় ১৯টি মাস জেলে ছিলেন| জেলে থাকাকালীন সময়ে ভর্তি হয়েছিলেন বাকিরকয় মানসিক হাসপাতালে| কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার ও সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা হয়েছিল তার| পুরানো বন্ধু ও একসময়ের ইসলামি আন্দোলনের সাথী ইরিপ জুকশেলও ছিলেন একই সাথে একই জেলে| জুকশেল অকতারের

cywj‡ki nv‡Z a„Z nvi“b

তৎকালীন মানসিক-চিকিৎসা গ্রহণ নিয়ে গুরুতর সন্দেহ পোষণ করে বলেন আদালতের বিচার থেকে রেহাই পেতে অকতার এই নাটক করেছিলেন| তাকে 'ডিলিউশনাল ম্যানিয়াক' বলে আখ্যায়িত করে জুকশেল আরো বলেন, সে নিজেকে 'ইমাম মাহদি' বলে বিশ্বাস করে! ১৯৯১ সালে অকতার পুনর্বার গ্রেফতার হন মাদক দ্রব্য কোকেন রাখার দায়ে| কিছুদিন জেল খেটে মুক্তি পান অকতার| ১৯৯৯ সালে কয়েকজন সহযোগীসহ তিনি গ্রেফতার হন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে ব্যক্তিস্বার্থে এবং অবৈধভাবে ব্যবহারের জন্য| ভিন্নমতপোষণকারীদের হুমকি-ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা হয়| বছর দুয়েক আদালতে মামলা চলার পর এটি একসময় বাতিল হয়ে যায়| ২০০৮ সালে পূর্বের মামলাটি আবার সচল হয়| এবার তার বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান ও ব-্যাকমেইলের অভিযোগ যুক্ত হয়| একসময়ের পরিচিত ও ফ্যাশন মডেল ইব্রু সিমসেক অকতারের মতাদর্শের সাথে ভিন্নমত পোষণ করলে তাকে হেনস্থা করা হয় অত্যন্ত জঘন্যভাবে| সিমসেককে 'যৌনকর্মী' উল্লেখ করে নগ্ন ছবি ছাপিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেল, বড়বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বিদেশি দূতাবাসে পাঠানো হয় ফাউন্ডেশন থেকে| কেন এই ঘৃণ্য আচরণ? জানা গেছে অকতারের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনে রাজি হন নি বলেই সিমসেককে এরকম অপমান করা হয় সামাজিকভাবে| এছাড়া আরো অভিযোগ রয়েছে, ফাউন্ডেশনের নারী সদস্যদেরকে দিয়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকদের মনোরঞ্জনের টোপ গেলানো হতো| তারপর গোপন ক্যামেরায় তাদের শারীরিক সম্পর্কগুলো রেকর্ড করা হতো| যেসব সদস্য অকতারে সংগঠন থেকে বের হয়ে যেতে চাইতো তাদের ভিডিও টেপ বাজারে ছেড়ে দেবার হুমকি দিয়ে মুখ বন্ধ করা হতো| ২০০৮ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি আদালত অকতারের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ শোনেন| অকতারের সাথে '*বিজ্ঞান গবেষণা ফাউন্ডেশন*'-এর আরো ১৭ জন সদস্যও প্রতারণার অভিযোগে আটক হন| আদালত ব্যক্তিস্বার্থে অবৈধ সংগঠন চালানোর জন্য অকতারকে অভিযুক্ত করে| তিন বছরের জেল দেয়া হয় অকতারসহ বাকি ১৭ সদস্যকে| রায়ের বিরুদ্ধে

উচ্চ আদালতে আপিল করেন অভিযুক্তরা| ২০১০ সালের মে মাসে প্রতারণার মামলা থেকে ছাড়া পেয়েছেন অকতার গংরা|

১৪.

জীবন-জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া আমরা অসহায়| বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞান, ওষুধবিজ্ঞান, রোগতত্ত্ব সবই এখন অকেজো| এই বক্তব্য কট্টরপন্থীরা মানুক আর না-মানুক বিজ্ঞানীরা ঠিকই মানেন| তাই জীববিজ্ঞান বুঝতে হলে অবশ্যই বিবর্তন অধ্যয়ন জরুরি| ক্রিয়েশনিজম দিয়ে যেমন কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জিত হয় না তেমনি এটিকে ব্যবহার করে কোনো ফল পাওয়া যাবে না| এটা বলতে দ্বিধা নেই বাইবেলীয় ক্রিয়েশনিজমের মতো ইসলামি ক্রিয়েশনিজম শুধু আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য হুমকি তা নয়, সাথে সাথে এটা তুরস্কের দীর্ঘদিনের লালিত গণতন্ত্র ও সেক্যুলার আদর্শের জন্য বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিয়েছে| এর উপরই ভিত্তি করে মৌলবাদী সংগঠনগুলো প্রচারের আলোয় আসতে পেরেছে| অব্যহতভাবে নিজেদের ডানপন্থী আদর্শ প্রচারণার যেমন সুযোগ পেয়েছে তেমনি নিজেদের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে পেরেছে মাঠপর্যায়ে| তুরস্কে চলমান বিজ্ঞানবিরোধিতা আর ছদ্মবিজ্ঞানকে যদি এখনই রুখে দেয়া না যায় তবে একজন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ যেমন ক্রমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বেন তেমনি গোটা সমাজটাই বিজ্ঞানবিছিন্ন হয়ে পড়েবে স্বাভাবিকভাবে| এই সমস্যা শুধু তুরস্ককেই ভোগাবে না, অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশকেও গুণতে হবে এর ভয়াবহ পরিণাম| আর আজকের যুগে বিজ্ঞানবিছিন্ন হয়ে থাকার ফলাফল নিশ্চয় ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রই জানেন| আদিম গুহাযুগে নিশ্চয়ই কেউ আর ফিরে যেতে চান না| আদনান অকতারের মত ব্যক্তিরা যতই ধর্মকর্ম আর বিজ্ঞানের ফুলঝুরি ফুটাক না কেন আদতে তুরস্ক কিংবা অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর জন্য তারা গলার মালা নন, বরং গলার কাঁটা-এ বিষয়টা জনতা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবেন ততই মঙ্গল| অতএব সময় থাকতে সচেতন হওয়া ভালো|

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এ রচনাটি লিখতে তথ্যসহায়তা নেয়া হয়েছে আমেরিকার *ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন* সংস্থার '*Reports of the National Center for Science Education*' দ্বিমাসিক পত্রিকা নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'Islamic Scientific Creationism' শিরোনামের লেখা থেকে (পৃষ্ঠা ১৮-২০, ২৫-২৯)| পত্রিকাটির বর্তমান সম্পাদক ইউজিন স্কটের কাছ থেকে এজন্য যথাযথ অনুমতি গ্রহণ করা হয়েছে| নিবন্ধটির লেখক অধ্যাপক উমিত সায়িন এবং আয়কুত কেনসি'র কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি|]

অনন্ত বিজয় দাশ : সম্পাদক *যুক্তি*| সাধারণ সম্পাদক, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল| আগ্রহের বিষয় জীববিবর্তন, বিজ্ঞানের সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞানের ইতিহাস| প্রকাশিত গ্রন্থ : *সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও বিপ্লব : লিসেঙ্কো অধ্যায়* (২০১২, শুদ্ধস্বর), ঢাকা| *পার্থিব* (সহলেখক সৈকত চৌধুরী, ২০১১, শুদ্ধস্বর), ঢাকা| সম্পাদিত গ্রন্থ *ডারউইন : একুশ শতকে প্রাসঙ্গিকতা এবং ভাবনা* (২০১১, অবসর), ঢাকা|

হারুন ইয়াহিয়ার 'সৃষ্টির মানচিত্র'

মূল : ম্যাট কার্টমিল

অনুবাদ : অনন্ত বিজয় দাশ

একজন জীববিজ্ঞানীর পক্ষে জীববিবর্তনকে বিরোধিতা করে সৃষ্টিবাদী আক্রমণের (লেখার) পর্যালোচনা করা আর একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর (astronomer) পক্ষে সমতল পৃথিবী দাবি করে লেখা একটি বইয়ের পর্যালোচনা করা প্রায় একই ধরনের কাজ| পৃথিবী সমতল বলে যারা দাবি করে, ভুল একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তারা শতাধিক ভুল যুক্তির অবতারণা করে থাকে| তবে এসব বিভ্রান্তিকর যুক্তির শতাধিক সমুচিত জবাব দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোও সম্ভব| বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ের কোনো বিষয়ের পাঠ্যবই লেখার মতো স্বীকৃতিবিহীন বেগার খাটুনির মত বলে এই ধরনের ভুল ধারণাকে খণ্ডন করার উদ্যোগ খুব একটা দেখা যায় না| কিন্তু যদি দেখা যায় সমতল পৃথিবীর প্রবক্তা বা জীববিবর্তন-বিরোধীদের বইয়ের রয়েছে বিশাল সংখ্যার আগ্রহী শ্রোতা ও ভক্ত-অনুসারী, তখন -'ওইসব বই ভুয়া ও বিকৃত, এগুলোকে এড়িয়ে যাও!' এরকম বলে দেয়াই যথেষ্ট হবে না| কারণ ওইসব ভুয়া ও বিকৃত ধারণাই এক সময় অন্ধ করে ফেলবে সবাইকে| অতএব এই বিকৃতিকে বিনাশ করতেই হবে|

আমি শুনেছি তুরস্কে আদনান অকতার (হারুন ইয়াহিয়া তাঁর লেখালেখির ছদ্মনাম) ও তাঁর '*সৃষ্টির মানচিত্র*' (*Atlas of Creation*, 2007a) বইটির বিশাল অনুসারীগোষ্ঠী রয়েছে| এতোই বিশাল যে (তার কথা অনুযায়ী) তুরস্কের আদালত সে দেশে অক্সফোর্ডের প্রসিদ্ধ জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের ওয়েব সাইট পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়| কারণ অকতার আদালতে গিয়ে নালিশ করেছিলেন যে ডকিন্সের ওয়েব সাইটের বিষয়বস্তুগুলো তাঁর জন্য মানহানিকর! ডকিন্স তাঁর ওয়েব সাইটে অকতারের '*সৃষ্টির মানচিত্র*' বই সম্পর্কে যেসব 'আক্রমণাত্মক' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলো হচ্ছে (বইটি) 'উদ্ভট'(preposterous), 'অন্ত সার-শূন্য'(inaner)| (ডকিন্সের সাইটে প্রকাশিত 'Venomous Snakes, Slippery Eels and Harun Yahya' শিরোনামের লেখাটির জন্য হারুন ইয়াহিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে আদালত পর্যন্ত দৌড়েছিলেন| লেখাটি পাশের লিংক থেকে পড়া যাবে : http://bit.ly/13vHY7t| এবং 'সৃষ্টির মানচিত্র' বইটি নিয়ে ডকিন্সের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য শুনুন ইউটিউব থেকে : http://bit.ly/mSn8V|-অনুবাদক)|

পশ্চিমের দেশগুলিতে প্রচুর রক্ষণশীল খ্রিস্টান সৃষ্টিবাদী রয়েছেন যারা মনে করেন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরান আর চার্লস ডারউইনের লেখা '*অরিজিন অব স্পিসিজ*' (১৮৫৯) দুটো একই রকম শয়তানি কাজ| আমি নিশ্চিত যখন তারা শুনবে ইসলামেও বিশাল আকাড়ে এবং প্রচুর অর্থকড়ি ব্যয় করে ডারউইনের বিরোধিতা করা হচ্ছে তখন তারা সত্যি অবাক হয়ে

যাবে| খ্রিস্টান সৃষ্টিবাদীদের কেউ যদি আদনান অকতারের বিশাল *সৃষ্টির মানচিত্র* বইটি দেখে তবে তারা নিজেদের (এ বিষয়ে) একই মতের বলে মনে করবে| জীববিবর্তনের বিরোধিতা করে অকতার তাঁর বইয়ে যা কিছুই বলতে চেয়েছেন তা নতুন কিছুই নয়| এর সবই গত একশো বছর ধরে খ্রিস্টান-সৃষ্টিবাদীরা বলে আসছেন| বরং খ্রিস্টান সৃষ্টিবাদীরা আরো অনেক দক্ষতা ও ধূর্ততার সাথে এগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে| তফাৎটা এখানে যে খ্রিস্টান সৃষ্টিবাদীরা তাদের বই নিয়ে এতো ব্যয়বহুল প্রচারণা চালাতে যান না|

অকতার অবশ্য বেশিরভাগ খ্রিস্টান সৃষ্টিবাদীদের মতো নবীন-পৃথিবীর সৃষ্টিবাদে বিশ্বাসী নন| (নবীন-পৃথিবীর সৃষ্টিবাদীরা মনে করেন, পৃথিবীর বয়স মাত্র হাজার দশেক বছর-অনুবাদক|) অকতার পুরাতন-পৃথিবীর সৃষ্টিবাদে বিশ্বাসী| এজন্য তিনি ভূবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো ঠিকই মেনে নিয়েছেন আবার জীববিজ্ঞানকে অস্বীকার করছেন| অকতার তাঁর বইয়ে কবুল করেছেন আমাদের মহাবিশ্ব হাজার কোটি বছর পুরানো এবং পৃথিবীতে প্রাণ এসেছে মিলিয়ন বছর আগে| এও স্বীকার করেছেন পুরাতন প্রাণীকুল দেখতে আধুনিক প্রাণীকুলের মতো হয় না এবং যতই আমরা অতীতে যাব প্রাণীকুল ততোই কম-আধুনিক বলে মনে হবে|

প্রাণীকুলের এই অনুবর্তন মাত্র দুটি পথে ব্যাখ্যা করা যায়| একটা হচ্ছে পুরাতন প্রজাতির প্রাণীকুলের মৃত্যুর পর নতুন প্রজাতির প্রাণীকুল এই স্থান দখল করে নিচ্ছে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পুরাতন প্রজাতি থেকে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটছে| দ্বিতীয় পয়েন্টটি আমাদের বিবর্তনের দিকে ঠেলে দেয়| হয়তো অকতার প্রাণীকুলের এই অনুবর্তনের ব্যাপারে প্রথম সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করবেন| কিন্তু প্রথমটি গ্রহণ করলে বেশকিছু পাল্টা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সৃষ্টি হয়| যেমন নতুন প্রজাতির প্রাণীকুল কিভাবে, কোথা থেকে অস্তিত্বশীল হলো? স্বাভাবিকভাবে অকতার এই প্রশ্নটির প্রতি কখনোই সরাসরি মনযোগ দেন নি| তাঁর গোটা বইয়ে একটা তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রাগৈতিহাসিক অলৌকিকতাকে সমর্থন করে গেছেন এবং বুঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বর একসময় ট্রাইলোবাইটকে পৃথিবীর প্রাণীকুল থেকে বিলোপ করেছেন এবং তার স্থলে নতুন প্রজাতির ক্রাস্টেশন (শক্ত খোলকের কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী) স্থাপন করেছেন| একইভাবে 'অলৌকিক ইশারায়' প্রাণীজগৎ থেকে (প্রায় ২০ কোটি বছর আগে ক্রিটাশিয়াস পিরিয়ডের দিকে) বেলামনেইটের (Belemnites) বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্কুইডকে (অক্টোপাস জাতীয় প্রাণী) স্থাপন করা হয়েছে, মৎস-আকৃতির সামুদ্রিক সরীসৃপদের সাফ করে কিছু পরে মৎস-আকৃতির সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে| আর এভাবে ক্রমাগত চলছিল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে| অতিলৌকিক সৃষ্টি কার্যক্রমে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর বিলুপ্তি আর আবির্ভাব ঘটে চলেছে|

কেন (নতুন জীবগুলির) এমন আজগুবি সূচনার কথা আমরা মেনে নেব (যা সম্পূর্ণ কল্পনাশ্রয়ী)? গায়েবি জিনিস থেকে নতুন জীবের উৎপত্তির কথা ভাবার চেয়ে বেঁচে থাকা জীবের ক্রম-পরিবর্তন থেকে তাদের উৎপত্তির সম্ভাবনা দেখা বেশি যুক্তিযুক্ত নয় কি? একই সঙ্গে ভূবিজ্ঞানকে (সত্য বলে) মেনে নেয়া কিন্তু জীববিবর্তনকে অস্বীকার করার ফলে ঈশ্বরের যে চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তা মোটেও আকর্ষণীয় কিছু নয়| দেখা যাচ্ছে অকতারের ঈশ্বর বারবার ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, অপর্যাপ্তভাবে সৃষ্টি করে চলছেন লক্ষ প্রজাতি আবার এদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে শোধরানোরও চেষ্টা করছেন যুগের পর যুগ| সর্বশক্তিমান ও সবজান্তা ঈশ্বরের চিরায়ত ধারণার সঙ্গে এই ঈশ্বরকে মেলানো যায় না|

বেপরোয়া মতামত

বিবর্তনের বিরুদ্ধে অকতারের বেশিরভাগ মতই ভয়ঙ্কর| বেশিরভাগ আদৌ কোনো যুক্তি নয়, নিজের গভীর বিশ্বাসের প্রকাশ মাত্র, যা কোনো বিজ্ঞানসম্মত অর্থ প্রকাশ করে না| ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন ভাবধারার কিছু পুরাতন-পৃথিবীর সৃষ্টিবাদী রয়েছেন, যারা লেখালেখি করতে গেলে কিছুটা পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আসেন| বিবর্তনের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের লেখাগুলোর প্রতি মাঝে মাঝে চোখ বুলিয়ে নেন| কিন্তু অকতারের বইটি সেরকমটি নয়| এই বইয়ের বক্তব্যের মূঢ়তা একে এতোই জটিল করে ফেলেছে যে সমালোচনা করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে| মার্কিন দার্শনিক জন সিয়ার্ল এ ধরনের বিষয় উপলব্ধি করেই হয়তো বলেছিলেন :

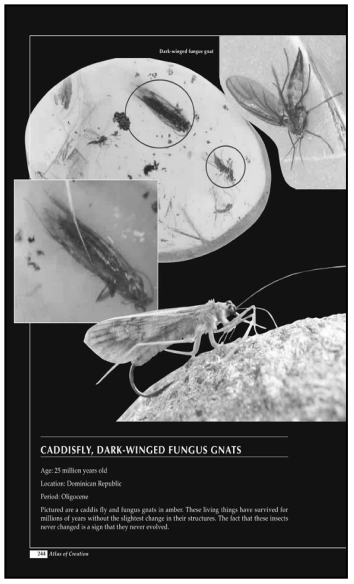

একটি ভয়ঙ্কর আবোলতাবোল বিরুদ্ধমতের চেয়ে একটি খারাপ (নিম্নমানের) যুক্তি খণ্ডন করা অনেক সহজ কাজ|

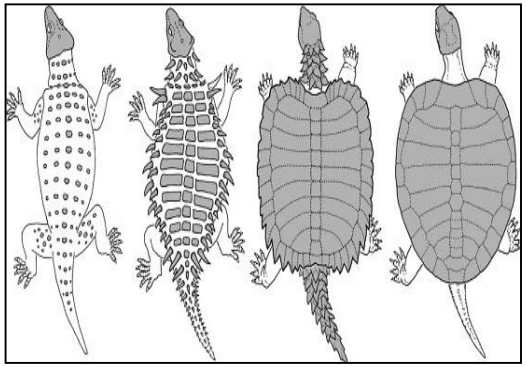

নিম্নমানের যুক্তিরও পর্যাপ্ত কাঠামো থাকে, যা থেকে এর দুর্বলতা ও অসারত্বকে চিহ্নিত করা যায়| কিন্তু অর্থহীন আক্রমণাত্মক মতের ক্ষেত্রে প্রথমে তোমাকে প্রস্তাবনাটিই পুনর্গঠন করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে এর আসল

> বক্তব্যটি পরিষ্কার হয়| তারপর ধীরে ধীরে এগুতে হবে খণ্ডনের দিকে | (Searle 2009:89)

আমি এখানে অকতারের দেয়া সবগুলো মিথ্যা ভাষণ পুনর্গঠন করতে যাচ্ছি না| গুটি কয়েক উদাহরণ শুধু দিতে পারি| অকতার তাঁর বইয়ে দেখাতে চেয়েছেন জীববিবর্তন একটি ভুয়া বিষয়, কারণ অনেক ফসিল রয়েছে যেগুলো জীবন্ত প্রাণীদের মতোই দেখতে| অকতারের বইয়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য এবং এই আলোচ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি তার ৮০০ পৃষ্ঠার বইয়ের ৭০০ পৃষ্ঠাই ব্যয় করেছেন| '*সৃষ্টির মানচিত্র* বইয়ে প্রচুর ফসিলের উজ্জ্বল আলোকচিত্র দেয়া হয়েছে এবং এর পাশে সঙ্গতিহীনভাবে বর্তমানকালের জীবিত উদ্ভিদ-প্রাণীর ছবি| সঙ্গে রয়েছে ছবির পরিচিতিমূলক ছোটোখাটো বর্ণনা| যেমন একটা জায়গায় রয়েছে কিছু ক্রিনয়েড (ইকাইনোডার্মাটা পর্বের সমুদ্রতারা প্রাণীর মতো দেখতে) ফসিলের পাশে অ্যানেলিডা পর্বের দেহখণ্ডকিত কীটের ছবি| এখানে অসঙ্গতি হচ্ছে- জীববিজ্ঞানের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী ক্রিনয়েডর সঙ্গে আমার মতো স্তন্যপায়ী জীবের দূরত্বের চেয়েও অ্যানেলিডা পর্বের প্রাণীর দূরত্ব বেশি| অকতার তাঁর *সৃষ্টির মানচিত্র* বইয়ের ২৪৪ পৃষ্ঠায় ক্যাডিস ফ্লাইয়ের (মথের মতো দেখতে পোকা) ছবি ব্যবহার করেছেন| ওই ছবির পোকাটির উদরে বড় বড়শি আটকানো রয়েছে, মাছ ধরার সময় বড়শিতে যে রকম কেঁচো বা ওই ধরনের কীট গাঁথা হয়| ফলে একে ডিম্বস্থাপকের মতো লাগছে| আবার ৫২৫ পৃষ্ঠায় একটি ক্রিটাসিয়াস যুগের জলজ কচ্ছপের ফসিলের পাশে আধুনিক যুগের গ্যালাপোগাস কচ্ছপের ছবি দেখানো হয়েছে| জলজ কচ্ছপের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ সেন্টিমিটার হবে আর গ্যালাপোগাসের স্থল কচ্ছপের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১ মিটার এবং ওজন প্রায় ২৫০ কেজির মতো| ছবি দুটির নীচের বর্ণনা হচ্ছে :

> প্রাচীন কচ্ছপের ফসিলটি ১৪৬ থেকে ৬৫ মিলিয়ন বছর পুরাতন এবং এর সাথে আজকের যুগের কচ্ছপ দেখতে হুবহু এক রকম, কিন্তু ডারউইনবাদীরা এই বিষয়টি মানতে অনীহ| জীবিত প্রাণীরা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পরিবর্তিত হয় নি| অর্থাৎ তারা কখনোই বিবর্তিত হয় নি| (পৃষ্ঠা ৫২৫)

অকতারের বইয়ে উল্লেখিত অসংখ্য ভয়ঙ্কর আবোলতাবোল যুক্তির মধ্যে এটি একটি মোক্ষম উদাহরণ| কেমন করে তিনি ভীষণভাবে ভিন্ন দুটি প্রাণীর ছবি পাশাপাশি বসিয়ে দাবি করতে পারলেন যে প্রাণী দুটি অভিন্ন (Identical)? যদি তা হয়েও থাকে তবু তিনি কেমন করে প্রমাণ করবেন যে- এরা ভিন্ন চেহারার কোনো পূর্বপুরুষ প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয় নি?

অকতারের উপরোক্ত মিথ্যা ভাষণকে কিছুটা হয়তো পুনর্গঠন করা যেতে পারে| শুরুটা এভাবে করতে পারি, অকতার হয়তো আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন ফসিল কচ্ছপ আর (গ্যালাপোগাসের) জীবিত কচ্ছপ দুটো দেখতে 'একরকম'| কিন্তু

তিনি বলতে পারেন না, এরা একই প্রজাতির দুটো কচ্ছপ| কারণ আজকের যুগের কচ্ছপ বলতে শুধু একটি প্রজাতির কচ্ছপকে বোঝায় না| (পৃথিবী জুড়ে বর্তমানে কচ্ছপের কমপক্ষে ২৬০ টি প্রজাতি রয়েছে| -অনুবাদক) আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দুটি প্রাণী 'একরকম' বলতে অকতার যা বোঝেন তা হচ্ছে—দুটি কচ্ছপকেই জীবের শ্রেণীবিন্যাসের একই পর্যায়ে স্থাপন করা যাবে| এক্ষেত্রে একজন প্রাণীবিজ্ঞানীর বক্তব্য হচ্ছে, এই দুটো প্রাণী সরীসৃপদের 'চেলোনিয়া' মহাবর্গের (superorder) অন্তর্ভুক্ত| উৎপত্তির দিক থেকে সকল প্রজাতির কচ্ছপই চেলোনিয়| যেহেতু প্রাণীবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুসারে পূর্বের চেলোনিয়ান কচ্ছপ এখনো চেলোনিয় মহাবর্গের মধ্যে রয়েছে, অতএব এদের কোনো পরিবর্তন হয় নি! এই আবোলতাবোলের মধ্যে দিয়ে অকতার বোধহয় আমাদের এরকম কিছুই বোঝাতে চেয়েছেন|

অকতারের অনুসিদ্ধান্তটি যুক্তির পরম্পরা অনুসরণ করে নেয়া হয় নি| ক্রিটাসিয়াস যুগে শুধু কচ্ছপ নয়, পাখি, স্তন্যপায়ীসহ আরো অনেক ধরনের প্রাণী ছিল| এদের কেউই তাদের আধুনিক যুগের আত্মীয়দের সঙ্গে 'অভিন্ন' (বৈশিষ্ট্যের) নয়; বরং বেশিরভাগই এদের চেয়ে অনেক আদিম পর্যায়ের| প্রাণীজগতের প্রত্যেক গোত্রের প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রাচীনতম যেসব ফসিল পাওয়া গেছে সেসব প্রাণীর দেহবৈশিষ্ট্য বর্তমান সময়ে তাদের গোত্রের প্রাণীদের চেয়ে অনেকটা ভিন্ন ও আদিম| অনেক প্রাচীন পাখির দাঁত, ডানায় তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত আঙুল, লম্বা হাড়যুক্ত লেজ ছিল যা তাদের পূর্বসূরি ডায়নোসরদের মতো দেখতে| (আধুনিক যুগের পাখিদের দাঁত নেই, লম্বা হাড়যুক্ত লেজ নেই, ডানায় তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত আঙুল নেই|-অনুবাদক)| আবার প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চোয়ালের সংযোগস্থল, কাঁধের চ্যাপ্টা অংশ এবং পেষক দাঁত ইত্যাদি তাদের পূর্বসূরি সরীসৃপদের মতোই দেখতে ছিল| অকতার কচ্ছপের যে উদাহরণটি টেনেছেন তা মোটেও যুৎসুই উদাহরণ হয় নি| এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন প্রায় ২২০ মিলিয়ন বছর পুরাতন চেলোনিয় ফসিল পাওয়া গেছে চীনে| প্রাণীবিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন '*Odontochelys*'| আধুনিককালে যে কোনো জীবিত কচ্ছপের থেকে এর বৈশিষ্ট্যগুলো আদিম| (Li and Others 2008)| এর কোনো ঠোঁট ছিল না, আদর্শ সরীসৃপদের মতো চোয়ালে দাঁত ছিল, এর পাঁজরগুলো আলাদা ছিল এবং পিঠের শক্ত খোলস জোড়া লাগানো ছিল না| অকতার তাঁর বইয়ে এই ফসিলের ছবি ব্যবহার করতে পারেন নি, কারণ তাঁর বই প্রকাশিত হওয়ার পরে *Odontochelys* ফসিলের বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে| কিন্তু আমার সন্দেহ আছে অকতার কি তাঁর বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে এই ফসিলের কথা তুলে ধরবেন? *Odontochelys* ফসিল থেকে এটা স্পষ্ট যে আজকের যুগের কচ্ছপদের সাথে *Odontochelys* মোটেও 'অভিন্ন' নয়|

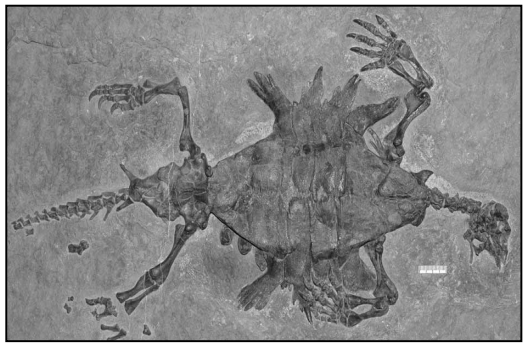

চীন থেকে উদ্ধারকৃত ২২ কোটি বছর পুরাতন *Odontochelys*

অকতার যদি তাঁর বইয়ে প্রাচীন কচ্ছপদের কথা তুলে ধরেনও, তবু হয়তো তাঁর বইয়ের বেশিরভাগ পাঠক এই বিশ্বাসে স্থির থাকবেন যে প্রাচীন আর আধুনিক যুগের কচ্ছপগুলি 'অভিন্ন'। *সৃষ্টির মানচিত্র* বইয়ের কতজন পাঠক জানেন যে কচ্ছপের কঙ্কাল দেখতে কেমন হয়? আসলে কচ্ছপের পিঠের শক্ত খোলসটি তৈরি হয় ভ্রূণাবস্থায় এর মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়গুলো একীভূত হয়ে সেটা কি তারা জানেন? এমন কি বর্তমানকালের জীবিত কচ্ছপদের যে দাঁত নেই, সেটাই বা কতজন জানেন? অকতার নিজেও এমনতর প্রশ্নের প্রত্যাশী নন। তিনি এমন কোনো উদাহরণ হাজির করবেন না যা তার দেয়া বর্ণনার বিরুদ্ধেই বিশ্লেষণী অনুসন্ধানের জন্ম দেয়। যেসব পাঠক কচ্ছপের অঙ্গসংস্থান সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন তারাও অকতারের বই পড়ে বেশিরভাগ সময় বুঝতে পারবেন না ঐ ফসিল এবং জীবিত প্রাণীর ছবি দুটিতে কতটুকু মিল রয়েছে। কারণ অকতার একটি কচ্ছপের কঙ্কালের অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট ছবি ব্যবহার করেছেন, আর বাইরের দিকের ছবি দিয়েছেন অন্য অন্য একটি কচ্ছপের। একটা শর্তে তিনি অবশ্য দাবি করতে পারেন তাঁর দেয়া দুটো কচ্ছপই 'সাদৃশ্যপূর্ণ', কারণ ছবি দুটোর আউট লাইনের মধ্যে মিল আছে!

অকতারের দৃষ্টিতে সকল কচ্ছপ 'অভিন্ন' জীব, কারণ তারা সকলেই সরীসৃপের একই উপশ্রেণীর (সাবগ্রুপ) অন্তর্ভুক্ত। ৫২৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ছবি দুটির মধ্যে এটা কোনো বড় পার্থক্যের বিষয় নয়। অকতারের দাবিটা অনেকটা এরকম-মানুষ আর ইঁদুর দুটি জীবই 'অভিন্ন'! কারণ তারা দুজনেই স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর একই মহাবর্গে (Euarchontoglires) অবস্থান করছে। অকতারের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে অন্য কেউ হয়তো বলতে পারে '*ক্রিটাসিয়াস যুগের (১৩.৫ কোটি বছর আগে থেকে ৬.৫ কোটি বছর আগ পর্যন্ত বিস্তৃত) স্তন্যপায়ী জীব আর বর্তমানকালের স্তন্যপায়ী জীব দুটি 'অভিন্ন', কারণ এই দুটো জীবই তো স্তন্যপায়ী।*' মোদ্দা কথা হচ্ছে - জাঁকজমকপূর্ণ চিত্রবহুল বইটিতে অর্থহীন কতগুলো ছবি ব্যবহার করে অকতার আমাদের বোঝাতে চাচ্ছেন : "*দূরবর্তী অতীতে এক ধরনের কচ্ছপ ছিল এবং আজকের যুগেও সে ধরনের কচ্ছপই আছে, তাই জীববিবর্তন 'রূপকথা' ছাড়া আর কিছুই নয়!*"

প্রমাণের খোঁজে

(প্রাচীন ফসিল ও বর্তমানে জীবিত) প্রাণীদের 'সাদৃশ্য' নিয়ে অকতারের কোনো দাবিই আসলে প্রমাণসম্মত নয়। মনগড়া বক্তব্যে ভরপুর তাঁর বই। যেমন বইয়ের ১৮ নং পৃষ্ঠায় তিনি একটি ব্যাঙের ফসিলের ছবি ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন এটি নাকি আজ থেকে ২৮ কোটি বছর আগের! অথচ ব্যাঙ-সদৃশ উভচর জীবের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন একক যে ফসিলের নমুনা উদ্ধার করা হয়েছে সেটি আজ থেকে ২৫ কোটি বছর আগের। উভচর বিশেষজ্ঞ প্রাণীবিজ্ঞানীরা এই নমুনার নাম

দিয়েছেন '*Triadobatrachus*'| অকতারের বইয়ে ব্যবহৃত ব্যাঙের ফসিলের ছবি আর '*Triadobatrachus*'র ছবি কিন্তু এক নয়| যা হোক, আদনান অকতার আবারো ব্যাঙের ফসিলের ছবির নীচে বর্ণনায় লিখেছেন '*২৮ কোটি বছর আগের ব্যাঙ ও আজকের যুগের ব্যাঙের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই*| অকতারের ব্যবহৃত ফসিলের ছবিটি যদি পূর্ণবয়স্ক কোনো ব্যাঙের হয়ে থাকে তবে অন্তত পড়ো একটা পার্থক্য তো থাকার কথা : আজকের যুগের পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙের কোনো লেজ থাকে না কিন্তু ফসিল ব্যাঙে মেরুদণ্ডের নীচের দিকে সংযুক্ত মেরম্নদণ্ডের বাকি অংশের সমান দৈর্ঘ্যের হাড়যুক্ত লেজের অস্তিত্ব রয়েছে যা ব্যঙের পেলভিস থেকে বের হয় | বেশির ভাগ ব্যাঙ প্রজাতি 'ব্যাঙাচি' অবস্থায় (মাছ-সদৃশ লার্ভা থাকাকালীন) কিছুকালের জন্য লেজের অস্তিত্ব দেখা যায়|

বড় হওয়ার সাথে সাথে লেজের বিলুপ্তি ঘটে এবং ব্যাঙ আকৃতি লাভ করে| অকতারের দেয়া ফসিলটি বোধহয় কোনো কৈশোরকালীন একটা ব্যাঙের ছবি| তবে এ ব্যাপারে আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে প্রয়োজন এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও দড়্গতার এবং কিছু অতিরিক্ত নিদর্শন| কিন্তু আদনান অকতার তো প্রমাণে উৎসাহী নন| যেনতেন লেজযুক্ত একটা ব্যাঙের কঙ্কালের ছবি দেখিয়ে দাবি করছেন ওটা এবং আজকের যুগের লেজহীন ব্যাঙ নাকি অভিন্ন! '*Triadobatrachus*'র পূর্ণবয়স্ক পর্যায়েও একটা ছোট লেজের অস্ত্মিত্ব রয়েছে এবং এর মধ্যে ব্যাঙ এবং আরো আদিম-উভচর জীবের কিছু মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যও প্রতীয়মান আছে| (Rage and Roc˘ek 1989; Evans and Borsuk-Białynicka 2008)| কিন্তু অকতারের ব্যবহৃত ছবিতে সেগুলোর কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না| [*Palaeontographica* জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধটি পড়ুন এখান থেকে : http://bit.ly/10WWzeF| এবং *Palaeontologica Polonica* জার্নালে প্রকাশিত সুসান ইভান্সের গবেষণা নিবন্ধটি পড়ুন এখান থেকে : http://bit.ly/13PofQh|–অনুবাদক]

একথা সত্য যে বর্তমানকালের কিছু জীবিত প্রাণী দেখতে অনেকটা বিলুপ্ত প্রজাতির প্রাণীর মতো হয়| কিন্তু এটা কোনোভাবেই বিবর্তনের বিরুদ্ধে যুক্তি বা প্রমাণ নয়| যদি দেখা যেত ভূতাত্ত্বিক সময়ক্রমের শিলার স্তরগুলিতে একমাত্র আধুনিক যুগের প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো পূর্বতন জীবের অস্তিত্ব নেই, তাহলে হয়তো আমরা জীববিবর্তনের প্রকল্পকে বাতিল করে দিতে পারতাম| কিন্তু সেরকম কোন ব্যাপার তো নেই| (এই স্তরগুলিতে) প্রাণীসমূহের ক্রমপরিবর্তিত অবস্থার নিদর্শন একটি বাস্ত্মব ঘটনা| সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে পূর্বের (স্তরের) জীবেরা নতুন (স্তরের) জীবে থেকে আদিম বৈশিষ্ট্য-সম্প ন্ন হয়ে থাকে| এরকম সাধারণীকরণের ব্যতিক্রমও রয়েছে অনেক| কারণ বিবর্তনীয় গতিধারা সব জীবকুলে এক রকম ছিল না| ভিন্ন প্রাণীকুলে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে কার্যকরী হয়েছে বিবর্তন| কিছু জীবের ড়্রোত্রে ধীর গতির বিবর্তনের ফলে উদ্ভব ঘটেছে তথাকথিত *'জীবন্ত্ম ফসিল'*,

এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় আধুনিক আত্মীয় থেকে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দেখতে মিল বেশি| (*জীবন্ত ফসিল* সেইসব প্রাণীকে বলা হয় বর্তমান পৃথিবীর যেসব জীবে তাদের উদবংশীয় বিলুপ্ত প্রজাতিগুলোর বিভিন্ন আদিম শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি মাত্রায় দেখা যায়| যেমন সিলাকান্থ মাছ, ফুসফুস মাছ, প্ল্যাটিপাস ইত্যাদি| উদ্ভিদের মধ্যে 'জীবন্ত জীবাশ্ম' হিসেবে পরিচিত হচ্ছে নগ্নবীজী উদ্ভিদ 'গিংকগো'| নগ্নবীজী হচ্ছে যেসব সপুষ্প ক উদ্ভিদের ফল হয় না, বীজগুলি অনাবৃত থাকে| 'জীবন্ত-জীবাশ্ম' বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে এইসব উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোনোটিই নিজে নিজে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে বেঁচে আছে, তা নয়| অর্থাৎ এদের কারো বয়স মিলিয়ন মিলিয়ন বছর নয়| জীবন্ত জীবাশ্ম বলতে শুধু বোঝায় যেসব উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রজাতিতে 'আদিম বিভিন্ন শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্য'গুলো বংশপরম্প রায় অভিযোজনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে টিকে আছে| -অনুবাদক)|

অনেকে হয়তো জীবন্ত জীবাশ্মের উদাহরণ হিসেবে ক্যাঙ্গারু থেকে আপসামের কথা বলবেন| কিন্তু আপনি যদি প্রাণীবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ না হন কিংবা প্রাণীদের অঙ্গসংস্থান সম্প র্কেও বেশি ধারণা না থাকে তবে আজকের যুগের ভার্জিনিয়া আপসামের হাড়ের সাথে ক্রিটাসিয়াস যুগের মারসুপিয়ালদের হাড়ের পার্থক্য আমরা সহজে ধরতে পারবো না| কিছু প্রাচীন জীব থেকে অনেক সময় জীবিত জীবও আদিম গঠনের হতে পারে| দৈহিক গঠনগত কারণে ক্যাঙ্গারু থেকে আজকের যুগের আপসাম অবশ্যই আদিম মারসুপিয়াল বর্গভুক্ত প্রাণী বলে মনে হয়; এমন কী ১৫ মিলিয়ন বছর পূর্বের (মায়োসিন কাল) পুরাতন ক্যাঙ্গারুর ফসিল থেকেও| একইভাবে বলা যায় আজকের যুগের অনেক বানর কিন্তু মানুষ থেকেও অনেক আদিম প্রাইমেট| এমন কী, আদিম মানুষের অনেক পুরাতন ফসিল থেকেও আজকের যুগের বানরের দৈহিক-গঠন আদিম ঘরানার| তার মানে কি এই যে, আজকের যুগের বানর থেকে পুরাতন যুগের আদিম-মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল! মোটেও তা নয়| জীববিবর্তন ক্রম অনুসারে আপসাম-সদৃশ পূর্বপুরুষ থেকে ক্যাঙ্গারুর উদ্ভব হয়েছে এবং মানবকুলের উদ্ভব হয়েছে বানর-সদৃশ প্রাচীন প্রাণী থেকে| অথচ বানরেরা এখনো আমাদের চারপাশেই আছে|

অকতারের বক্তব্যকে আমরা যেভাবেই সাজাই না কেন, বিবর্তনের বিরুদ্ধে তার যুক্তিগুলো শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের জন্যই বিপর্যয় ডেকে আনছে| যদি আমরা ধরে নেই প্রত্যেক প্রজাতি আলাদা আলাদা বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তবে এটা আমাদের অবশ্যই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে যে, তাহলে ভিন্ন দুটো প্রজাতিকে কেন একত্রে শ্রেণীবিন্যস্ত করতে হবে? কেন সকল কচ্ছপকে 'অভিন্ন' ভাবতে হবে? ডারউইনের পূর্বে জীববিজ্ঞানীদের কাছে এই প্রশ্নের ভালো উত্তর ছিল না এবং অবশ্যই আদনান অকতারের কাছেও এর উত্তর নেই| কিন্তু তাঁর এ ব্যাপারে জানার প্রয়োজন আছে| কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই

বিবর্তনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তিনি পাঠকের উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন-দুটো আলাদা প্রজাতি কোনো না কোনোভাবে একই জাতের জীব| 'একই জাত' বলতে কি বোঝাচ্ছেন অকতার তা মোটেও পরিষ্কার নয়| ফসিল কচ্ছপ ও জীবিত কচ্ছপকে একই প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করে 'একই জাতি' বলতে পারেন না, কারণ এই দুই কচ্ছপ মোটেও এক প্রজাতির নয়| আবার তিনি এও বলতে পারেন না, এরা দুজনে জীবজগতে খুব ঘনিষ্ট আত্মীয়| কারণ তাঁর সৃষ্টিবাদী ধারণা প্রত্যেক প্রজাতিকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই বিশ্বাস করে| বিবর্তনের আলোকে জীবজগতে আত্মীয়তার ধারণাকে তো তিনি সমর্থন করেন না|

অকতারের মতো কট্টরপন্থী সৃষ্টিবাদীরা বলতে পারেন সব প্রজাতির কচ্ছপ অবশ্য কিছু প্রয়োজনীয় সাদৃশ্যগত মিল ভাগাভাগি করে থাকে| কিন্তু তাঁর দাবিকৃত সাদৃশ্যগুলো অবশ্য একে-অপরকে কাটাকাটি করে ফেলে| একেকজন মানুষ একেকভাবে মনে করতে পারে কোন কোন সাদৃশ্যগুলো প্রয়োজনীয়| ক্যারোলাস লিনিয়াস '*Systema Naturae*' (Linnaeus, 1735) বইয়ের প্রথম সংস্করণে জীবজগতের প্রথম শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন, তখন তিমিকে 'মাছ' হিসেবেই চিহ্নিত করেছিলেন, কারণ তিমির শরীরে লোম ও পা নেই| পরবর্তী সংস্করণে লিনিয়াস তাঁর মত পরিবর্তন করে ফেলেন এবং তিমিকে 'স্তন্যপায়ী' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত করেন| কারণ তিমির স্তনগ্রন্থি রয়েছে| একজন ডারউইনীয়-বিবর্তনের সমর্থক ব্যক্তি বলবেন লিনিয়াসের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি সঠিক, কারণ (জীবনবৃক্ষ) তিমি ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সাধারণ পূর্বপুরুষ (common ancestor) মাছের সঙ্গে তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষের তুলনায় অনেক বেশি কাছাকাছি| কিন্তু একজন সৃষ্টিবাদী এরকম বলার কোনো ভিত্তি নেই কারণ এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন|

কোনো কোনো পুরাতন পৃথিবীর সৃষ্টিবাদীরা জীবের 'জাত' (kinds) এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যান| তাদের মতে একটা নির্দিষ্ট জাতের মধ্যে বিবর্তন ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু এক জাত থেকে অন্য জাতের উদ্ভব কখনো ঘটে না| তাদের মতে 'আলাদা আলাদা কচ্ছপ প্রজাতি বিবর্তিত হয়েছে তাদের পূর্বসূরি কচ্ছপ থেকে| কিন্তু কোনো কচ্ছপই অন্য কোনো অ-কচ্ছপ জাত থেকে বিবর্তিত হয়ে আসে নি|' সৃষ্টিবাদীদের এই দলটি 'জাত'-কে বিবর্তনের ধারাবাহিকতা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন| কিন্তু ডারউইনীয় বিবর্তনের এই অর্ধেক-ধারণা আদনান অকতারের জন্য প্রযোজ্য নয়, কারণ তিনি তো সব পর্যায়ের জীববিবর্তনীয় পরিবর্তনকে অস্বীকার করে বসে আছেন|

হয় আমার জিত নইলে তোমার হার (বিচার মানি কিন্তু তালগাছ আমার)

যেহেতু অকতারের দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কচ্ছপ একই তাই তিনি ওডন্টোচেলিসের (Odontochelys) মতো মধ্যবর্তী ফসিলের (transitional fossils) গুরুত্ব ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন| হাস্যকর খবর হচ্ছে ২০০৮ সালে অকতার এক বিশাল অংকের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন| ১০ ট্রিলিয়ন তুর্কি লিরা! (অর্থাৎ আট ট্রিলিয়ন দশ বিলিয়ন আটশত নব্বই মিলিয়ন মার্কিন ডলার মাত্র! সংখ্যায় লিখলে ৮৮,০১০,৮৯০,০০০,০০০)| বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে কেউ যদি একটি মধ্যবর্তী ফসিল হাজির করতে পারে তাকে নাকি এই পুরস্কারটা দিবেন অকতার! আমি নিশ্চিত অকতারের অ্যাকাউন্টে এই বিপুল অংকের টাকা নেই| তাঁর পুরস্কারের অংকটা তুরস্কের জাতীয় বার্ষিক বাজেটের ১০০ গুণ| অকতার কৌশলে শুভঙ্করের ফাঁকি তৈরি করে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে এই বাজি ধরেছেন, এক্ষেত্রে চন্দ্র-সূর্য-তারা পর্যন্তও তিনি বাজিতে ধরতে পারতেন| কোনো সমস্যা ছিল না| কোনো ব্যক্তি বিবর্তনের যে প্রমাণই হাজির করুক না কেন অকতারের সামনে, তাঁর কোনো ইচ্ছা নেই পুরস্কার প্রদানের| (অকতারের শুভঙ্করের ফাঁকিটি হচ্ছে তিনি নিজে ফসিলের ট্রাঞ্জিশনাল বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন না, মানতে চান না, তিনিই আবার ট্রাঞ্জিশনাল ফসিলের প্রমাণ চেয়েছেন| ফলে তাকে ট্রাঞ্জিশনাল ফসিলের যে প্রমাণই দেয়া হোক না কেন যথারীতি একে তিনি অস্বীকার করবেন| গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রমাণটি বাদ দিয়ে দেবেন|-অনুবাদক)|

এবার আমরা কিছু ট্রাঞ্জিশনাল ফসিলের চিত্র দেখতে পারি| সদ্য প্রকাশিত মানব বিবর্তনের উপর একটি বই (Cartmill and Smith 2009) থেকে ১৪টি খুলির ছবি চিত্র-১-এ দেয়া হল| খুলির ছবিগুলোর প্রথম চিত্রটি (A) একটি এপের, আজকের যুগের আধুনিক শিম্পাঞ্জির এবং সর্বশেষটি (N) আধুনিক মানুষের খুলি| বাকি ১২টি হচ্ছে দ্বিপদী এপের, যারা ফসিল মানব, এদের পূর্বপুরুষ কিংবা পূর্বআত্মীয়| প্রায় ৩৫ লক্ষ বছর থেকে কমবেশি ১ লক্ষ বছর পুরাতন এদের প্রাচীনতা| চিত্রে সময়ের ধারাবাহিকতা অনুসারে ফসিলগুলো সাজানো হয়েছে| ছবিতে এদের প্রত্যেকের ক্র্যানিয়াল ক্যাপাসিটি বা খুলির আয়তন (ভেতরের ধারণক্ষমতা) উল্লেখসহ তাদের প্রাচীনতা অনুসারে সর্বপ্রাচীন থেকে সর্বনবীন বয়সী পর্যন্ত সাজানো হয়েছে| চিত্রে উল্লেখিত সবচেয়ে প্রাচীন ফসিল হচ্ছে (B) *অস্ট্রেলোপিথেকাসের* (*Australopithecus*)| ফসিলটি পূর্ব আফ্রিকা থেকে উদ্ধার করা হয়| *অস্ট্রেলোপিথেকাসের* শিম্পাঞ্জি-সদৃশ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এদের খুলির আয়তন ছোট এবং মুখমণ্ডল বড় ও বাইরের দিকে প্রসারিত| কিন্তু শিম্পাঞ্জির (A) সাথে *অস্ট্রেলোপিথেকাসের* (B) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে ঘাড়ের মাংসপেশির সাথে খুলির যে সংযুক্তি স্থান রয়েছে (চিত্রে কালো তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে) তা *অস্ট্রেলোপিথেকাসের* নীচের অবস্থান করছে| এই

বৈশিষ্ট্যটি মানব-সদৃশ| এই পার্থক্য দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় শিম্পাঞ্জি (সামনের দুই হাত ব্যবহার করে) চার পায়ে চলাফেরা করে, কিন্তু *অস্ট্রেলোপিথেকাস*রা ছিল দ্বিপদী| মাথা উপরে এবং ঘাড় কিছুটা সোজা করে ভারসাম্য বজায় রেখে চলাফেরা করতো| সবচেয়ে নবীন বয়সী ফসিলটি (M) প্রাক-আধুনিক মানুষের| এটি ইজরায়েলের নাজারাত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে| এর সাথে আধুনিক মানুষের খুলির উল্লেখযোগ্য মিল বেশ লক্ষণীয়| আবার B থেকে M পর্যন্ত বাকি খুলির ট্রাঞ্জিশনাল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো ধরনের ধারাবাহিকহীনতা নেই| অর্থাৎ এই খুলিগুলোর কেউ কেউ সম্পূর্ণ শিম্পাঞ্জি-সদৃশ বা কেউ কেউ সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষের মত বিষয়টা এমন নয়| বরং এখানে মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যগুলোর উপস্থিতি ক্রমবিকাশের চিহ্নকে আরও স্পষ্ট করেছে|

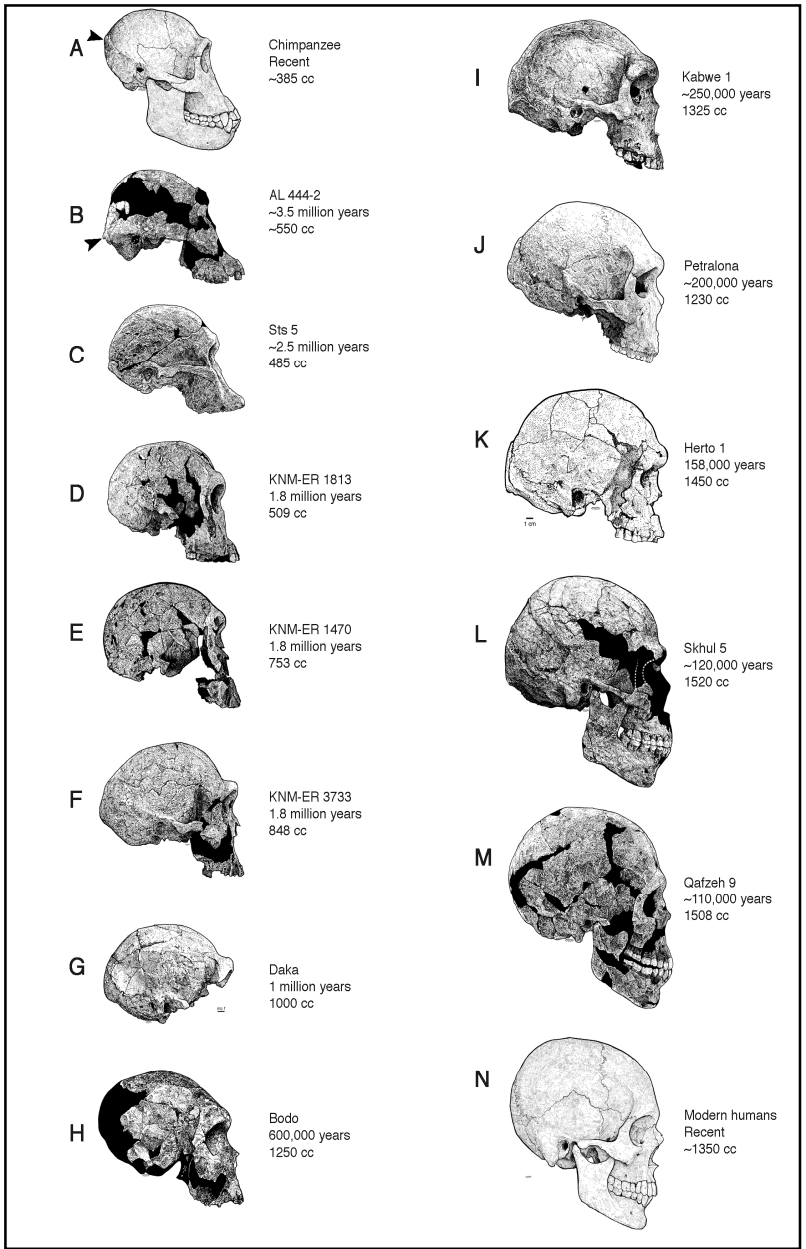

তাহলে আমি কি অকতারের ঘোষিত ১০ ট্রিলিয়ন লিরা জিতে গেলাম? না, সেই সুযোগ নেই| অকতার খুব সচেতনতার সাথে প্রচারণা চালিয়েছেন মানব বিবর্তনে কোনো ধরনের ক্রমরূপান্তরের বা বিকাশের ছাপ নেই| তাঁর *সৃষ্টির মানচিত্র* বইয়ের একদম শেষের দিকে মানব বিবর্তনের ফসিলের প্রমাণ নিয়ে কিছু বক্তব্য দিয়েছেন| এই বক্তব্যের পুরোটাই খ্রিস্টান সৃষ্টিবাদীদের কাছ থেকে ধার করা| প্রত্নৃবিজ্ঞানকে তিনি আক্রমণ করেছেন মূলত চারটি পয়েন্টে| (আর এখানে আদনান অকতার তৈরি করেছেন শুভঙ্করের ফাঁকি!)

(১)পিল্টডাউন মানব ফসিল একটা ধোঁকাবাজি| অনেক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী এই ফসিল নিয়ে প্রতারণা করেছেন| আবার অনেক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী এপের খণ্ডিত ফসিলকে ভুলভাবে চিহ্নিত করেছেন, যেমন *রামাপিথেকাস* (*Ramapithecus*)| এমন কী পেকারি বা বন্য শূকরকেও (*Hesperopithecus*) মানুষের পূর্বপুরুষ বলেও চিহ্নিত করেছেন| তাই প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা কে কি বললেন এগুলোকে এতো গুরুত্ব দেয়ার কিছু নেই|

(২) *অস্ট্রেলোপিথেকাস* (চিত্রে B ও C খুলি) শুধুই এপ ছিল, যেমন বর্তমান সময়ের এপরা সম্পূর্ণই এপ| এপদের মতো *অস্ট্রেলোপিথেকাসদের* ছিল দীর্ঘ বাহু আর ছোট পা| এছাড়া এপ-সদৃশ আরও অনেক বৈশিষ্ট্যও তাদের মধ্যে ছিল| ফলে তারা কোনোভাবে মানুষের সাথে সম্পর্কিত নয়|

(৩) *হোমো হেবিলিস* (D) এবং *হোমো রুডোলফেনসিস*রাও (E) বহুক্ষেত্রে এপ-সদৃশ ছিল| অনেক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী এদের *হোমো* জিনাসের (গণ) অন্তর্ভুক্ত না করে *অস্ট্রেলোপিথেকাস* জিনাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন| ফলে *অস্ট্রেলোপিথেকাসদের* এবং আজকের যুগের এপদের মতো তারাও মূলত এপ ছিল|

(৪) *হোমো ইরগাসটার* (F) এবং *হোমো ইরেকটাস* (এ) দুটোই এক এবং এর মধ্যে কোনো সত্যিকারের সিমিয়ান বৈশিষ্ট্য ছিল না| এটা পুরোপুরি মানুষই ছিল| খুব বেশি এপ-সদৃশ হোমো প্রজাতি *হোমো হেবিলিস* (D) ও *হোমো রুডোলফেনসিস* (E) এর একই সময়কালে *হোমো ইরগাসটার* (F) বাস করতো| তাই এদেরকে *অস্ট্রেলোপিথেকাস* এবং *হোমো*র মধ্যবর্তী (ট্রান্জিশনাল) ফসিল হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না| অর্থাৎ উপসংহার হচ্ছে মানুষ সর্বদাই মানুষ ছিল এবং এপরা সর্বদাই এপ ছিল|

অকতারের বইয়ের অন্যান্য আলোচ্যের মতো এই বক্তব্যগুলো অবশ্য মিথ্যা বানোয়াট ভাষণে ভরপুর নয়| এখানে শুধু ভুল বক্তব্য দেয়া হয়েছে| ফলে এগুলো খুব সহজে খণ্ডন করা যায়| প্রথম পয়েন্ট থেকে শুরু করা যাক| এখানে শুধু দূর থেকে

মানব বিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের ঐক্যমতের বিরোধিতা করা হচ্ছে| কিন্তু এটা কোনো গোপন ব্যাপার নয় কিংবা বিস্ময়কর কিছুও নয়, আর প্রায় সবার মতো বিজ্ঞানীরাও অনেক সময় ভুল করতে পারেন| এটা স্বাভাবিক ঘটনা| (পিল্টডাউন মানব ফসিল নিয়ে ইংল্যান্ডে গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরু থেকে ভাঁওতাবাজির ঘটনা ঘটে এবং এটি সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে প্রায় চল্লিশ বছর পরে| এই জালিয়াতির সাথে ইংল্যান্ডের অপেশাদার এক ফসিল সংগ্রহকারী চার্লস ড্যাসনকে মূল কুশীলব হিসেবে সন্দেহ করা হয়| সঙ্গী হিসেবে সন্দেহ করা হয় কয়েকজন খ্যাতিমান নৃবিজ্ঞানীকে| যারা প্রত্যেকে ইচ্ছেকৃতভাবে অথবা কোনো না কোনোভাবে বিভ্রান্ত হয়ে বিজ্ঞানের প্রতি অপেশাদারসুলভ মনোভাব নিয়ে পিল্টডাউন মানব ফসিল নিয়ে জোচ্চুরির ঘটনায় জড়িত ছিলেন|-অনুবাদক)| কিন্তু আদনান অকতার তাঁর এই বক্তব্যে যে সত্য গোপন করেছেন তা হচ্ছে ফসিল সংক্রান্ত এইসব সুনির্দিষ্ট ভুলগুলো চিহ্নিত এবং সংশোধন করেছেন একমাত্র বিজ্ঞানীরাই| (এ কাজে সৃষ্টিবাদীদের কোনো ভূমিকা নেই|) বিজ্ঞানীরা নিজেরাই উৎসুক হয়ে খুঁজে বের করেছেন, জনগণের সামনে প্রকাশ করেছেন তাদের পূর্বসূরি বা সহকর্মী কর্তৃক কৃত গোপন ভুলগুলো|

দ্বিতীয় পয়েন্টের তথ্যের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল অকতার সেই চল্লিশ বছর পুরানো সোলি জাকারম্যানের (১৯০৪-১৯৯৩) সেকেলে নিবন্ধের উপর নির্ভর করেছেন| জাকারম্যানই সর্বশেষ এবিষয়ে অবহিত বিজ্ঞানী ছিলেন যিনি অন্য বিজ্ঞানীদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলতেন *অস্ট্রেলোপিথেকাস*রা মানুষের চেয়ে আফ্রিকান এপদের সাথেই বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত| (Ashton and Zuckerman 1950; Zuckerman 1966)| অকতারের মতো জাকারম্যানও মনে করতেন *অস্ট্রেলোপিথেকাস*রা বহুদিক থেকেই এপ-সদৃশ| মধ্যবর্তী প্রাণীদের মধ্যে এরকম বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়ার আশা আপনারা করতেই পারেন| বিজ্ঞানীরা এখন মোটামুটি একমত যে (চিত্রে উল্লেখিত) খুলি (C) থেকে অনেক বেশি এপ-সদৃশ বৈশিষ্ট্য রয়েছে খুলি (B)-এ| আবার খুলি (C) অনেক বেশি এপ-সদৃশ খুলি (D) ও খুলি (E) থেকে| খুলি (E) আবার খুলি (F) ও খুলি (G) থেকে বেশি এপ-সদৃশ| খুলি (H) থেকে খুলি (G) বেশি পরিমাণ এপ-সদৃশ এবং এভাবে চলেছে| তবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে খুলি (D) মানে *হোমো হেবিলিস* ও খুলি (E) মানে *হোমো রুডোলফেনসিস* প্রজাতি নিয়ে| এদেরকে *অস্ট্রেলোপিথেকাস* নাকি *হোমো* জিনাসের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক বিতর্ক রয়েছে| সংক্ষেপে বলা যায় এ দুটির ফসিল নমুনাতে উভয় জিনাসের প্রচুর মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য রয়েছে| জর্জিয়া থেকে একই সময়কালের খুলি ও হাড় পাওয়া গেছে, যাদেরকে কোনো কোনো নৃবিজ্ঞানী *হোমো হেবিলিস* (D) প্রজাতির বলে শ্রেণীবিন্যস্ত করতে চান আবার কেউ কেউ এগুলোকে *হোমো ইরগাসটার* (F) প্রজাতির সাথে শ্রেণীবিন্যস্ত

করতে চান| ফসিলগুলোর দৈহিক গঠনাকৃতিতে মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য থাকার কারণেই এই বিতর্কের উদ্ভব| যদি এইসব ফসিলের মধ্যে কোনো ধরনের ট্রাঞ্জিশনাল বা মধ্যবর্তী গঠন বৈশিষ্ট্য না থাকতো, তবে এই বিতর্ক অনেক আগেই ফুরিয়ে যেত|

বোঝা যাচ্ছে অকতার ও তাঁর সহকারী-লেখকরা প্রাচীন-মানব নিয়ে লিখতে গিয়ে কিছুটা প্রস্তুতিমূলক কাজ আগেই সেরেছেন| সমতল পৃথিবীর বক্তারা যেমন কোনো ধরনের ভিত্তি ছাড়াই জীববিবর্তনকে অস্বীকার করে থাকেন সেই তুলনায় অকতারদের এই বক্তব্যগুলো অনেক বেশি কৌশলী ও তথ্যাভিজ্ঞ| কিন্তু আদনান অকতারদের *অস্ট্রেলোপিথেকাস* ও *হোমো* সম্পর্কে দাবিগুলো অনেকটা এরকম-'সকল কচ্ছপই অভিন্ন কারণ সকলেই তো কচ্ছপ!' তাঁদের কাছে *অস্ট্রেলোপিথেকাসের* কঙ্কালতন্ত্রের যে মানব-সদৃশ স্বাতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এটা তো শেষ পর্যন্ত্ম একটা এপ-ই! আবার খুলি (F) বা *হোমো ইরগাসটার*-এর খুলির মধ্যে যে প্রাক-মানবিক (subhuman) বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন খুলি ও মুখমণ্ডলের বড় আকার এবং ও প্রসারিত বাইরের দিক ইত্যাদি সেসব তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়| কারণ (তাদের মতে) এটাও শেষ পর্যন্ত্ম একটা মানুষের খুলি ছাড়া কিছু নয়! আসল কথা হচ্ছে আদনান অকতার তাঁর আকাঙ্ক্ষিত উপসংহার আগেই টেনে রেখেছেন| তাঁর আরেকটি বক্তব্য হচ্ছে *হোমো ইরগাসটার* (F) কখনো *হোমো রুডোলফেনসিস* (E) থেকে উদ্ভূত হতে পারে না কারণ দুটি খুলির ডেটিংয়ে একই বয়স দেখাচ্ছে| আদনানের এই বক্তব্যটা অনেকটা এরকম যুক্তি হাজির করছে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কেনিয়াতে বসবাসকারী তাঁর দাদির বংশোদ্ভূত হতে পারেন না কারণ উভয়েই তো এখনো জীবিত আছেন!

অন্ধত্ব মোচন

সৃষ্টির মানচিত্র বইয়ে প্রচুর সুন্দরভাবে রক্ষিত ফসিলের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে এদের বিভিন্ন অংশগুলো সহজে দেখেই আমাদের মনে এই ধারণা হয়- ছবির এই জীবগুলো সুক্ষ্ম ও নিখুঁত অংশসমূহের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে| ছবিগুলো দেখে যেন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই - সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সকল জীবকেই পরিপূর্ণ ও নিখুঁত রূপে সৃষ্টি করেছেন| যেমন একটা বক্তব্য হচ্ছে আমাদের চোখ নাকি অত্যন্ত নিখুঁত ডিজাইনে তৈরি| খ্রিস্টান সৃষ্টিবাদীদের কাছে এই বক্তব্যটি অত্যন্ত পছন্দের| রেভারেন্ড উইলিয়াম প্যালে ঈশ্বরের তৈরি সৃষ্টিতে নিখুঁত ডিজাইনের প্রমাণ দাবি করে এই বক্তব্যটি উপস্থাপন করেছিলেন| (Paley 1802)| কিন্তু চোখের গঠনের চমৎকার বিবর্তনীয় ব্যাখ্যা রয়েছে| প্রাকৃতিক নির্বাচনের আলোকে বিবর্তন অনুযায়ী কোনো অভিযোজনই নিখুঁত নয়|

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হতে পারে (বংশগতির সূত্রে পাওয়া) পূর্বপুরুষের বংশানুক্রমিক এই

বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর, যা সমসাময়িককালে জীবের বর্তমান চাহিদা পূরণের জন্য আদর্শ নয়| প্রকৃতিতে প্রচুর উদাহরণ রয়েছে যা আমাদের সামনে বাজে (অপরিপূর্ণ) পরিকল্পনার নমুনা তুলে ধরে| যাই হোক, বাজে পরিকল্পনা শব্দদ্বয় আমাদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে| এই বিভ্রান্তি কিন্তু বাজে শব্দটি থাকার কারণে নয়, বরং এর মূল কারণ হচ্ছে প্রকৃতিতে আসলে কোনো ডিজাইন (পরিকল্পনা) নেই|

এরপরও দুর্ভাগ্য আমাদের, মানুষ কিভাবে বিষয়টিকে দেখছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য| সরীসৃপ, পাখিদের (একটি সুনির্দিষ্ট দ্রষ্টব্যের দিকে) দৃষ্টি নিবদ্ধ করার কৌশল মানুষের চেয়ে অনেক কার্যকরী ও উন্নত| মানুষের চোখ সাধারণ প্রয়োজন পূরণের উপযোগী হলেও মোটেও বিশেষভাব দক্ষতাপূর্ণ নয়| ৪০ বছর বয়সের পরই দেখা যায় মানুষের চোখের কার্যকারিতা আস্তে আস্তে কমে যায়, ফলে কোনো কিছু পাঠ করতে বা দেখতে বাধা সৃষ্টি হয় কিংবা আমরা চশমা ব্যবহার করতে বাধ্য করতে হই| আমাদের চোখের গঠন এমন কারণ (আজকের অধিকাংশ স্ত ন্যপায়ীদের মতোই) আমরা যে আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয়েছি যাদের ছিল ছোট চোখ এবং সেই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সামর্থ্য তেমন উন্নত ছিল না| পরবর্তীতে আমাদের চোখের ফোকাস কৌশলে ছোট ছোট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন ক্রিয়াশীলতার কারণে| কিন্তু এখন এই বিষয়টিকে যদি (সর্বশক্তিমানের) পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের চোখের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা ঈশ্বরিক ক্ষমতার অর্ধেক বিফলতা হিসেবে তাঁর সুনামহানি ঘটায়| কিন্তু একে যদি আমরা প্রাকৃতিক নির্বাচনের উৎপাদন হিসেবে দেখি তবে একে চমকপ্রদ সাফল্য বলেই মনে হয়| [প্রকৃতিতে যেসব মেরুদণ্ডী-অমেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখ রয়েছে, তাদের চোখের গঠন ও কার্যকারিতার দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে| আধুনিককালের প্রাণীদের তুলনায় আদিমকালের প্রাণীদের মধ্যে চোখের গঠন ও কার্যকারিতা অত্যন্ত দুর্বল| এর মাধ্যমে এটা বোঝা যায় হুট করে একদম পরিপূর্ণ চোখ প্রাণীদেহে উদ্ভূত হয় নি| দীর্ঘদিনের ক্রমবিকাশমূলক প্রক্রিয়ায় একটু একটু ভ্যারিয়েশনের ভিতর দিয়ে প্রাণীদেহে চোখ গঠিত হয়েছে| প্রাণীজগতে মানুষ হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্তন্যপায়ী শ্রেণীর| পৃথিবীতে প্রাণবৈচিত্র্যের যে বয়স-সীমা রয়েছে (প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর) সেখানে মানুষের অবস্থান একদম নবীন (মাত্র দুই থেকে এক লক্ষ বছর মাত্র)| অর্থাৎ মানুষ তুলনামূলকভাবে আধুনিক| মানুষের চোখের গঠন ও কার্যকারিতার চেয়ে কেঁচো জাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী ফ্ল্যাটওয়ার্মদের চোখের গঠন ও কার্যকারিতা অর্ধেকের চেয়েও কম| ফ্ল্যাটওয়ার্মদের দেহে শুধু আলোকসংবেদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ রয়েছে| সামুদ্রিক প্রাণী নটিলাসের (Nautilus) একটু উন্নত গঠনের চোখ রয়েছে| তবে তার চোখের গঠনের সাথে মানুষের চোখের গঠনের পার্থক্যও রয়েছে| ফ্ল্যাটওয়ার্ম ও মানুষের চোখের গঠনের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে

নটিলাসের চোখের গঠন| প্রাণীবিজ্ঞানীরা দেখেছেন নটিলাসের পিনহোল ক্যামেরার মতো চোখের যে গঠন তা আলোকসংবেদনশীল| কোনো বস্তুর দিকে তাকালে ছায়া তৈরি হবে (ডিম লাইটের আলোতে দেখতে যেরকম লাগে) কিন্তু বস্তুর পূর্ণাঙ্গ ছবি তার দৃষ্টিতে তৈরি হয় না| নটিলাসের চোখের তুলনায় ফ্ল্যাটওয়ার্মের চোখের গঠন আরো দুর্বল| তার চোখে কোনো বস্তুর পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি হয় না, ছায়াও তৈরি হয় না| শুধু আলোর প্রতি এর স্নায়ুগুলোর কিছু প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়| আদিম অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে শুরু করে বর্তমানকালের প্রাণীদের চোখের গঠনের এবং কার্যকারিতার যে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য প্রাণীজগতে রয়েছে-এগুলো নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার ধীরে ধীরে দক্ষতা বৃদ্ধি আর ক্রমান্বয়ে উন্নতির ফল হিসেবে কেউ দাবি করাটা যৌক্তিক হবে না|-অনুবাদক]

রিচার্ড ডকিন্সের ওয়েব সাইট বন্ধ করে দেয়ার আর্জি জানিয়ে অকতারের আইনজীবী তুর্কি আদালতে বলেছিলেন ডকিন্সের অসভ্য আচরণ আদনান অকতারের মতো সম্মানিত এবং মার্জিত ব্যক্তির সুনামহানি ঘটিয়েছে| তাঁর মক্কেল আদনান অকতারের লেখা বিভিন্ন বিষয়ের তিনশত গ্রন্থ রয়েছে, এইসব বইয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর মতামত রয়েছে কিন্তু এগুলোর কোথাও একটাও অসম্মানজনক শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে না| এমন কী তাঁর এক ডজনেরও উপর ওয়েব সাইট রয়েছে সেখানেও এমন একটি শব্দও নেই| (দ্রষ্টব্য : http://bit.ly/16e44CA)| আমি অবশ্য তিনশত বইয়ের সবগুলো পড়ে দেখি নি| কিন্তু যেগুলো পড়েছি তাতে বিজ্ঞানী, বস্তুবাদী এবং সর্বোপরি চার্লস ডারউইনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ আর বিদ্বেষের সমাহার দেখতে পেয়েছি| তাঁর *সৃষ্টির মানচিত্র* বইয়ের প্রথম দিকে ডারউইনকে বাতিল করে দেবার অভিপ্রায়ে লিখেছেন :

> চার্লস ডারউইনের দাবির অবশ্যই কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ বা ভিত্তি নেই| কিন্তু যখন থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতি ঘটতে থাকলো একদম প্রাথমিক মাত্রায় সেই সময় থেকেই ডারউইনের হাস্যকর এবং অবাস্তব দাবিগুলো দিনের আলোর সামনে আর টিকে থাকতে পারলো না| (পৃষ্ঠা ১৪)|

আমার বেশ মনে ধরেছে অকতার তাঁর প্রথম বাক্যে 'অবশ্যই' শব্দটি ব্যবহার করেছেন! কেউ যদি ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিসিজ* গ্রন্থটি খুব গভীরভাবে পাঠ না করেও শুধু দ্রুত পাতা উল্টিয়ে যায় তবু সে টের পাবে ডারউইন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কী গভীর পরিমাণ ও দীর্ঘ অনুসন্ধান কার্য চালিয়েছেন| কিন্তু আমার এ বক্তব্য দিয়ে অবশ্য প্রমাণিত হয় না ডারউইন সঠিক ছিলেন| কিন্তু অকতার সম্পূর্ণ ধৃষ্টতার সাথে, বোকার মতো ও কিছুটা ঔদ্ধত্যের সাথে দাবি করেছেন 'ডারউইনের থিওরি অবশ্যই কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ব্যতিরেকে তৈরি হয়েছিল|' তাঁর এই বক্তব্য শুধু ভুল নয় বরং পুরোপুরি সত্যের

বিপরীত| অনেকটা এরকমভাবে বলা যায় যে তাঁর নিজের বইটিও 'অবশ্যই' কোরানের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল|

যদি (অকতার যেমনটা বলেছেন) জীববিবর্তনের অনুকল্পটি পুরোপুরি ভুল, বিশ্ব সম্পর্কে আদিম দৃষ্টিভঙ্গি আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ঘাটতির উপর ভিত্তি করে এটি গড়ে উঠতো| তাহলে আমরা আশা করি বিজ্ঞানীরা এতোদিনে আরো মার্জিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে, ভালো থিওরি ও প্রচুর তথ্য-উপাত্ত দিয়ে ডারউইনের কাজগুলো নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিতেন| কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সত্য এর বিপরীতে অবস্থান করছে| যতই বিজ্ঞানীরা জীবজগৎ সম্পর্কে জানতে পারছেন ততই নিশ্চিতভাবে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে এই জগতে জীবনের বৈচিত্র্য বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়েছে এবং ডারউইনের বর্ণিত প্রক্রিয়াটি (প্রাকৃতিক নির্বাচন) মৌলিকভাবে সঠিক| জ্ঞানের ক্রমবিকাশে আমরা জানতে পেরেছি বংশগতির সঞ্চারণ সম্পর্কে, ডারউইনের মূল থিওরিতে এ বিষয়ে বিশাল শূন্যতা আছে| কিন্তু বংশগতির সঞ্চারণের ধারণা পরবর্তীতে খুব বাস্তবসম্মতভাবে ডারউইনের প্রাকৃতিন নির্বাচন থিওরিকে শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করেছে|

আদনান অকতার তাঁর শতাধিক গ্রন্থের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে ইসলামের নাম ভাঙিয়ে ডারউইনকে আক্রমণ করেছেন| *সৃষ্টির মানচিত্র* বইকে তিনি তাঁর কর্মের বিশাল অর্জন এবং গৌরবের সাথেই দেখেন| এই বইটি আরো দুই খণ্ডেও প্রকাশিত হয়েছে| আমি অকতারের বাকি কাজগুলো দেখি নি, কিছু লেখার অনলাইন শিরোনাম পাঠ করা ছাড়া| যেমন কয়েকটার নাম হচ্ছে '*The Skulls that Demolish Darwin*', '*The Miracle of Electricity in the Body*', '*The Miracle of Termites*', '*Darwinism Refuted*', '*Matter: The Other Name for Illusion*' ইত্যাদি| আগ্রহীদের জন্য বেশিরভাগ বই ওয়েব সাইটে পিডিএফ করে রাখা আছে| (তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য)|

অকতারের '*The Miracle in the Mosquito*' বইটি (Yahya 2005) আমি তাঁর ওয়েব সাইট থেকে নামিয়ে দেখতে চেয়েছি অকতার কেমন করে ম্যালেরিয়া রোগকে 'দয়ালু ঈশ্বরের' (যদিও তিনি তা নন) 'কৌশলী বিবেচনা' হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন| যতদূর সম্ভব আমি এখানে বলতে চাচ্ছি অকতারের এই জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল ভলিউমগুলো আসলে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের প্রতি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অবিশ্বাস থেকেই লেখা হয়েছে| অকতার চিন্তাই করতে পারেন না কেমন করে কোনো কিছু বিবর্তিত হতে পারে, অতএব তার দৃষ্টিতে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব ছিল না|

আমি আশা করবো অকতারের উচিৎ হবে তিনি যে পরিমাণ সময় লেখালেখিতে ব্যয় করেন তার থেকে আরো কিছুটা বেশি সময় যেন 'চিন্তা' করতে ব্যয় করেন| এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, মৌলিক চিন্তা করাটা আসলে দুরূহ| চিন্তা খুব আস্তে ধীরে তৈরি হয় এবং চিন্তা-প্রক্রিয়াটি অনেকের জন্য পীড়াদায়কও বটে| ডারউইন ১৯টি বছর ব্যয় করেছেন শুধু প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে ভাবতে গিয়ে| প্রাকৃতিক নির্বাচন বিষয়ে *অরিজিন অব স্পিসিজ* বইটি প্রকাশের আগে একটার পর একটা নোটবই লিখে শেষ

করেছেন প্রচুর উদ্ধৃতি আর পর্যবেক্ষণ দিয়ে, তাঁর থিওরির সপক্ষে তথ্য-উপাত্ত যোগাড় করে| অবশেষে বইটি যখন প্রকাশিত হল সঙ্গত কারণেই বইটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি স্মরণীয় কীর্তি এবং মানুষের বৌদ্ধিক চেতনার একটা বিশাল বিজয় হিসেবে স্বীকৃতি পেল| *অরিজিন অব স্পিসিজ* তবু একটা মাত্র বই| কোনো ব্যক্তি যদি প্রচুর সময় ব্যয় করে শুধু চিন্তার জন্য এবং গভীরভাবে বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়নের জন্য, তার আসলে কখনোই প্রয়োজন পড়বে না অকতারের মতো ৩০০-এর উপর বই প্রকাশ করার|

তথ্যসূত্র

- Cartmill M, Smith FH. 2009. *The Human Lineage.* New York: Wiley Blackwell.
- Darwin CR. 1859. *On the Origin of Species by Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.* London: John Murray.
- Evans SE, Borsuk-Białynicka M. 2008. The Early Triassic stem-frog *Czatkobatrachus* from Poland. *Palaeontologica Polonica* 65:79–105.
- Li C, Wu X-C, Rieppel O, Wang L-T, Zhao L-J. 2008. An ancestral turtle from the Late Triassic of southwestern China. *Nature* 456:497–501.
- Linnaeus C. 1735. *Systema Naturae, sive Regna Tria Naturae Systematice Proposita per Classes, Ordines, Genera, et Species*. 1st ed. Leiden: Theodorum Haak, ex Typographia Joannis Wilhelmi de Groot. Available from: http://www.biodiversitylibrary.org/item/15373#.
- Paley W. 1802. *Natural Theology; Or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity as Collected from the Appearances of Nature.* London: R Faulder. Available from: http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=A142&viewtype=text&pageseq=1
- Rage J-C, Roc˘ek Z. 1989. Redescription of *Triadobatrachus massinoti* (Piveteau 1936), an anuran amphibian from the Early Triassic. *Palaeontographica* (A) 206:1–16.
- Searle J. 2009. Why should you believe it? *New York Review of Books* 56(14):88–92.
- Yahya H. 2000. *Darwinism Refuted*. Istanbul: Global Publishing. Available from: http://www.harunyahya.com/refuted1.php
- Yahya H. 2002. *Matter: The Other Name for Illusion*. Istanbul: Global Publishing. Available from: http://www.harunyahya.com/matter.php
- Yahya H. 2005. *The Miracle in the Mosquito.* Istanbul: Global Publishing. Available from: http://www.harunyahya.com/books/science/mosquito/miracle_mosquito_01.php
- Yahya H. 2007a. *Atlas of Creation,* 1st English ed. Istanbul: Global Publishing. Available from: http://www.harunyahya.com/books/darwinism/atlas_creation/atlas_creation_01.php
- Yahya H. 2007b. *The Miracle of Termites*. Istanbul: Global Publishing. Available from: http://www.harunyahya.com/books/science/termites/termites_01.php
- Yahya H. 2007c. *The Miracle of Electricity in the Body*. Istanbul: Global Publishing. Available from: http://www.harunyahya.com/books/science/electricity/electricity_01.php
- Yahya H. 2008. *The Skulls that Demolish Darwin*. Istanbul: Global Publishing. Available from: http://www.harunyahya.com/books/darwinism/skulls_demolish_darwin/skulls_darwin.php

[অধ্যাপক ম্যাট কার্টমিলের 'Turtles All the way Down: The *Atlas of Creation*' শিরোনামের লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় আমেরিকার *ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন* সংস্থার '*Reports of the National Center for Science Education*' দ্বিমাসিক পত্রিকা মার্চ-এপ্রিল, ২০১১ সংখ্যায়| অধ্যাপক ম্যাট কার্টমিল এবং পত্রিকার সম্পাদক ইউজিন স্কট উভয়ে এই নিবন্ধ বাংলায় অনুবাদের সবিশেষ অনুমতি প্রদান করেছেন| তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ|]

ম্যাট কার্টমিল : আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক| জীববিবর্তন ও ব্যবহারিক অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিষয়ে তাঁর প্রায় শতাধিক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন নৃবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা জার্নালে| একইসাথে তিনি বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শন নিয়েও লেখালেখি করেছেন দীর্ঘকাল ধরে| কার্টমিলের পুরস্কারপ্রাপ্ত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো '*A View to a Death in the Morning*' (Cambridge [MA]: Harvard University Press, 1996)| এই বইয়ে মানুষের উদ্ভব ও আদিম মানুষের শিকারি জীবন-ব্যবস্থার উপর পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কার্টমিল| লেখালেখি ছাড়াও তিনি শিক্ষকতা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রচুর পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বিভিন্ন সময়| '*আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স*' সংস্থার একজন সম্মানিত ফেলো এবং আমেরিকার শারীর নৃবিজ্ঞানীদের সংগঠনের (*আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপলজিস্ট্স*) সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করেছেন| নৃবিজ্ঞানীদের বিশ্বপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞান পত্রিকা '*International Journal of Primatology*'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক| '*American Journal of Physical Anthropology*'র সম্পাদকমণ্ডলীর শীর্ষপদেও ছিলেন একসময়| অধ্যাপক কার্টমিলের গবেষণায় আগ্রহের বিষয় হচ্ছে দ্বিপদী প্রাণীর বিবর্তন, চতুষ্পদ প্রাণীর গতিশীলতা, প্রাইমেটের উদ্ভব, করোটি সংস্থান ও ব্যবহারিক অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা|

ফসিলের আলোয় বিবর্তন

মূল : ডোনাল্ড আর প্রোথেরো
অনুবাদ : অভীক দাস

> ‘যে সব লেখক প্রজাতির পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাস করেন না তারা এটা বারে বারে বলে থাকেন ভূতত্ত্ব কোন সংযোগ তুলে ধরে না| এই উক্তি... নিতান্তই ভ্রান্ত...| ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণায় যেটা উদ্ঘাটিত হয়নি তা হল, সকল বিলুপ্ত এবং বর্তমান প্রজাতিকে সংযুক্ত করে রাখা অসংখ্য বিভাজনের অস্তিত্ব|’
>
> —চার্লস ডারউইন, *অরিজিন অব স্পিসিজ*

১৮৫৯ সালে ডারউইন যখন প্রথমবারের মত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীববিবর্তনের ধারণা প্রকাশ করেন, ফসিল রেকর্ডে তখন তার এই বক্তব্যের পক্ষে সামান্যই প্রমাণ ছিল| এমনকি ডারউইন তাঁর ‘*অরিজিন অব স্পিসিজ*’ বইয়ে ভূতাত্ত্বিক রেকর্ডের অসম্পূর্ণতা নিয়ে সম্পূর্ণ দুটি অধ্যায় লিখেছেন| ডারউইন যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ফসিলের এই সীমিত সংখ্যা তার ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ প্রস্তাবনার অন্যতম দুর্বল কাঠামো হিসেবে প্রতীয়মান হবে| এরপর অবশ্য *অরিজিন অব স্পিসিজ* প্রকাশের মাত্র দুই বছর পরে ‘*আর্কিওপটেরিক্স*’র (*Archaeopteryx*) প্রথম নমুনা আবিষ্কৃত হয়, যাকে অনেকে পাখি ও সরীসৃপের মধ্যকার ‘মিসিং লিঙ্ক’ বলে উল্লেখ করে থাকেন| ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আবিষ্কৃত প্রচুর সংখ্যক ফসিল থেকে জানা গিয়েছে কিভাবে আজকের তেজস্বী ঘোড়াগুলো (৫৫ মিলিয়ন বছর আগের) কুকুরের সমান আকারের তিন আঙুল বিশিষ্ট এক ধরনের প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছে| ওই সময়কাল থেকে ফসিলের ব্যাখ্যা বেশ ভালভাবে পরিমার্জিত হয়ে আসছে|

বিগত কয়েক দশক ধরে প্রচুর সংখ্যক ফসিলের আবিষ্কারের ফলে জীববিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে| ডিএনএ গবেষণা থেকে আরো স্পষ্ট হয়েছে কিভাবে এই রেকর্ডগুলো পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ প্রকাশ করে চলেছে| কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনও অনেক মানুষ ভ্রান্তভাবে মনে করে ফসিল রেকর্ড থেকে এখনও কোনো জীবের ‘পরিবর্তনশীল কাঠামো’ (transitional forms) দেখা যায় না| বৃহৎ অর্থে বলা যায় এই ধরনের ভুল ধারণাগুলো আদতে সৃষ্টিবাদীদের দ্বারা ছড়ানো কিছু মিথ্যা প্রচারণা মাত্র|

এটা সত্য যে ফসিল রেকর্ডে এখনও পূর্ণাঙ্গতা আসেনি| ১ শতাংশেরও কম সংখ্যক প্রজাতি, যারা এই বিশ্বে কোনো না কোনো সময়ে বাস করেছে, আজ ফসিল হিসেবে সংরক্ষিত আছে বলে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মনে করেন| স্বাভাবিকভাবে ফসিলের এই দুষ্প্রাপ্যতার কারণ হিসেবে বলা যায় আমাদের এই পৃথিবীতে কোনো মৃত জীবকে লক্ষ্যাধিক বছর টিকে থেকে ফসিলে রূপান্তরিত হওয়ার পরিবেশ অনেকটাই অস্বাভাবিক|

তারপরও এমন অনেক নমুনা পাওয়া গেছে যা জীবের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যেকার ঘটে যাওয়া বড় ধরনের পরিবর্তনকে ফুটিয়ে তোলে| অনেক ফসিল থেকে দেখা গেছে কিরকম 'অসংখ্য বিভাজন' প্রজাতিগুলোকে সংযুক্ত করে| একটি ধারা এমন যে যদি কোনো ফসিলের ক্রমউত্তরসূরিদের মধ্যে একটি সরাসরি সংযোগ টানতে পারে (যার সম্ভাবনা অবশ্য কম) তবে তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়| ফসিল-বিজ্ঞানীরা বলেন যখন একটি ফসিল দেখতে পূর্বসূরির মত হয় তার অর্থ হল ওই ফসিলটির সাথে ওদের প্রকৃত পূর্বসূরির আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে|

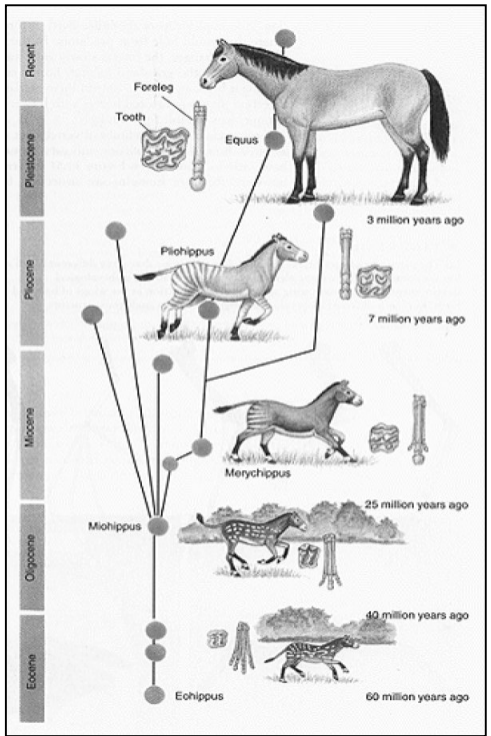

ঘোড়ার বিবর্তন এক্ষেত্রে ভালো একটি উদাহরণ| বিভিন্ন ফসিল যখন একসাথে সাজানো হল এবং এর মাধ্যমে 'ঊড়যরঢ়ঢ়ঁং' থেকে ঊয়ঁং পর্যন্ত পূর্বসূরি ও উত্তরসূরির দাগাঙ্কন করা সম্ভব হয়ে গেল| যখন আরো কিছু ফসিল আবিষ্কৃত হল তখন ফসিলবিদরা ঘোড়ার এই সাধারণ বংশক্রমটিকে আরো স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারলেন| এই ফসিলগুলো এখন ঘোড়ার বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন পূর্বপুরুষের (যার অনেকগুলোই বিলুপ্ত হয়ে গেছে) অস্তিত্বের প্রমাণসহ বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট চিত্র দেখাতে পারে| আমেরিকার নেব্রাস্কার একটি পাথর খনির শিলাখণ্ডে প্রায় ১২ মিলিয়ন বছর পুরানো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির ঘোড়ার ফসিল দেখা গেছে| একেবারে প্রথম দিকের প্রজাতির ঘোড়াদেরকে (যেমন *Protorohippus* যা ৫৩ মিলিয়ন বছর আগের ইওসিন যুগের প্রথম দিকের) বংশক্রমের শুরুর দিকের প্রজাতির ঘোড়াদের যেমন Homogalax থেকে আলাদা করা দৃশ্যত সম্ভব নয়| এই Homogalax থেকে আবার টাপির ও গন্ডারের উদ্ভবও হয়েছিল| আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুর দিকে যখন আমি প্রত্নজীববিদ্যার স্নাতক পর্যায়ের ক্লাস করতাম তখনই আবিষ্কার করেছিলাম এই দুই প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য করা অনেকটাই কঠিন কাজ|

এখনকার আবিষ্কারগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে চমকপ্রদ হল সেই ফসিলগুলো যেগুলো জলজ জীব তিমির সাথে তাদের

ডাঙ্গার পূর্বসূরির সাথে সংযোগ প্রদর্শন করে| আপনি যদি ডলফিন, তিমি, নীল তিমিদের দিকে তাকান তবে এদের ডাঙ্গায় হাঁটার দৃশ্য কল্পনা করা আপনার জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে| এখনও তিমির শরীরে, মেরুদণ্ডের নিচের মাংশপেশির ভিতরে হিপবোন এবং টেইল বোন বা লেজের হাড়ের চিহ্ন বহন করে| মাথার খুলি ও দাঁতের সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে ফসিলবিজ্ঞানরী অনেক আগেই এটা জানতে পেরেছেন খুরওয়ালা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সাথে তিমি মাছের ঘনিষ্ঠ সম্প র্ক রয়েছে| কিন্তু প্রায়শ সৃষ্টিবাদীরা তিমির ক্ষেত্রে ট্রাঞ্জিশনাল ফসিলের অভাবকে বিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চালায়|

ডারউইনযুগের পরিস্থিতির এখন পরিবর্তন হয়েছে| ১৯৮৩ সালে ৫২ মিলিয়ন বছর পুরনো ইওসিন যুগের Pakicetus-এর নমুনা পাকিস্তান থেকে সংগ্রহ করা হয়| যদিও Pakicetus এর শরীর ডাঙ্গার প্রাণীদের মতো| এর মাথা এবং দাঁত ছিল archaeocetes এর মত| archaeocetes ছিল তিমির প্রথম দিকের গোত্র| যারা আজ থেকে ৫০ মিলিয়ন বছর আগে মধ্য ইয়োসিন যুগের সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়াত|

১৯৯৪ সালে Ambulocetus natans (যার আক্ষরিক অর্থ 'যে তিমি হাঁটতেও পারে আবার সাঁতরাতেও পারে') এর ফসিল আবিষ্কৃত হয় পাকিস্তান থেকে| এই প্রাণীটির আকার ছিল একটা বড় সী-লায়ন বা সিন্ধু ঘোটকের সমান| এর সামনের এবং পিছনের দুই পাখনাতেই চওড়া পা লাগানো ছিল| এ কারণে এই প্রাণীটি হাঁটতেও পারত আবার একইসাথে সাঁতরাতেও পারত| এছাড়াও এর পায়ের সাথে ছোট ছোট ক্ষুর যুক্ত ছিল| এদেরও মাথা এবং দাঁত ছিল archaeocetes-এর মত| উদ্ধারকৃত ফসিল থেকে অনুমান করা যাচ্ছে Ambulocetus সাঁতার কাটত অনেকটা ভোঁদড়ের মত পিঠকে উপর-নিচ করিয়ে| এটা বোধহয় তিমির লেজের পূর্বসংকেত| ১৯৯৫ সালে আরেকটি ট্রাঞ্জিশনাল প্রাণী উধষধহরংঃবং-কে খুঁজে পাওয়া যায়| এর পা ছিল অসনঁষড়পবঃং অপেক্ষা ছোট, পায়ের পাতা ছিল চওড়া এবং আঙুলওয়ালা| আর ছিল লম্বা লেজ এবং বেশ বড় আকৃতির তিমির মত মাথা|

এতদিনে ডজনেরও বেশি তিমির ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে| এই ধরনের প্রাণীর ফসিল পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ| তাই উদ্ধারকৃত ফসিল রেকর্ডে এটা একটা চমৎকার নিদর্শন| জীবিত প্রজাতিগুলোর ডিএনএ থেকে পাওয়া সূত্র অনুসারে ধরে নেয়া হয় তিমিরা বিবর্তিত হয়েছে artiodactyls (আর্টিওডাক্টাইলস) নামক ক্ষুরবিশিষ্ট এবং সমান আঙুলওয়ালা পায়ের অধিকারী স্তন্যপায়ী প্রাণী হতে| সহজ ভাষায় জলহস্তীর মত প্রাণী থেকে| নাটকীয়ভাবে এই অনুকল্পটি ২০০১ সালে দুই প্রজাতির তিমির মধ্যে গোড়ালির হাড় 'double-pulley'-এর আবিষ্কারের মাধ্যমে নিশ্চয়তা লাভ করে| কারণ এটা archaeocetes-এর বৈশিষ্ট্য|

শুধু তিমিই ডাঙ্গার প্রাণী থেকে বিবর্তিত একমাত্র জলচর প্রাণী নয়| আধুনিক সিরেনিয়ানরাও (Sirenian বলতে বোঝায় বৃহদাকার তৃণভোজী জলচর প্রাণীদের গোত্রের অন্তর্গত যে কোন প্রজাতি যেমন manatees বা dugongs) সহজে পোষ্য এবং সামনের উপাঙ্গে পাখনা থাকে কিন্তু পিছনের উপাঙ্গে থাকে না| ২০০১ সালে ওয়াশিংটন ডিসির হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক ফসিল বিশেষজ্ঞ ড্যারিল ডমনিং জ্যামাইকা থেকে ৫০ মিলিয়ন বছর পুরনো Pezosiren portelli-এর একটি পূর্ণাঙ্গ ফসিল উদ্ধার করেন| এই প্রাণীটির সিরেনিয়ানদের মতই মাথার খুলি এবং দাঁত ছিল| এর পাঁজরও সিরেনিয়ানদের মত শক্ত হাড় দ্বারা নির্মিত ছিল যা প্রাণীটির ভারকেন্দ্র হিসেবে কাজ করত| এর চারটি আঙুলসহ পা থাকলেও পাখনা ছিল না| অন্যান্য ট্রাঞ্জিশনাল ফসিলের মাধ্যমে সিল ও সি-লায়নদের সাথেও ভাল্লুকের মত কোনো পূর্বসূরির সাথে সংযোগ আমরা দেখতে পাই|

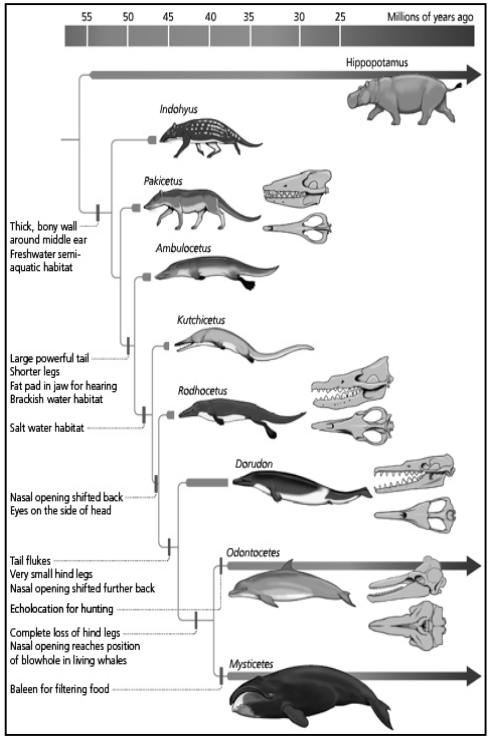

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উৎপত্তির ব্যাপারে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ আছে| স্তন্যপায়ী এবং এর বিলুপ্ত আত্মীয়রা ঝুহধঢ়ংরফধ নামক এক বড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত| এই গোষ্ঠীর প্রথমদিকের প্রাণীগুলোকে 'স্তন্যপায়ীর মত সরীসৃপ' বলা হত, যদিও ওগুলো আসলে সরীসৃপ ছিল না| তারা আগেই প্রাণীকুলের আলাদা শাখা হিসেবে বিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল| এদের মধ্যে অন্যতম ছিল ২৮০ বছর আগের সবচেয়ে বড় খাদক (predator) Dimetrodon এর ঢেউয়ের মত পিঠ, বাচ্চাদের কাছে খেলনা ডাইনোসরের কারণে বেশ পরিচিত, যদিও এটা আদৌ ডাইনোসর ছিল না| Dimetrodon এর বড় ও ধারাল ছেদন দাঁত এবং স্তন্যপায়ীদের মত খুলিও ছিল|

পরবর্তী ৮০ মিলিয়ন বছরে Synapsida রা ভাল্লুক এবং নেকড়ের মত শিকারী প্রাণীর পাশাপাশি শূকরের মত তৃণভোজী প্রাণীতেও বিবর্তিত হয়| এই সময়ে তারা স্তন্যপায়ীদের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য লাভ করে| এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চোয়ালের বাড়তি পেশি যা চিবানোর কাজে সহায়তা করে; মুখের ভিতরে অতিরিক্ত তালু যা তাদের একই সাথে খেতে এবং শ্বাস নিতে সাহায্য করে| একাধিক স্তরে সজ্জিত চর্বন দাঁত যা খাদ্য সরাসরি গিলে ফেলার আগে চিবানোর কাজে লাগে; বড় মস্তিস্ক এবং যথাযথ শ্বাস-

প্রশ্বাসের জন্য পাঁজরের চারপাশের পেশি| এদের দেহে লোম থাকার প্রমাণ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, যা নিশ্চিতভাবেই স্তন্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্য| চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও টেক্সাসে পাওয়া ২০০ মিলিয়ন বছর আগের সত্যিকারের স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিলেও উপস্থিতির মাধ্যমে Synapsida-দের ঘটনা শেষ হয়|

বিভিন্ন প্রাণীর নিচের চোয়ালের ফসিল পর্যবেক্ষণের দ্বারা স্তন্যপায়ীদের বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায়| সরীসৃপ ও আদি Synapsida-দের বাম ও ডান উভয়পাশের নিচের চোয়ালগুলো হাড় দ্বারা গঠিত, যার কোনোটি আবার দাঁতকেও ধরে রাখে| Synapsida-দের বিবর্তনের সাথে চোয়ালের হাড়গুলো বড় হতে থাকে এবং শেষে মাথার খুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করে| সরীসৃপদের চোয়ালের একটি হাড় সঙ্কুচিত হতে হতে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়| অন্য হাড় দুটি সরতে সরতে মধ্যকর্ণে চলে যায় যেখানে তারা নেহাই ও হাতুড়ির মত কাজ করতে থাকে| তারা কানের পর্দায় শব্দ উৎপন্ন করে যা স্টিরাপ হাড় হয়ে অন্তঃকর্ণে পৌঁছে যায়| আপনারা যদি সরীসৃপদের শব্দ শোনার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে না জানেন তবে হাড়গুলোর কাজের এমন পরিবর্তন আপনাদের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে| সরীসৃপদের ক্ষেত্রে শব্দ নিচের চোয়াল থেকে মাথার খুলির মধ্য দিয়ে অন্তঃকর্ণে পৌঁছায়| কানের পর্দায় এসময় যে কম্প ন অনুভূত হয় তা কোনো বস্তুকে যাচাই করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ|

অন্যান্য গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ 'মিসিং লিঙ্ক' দেখা যায়| অনেক প্রজাতির ফসিল এখন ডায়নোসর থেকে পাখির বিবর্তনের চিত্রটি আরও স্প ষ্ট করে| ১৫০ মিলিয়ন বছর পুরানো জুরাসিক যুগের ফসিল রেকর্ডে পাওয়া *Archaeopteryx*-এর উদাহরণ এখানে দেখানো যায়| চীনের Lower Cretaceous থেকে পাওয়া ১৪০ বছর পুরানো ফসিলেও পাখির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়| যেমন Sinornis এর ভাঁজ করবার মত ডানা ছিল, থাবা দিয়ে ধরবার উপযোগী পা ছিল, লেজের হাড়গুলো সব একসাথে মিশে একটি হাড়ে পরিণত হয়েছিল| দাঁতবিহীন ঠোঁট আমরা প্রথম দেখি Confuciusornis-এ| স্পে নের প্রায় ১৩০ মিলিয়ন বছর পুরনো Lower Cretaceous শিলা থেকে পাওয়া যায় Iberomesornis, যার বেশ মজবুত বুকের হাড় ছিল যা উড়ার জন্য ব্যবহৃত পেশিকে আটকে রাখত| এই প্রাণীটির আবার ডায়নোসরের মত আদিম প্রকৃতির মেরুদণ্ডও ছিল|

এই ধরনের পাখিদের ফসিলগুলোকে এখন আকাশে উড়ে না এমন ডায়নোসরদের তালিকায় যোগ করা হয়েছে| Microraptor বা Caudipteryx-এর ফসিলগুলোতে বেশ উন্নত ধরনের পালক দেখা গেছে| এ থেকে বোঝা যায় ওগুলো উড়বার উপযোগী হওয়ারও অনেক আগে আরও ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হত| [দেখুন 'Bird's-eye View' by Matthew T. Carrano and Patrick M. O'Connor, *Natural History*; May 2005, Vol. 114 Issue 4, p42]|

আরেকটি পটপরিবর্তন যার পক্ষেও এখন যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণাদি পাওয়া গেছে তা হল উভচর প্রাণীদের ডাঙ্গা বিজয় (অভিযোজন)| দশকের পর দশক ধরে মাছ ও উভচরদের মধ্যবর্তী একমাত্র ফসিলটি ছিল গ্রিনল্যান্ডে পাওয়া ৩৬০ মিলিয়ন বছর পুরনো ডেভনিয়ান যুগের Ichthyostega| উভচর প্রাণীদের সাথে ওপযঃযুড়ংঃবমধ দের নানা সাদৃশ্য যেমন সুগঠিত পা, কাঁধে পূর্ণাঙ্গ কটিবন্ধ, মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত নিতম্বের হাড় থাকা সত্ত্বেও এদের মুখের উপর পানির ভিতরের বস্তুকণা চিহ্নিত করার জন্য মাছের মত কানকো ছিদ্র এবং মাছেদের মতই পাখনাওয়ালা লম্বা লেজ ছিল|

সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলো যেমন একই অঞ্চলে পাওয়া অপধহঃযড়ংঃবমধ, এই চিত্রটিকে আরও জটিল ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে| Acanthostega এর কানের হাড়ও ছিল যা পানির ভিতরে শব্দ শোনার উপযোগী ছিল| Ichthyostega অপেক্ষা বড় পাখনাযুক্ত লেজ Acanthostega এর দেহে দেখা যায়| উন্নততর কানকোর কারণে Acanthostega, Ichthyostega এর চেয়ে আরও বেশি আদিম ও আরও বেশি জলজ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল| Acanthostega দের চার পায়ের প্রতিটিতে ৫টির স্থলে ৮টি করে আঙুল ছিল যা আদিমকালের চতুষ্পদী প্রাণীদের ক্ষেত্রে আদর্শ ছিল| এর উপাঙ্গগুলো সাঁতার কাটার পাশাপাশি জলাশয়ের তলদেশের উপর দিয়ে হাঁটার উপযোগী ছিল, ডাঙ্গায় হাঁটার উপযোগী নয়| উভচরদের পা বিবর্তিত হয়েছে ডাঙ্গায় চলাচলের জন্য (খাদ্যের নতুন উৎসের সন্ধানে), প্রচলিত এমন কাহিনির সাথে এটা সাংঘর্ষিক পা বিবর্তিত হয়েছে পানির নিচ দিয়ে হাঁটার জন্যে (বেশিরভাগ স্যালাম্যান্ডাররা আজও যা করে চলে)| তারপর তারা ডাঙ্গায় চলার উপযোগী হয়ে উঠে কারণ সেই ক্ষমতা তারা পেয়ে গিয়েছিল|

এখন সেই বিবর্তনের কথায় আসি যা আমাদের প্রজাতি *ঐড়সড় ংধঢ়রবহং* গঠনে ভূমিকা রেখেছে| কিছুদিন আগেও মানবগোত্রের ফসিলের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত ছিল| ১৯১২ সালে পিল্টডাউন ম্যান নামে পরিচিত এক প্রবঞ্চনামূলক ফসিলের কারণে সবকিছুতেই অনিশ্চয়তা ও বিভ্রমের এক মায়াজাল তৈরি হয়| কিন্তু গত তিন দশকে সকল আবিষ্কারই আলোতে নিয়ে এসেছে| আফ্রিকার চাদ প্রজাতন্ত্র থেকে ৬ থেকে ৭ মিলিয়ন বছর পুরনো *Sahelanthropus* এর ফসিল আবিষ্কৃত হয়| ইথিয়োপিয়ায় ২ থেকে ৫ মিলিয়ন পুরনো রেকর্ডে নতুন গণ Ardipithecus ও Australopithecus-এর নতুন দুইটি প্রজাতির (*A. Anamensis* ও *A. Bahrelghazali*) ফসিলও বের করা সম্ভব হয়| আমাদের নিজেদের প্রায় ২ মিলিয়ন বছর পুরনো গণ ঐড়সড় এরও বেশ কিছু প্রজাতি চিহ্নিত হয়েছে|

সংক্ষেপে বলা যায় মানুষের ফসিল রেকর্ড এখন অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ| নতুন উদ্ধারকৃত নমুনাগুলোর অনেকগুলো আবার বেশ বিস্ময়কর| যেমন পুরনো নৃবিজ্ঞানীদের কথার বিরোধিতা করে ফসিলগুলো আমাদের দেখায় দুই পায়ে দাঁড়ানোর

ঘটনাটা মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধির আগেই ঘটেছে| মানব বিবর্তনের অনেক পরের পর্যায়ে মস্তিষ্কের আকারের বৃদ্ধি ঘটেছে|

মেরুদণ্ডীদের উৎপত্তির ব্যাপারে ফসিল রেকর্ডে একসময় হতাশাজনক ফাঁক রয়ে গিয়েছিল| জীববিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জীবিত প্রাণীকেই (যেমন, lancelets, sea squirts) অমেরুদণ্ডী ও চোয়ালবিহীন মাছের মধ্যকার সংযোগ বলে পরীক্ষা চালাতেন| যতদিন না ৪৮০ মিলিয়ন বছর পুরনো অর্ডোভিসিয়ান যুগের শুরুর দিকের বেশ কার্যকর কিছু ফসিল আবিষ্কৃত হয়| তবে সেগুলো শুধু কিছু ভাঙ্গা হাড় আর প্লেট ছড়ানো অবস্থায় ছিল|

তবে চীন থেকে পাওয়া ৫১০ মিলিয়ন থেকে ৫০০ মিলিয়ন বছর আগের মধ্য ক্যামব্রিয়ান যুগের কিছু ফসিল lancelet এর পূর্বসূরি হিসেবে শুধু বিবেচিত হয় নি, নরম শরীরের আরও কিছু নমুনা প্রথমদিকের মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছে| এর মাধ্যমে মেরুদণ্ডীদের পদাঙ্ক সেই ক্যামব্রিয়ান যুগেও পাওয়া যায়, যখন আধুনিক প্রাণীজগতের বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়েছিল|

ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিসিজ* বইয়ের যখন দেড়শ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, প্রাপ্ত ফসিলের নিদর্শনগুলো দেখলে মনে হয় ডারউইনের মনে দুঃখ বা অপরাধবোধ নয়, বরং গৌরব বোধ করতেন| বিবর্তনীয়-জীববিজ্ঞানীরা এখন আরো কিছু আবিষ্কারের দিকে তাকাতে পারেন| যার কতগুলি ছোট মস্তিষ্কের দু পেয়ে হোমিনিডদের মত বিস্ময় জাগাবে, আবার কতগুলি বিবর্তনের ঘটনা সম্বন্ধে ফসিলবিদদের ধারণার মোড় ঘুরিয়ে দেবে| তাই ফসিল রেকর্ড জীববিবর্তন ব্যাখ্যার জন্য ডারউইনের সময়ের মত এখন আর বিড়ম্বনার কারণ নয়|

ডোনাল্ড প্রোথেরো : আমেরিকার অক্সিডেন্টাল কলেজের ভূতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক| 'The fossils say yes!' শিরোনামের প্রবন্ধটি লেখকের অনুমতিক্রমে *Natural History* ম্যাগাজিন (২০০৫, ১১৪ (৯): ৫২-৫৬) থেকে সংগৃহীত|

অভীক দাস : বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিলের সদস্য| শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট|